কলকাতার কাবুলিওয়ালা: অভিবাসন, অভিযোজন ও জীবনচর্যার পর্যালোচনা (১৮৯২-২০১৬)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে

পিএইচ.ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

আনিসুল হক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মণ

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৩

Certified that the Thesis entitled

কলকাতার কাবুলিওয়ালা: অভিবাসন, অভিযোজন ও জীবনচর্যার পর্যালোচনা ১৮৯২-২০১৬ ***(Kolkatar Kabuliwala: Abhibasan, Abhiyojan o Jibancharjayar Paryalochana 1892-2016)*** submitted by me for Award of 'Doctor of Philosophy in Arts' at Jadavpur University is based upon my work carried out the supervision of Dr. Rup Kumar Barman, Professor, Department of History, Jadavpur University; and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

Dr Rup Kumar Barman
Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata 700032
Dated-

Candidate:

(Anisul Haque)
Dated-

মুখবন্ধ

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন-
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

ভারততীর্থ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষ এক বিশাল বৈচিত্র্যের দেশ। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এই বিশাল ভৌগোলিক পরিসরের মধ্যে অগণিত মানুষের সহাবস্থান। ভারতবর্ষের এই বিরাট পরিসরের মধ্যেই রয়েছে নানা জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং ভাষার মানুষ। একই সঙ্গে রয়েছে সারা বিশ্বের মানুষের যাওয়া আসা। যা এদেশের মহত্ত্ব এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে যুগ যুগ ধরে। প্রাচীনযুগে আর্যদের ভারতে আগমনের মধ্যে দিয়ে অভিবাসনের যে পর্যায় সূচনা হয়েছিল, মধ্যযুগে শক, হুণ, পাঠান, মুঘল, তুর্কিদের ভারতবর্ষে আগমনের মধ্য দিয়ে সেই একই ধারা অব্যাহত ছিল। মধ্যযুগের ইতিহাসের এই বিরাট কালপর্বে বৈদেশিক শক্তির আগমনের মূল লক্ষ ছিল লড়াই, লুণ্ঠণ এবং স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। ঔপনিবেশিক আমলেও ভারতবর্ষে বিদেশিদের আগমনের মূল লক্ষ অভিন্ন ছিল না। তাঁরা ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন অবিরত।

তবে ইতিহাসের যুগ বিভাজনের এই পরিকাঠামোর বাইরেও অসংখ্য বিদেশিরা ভারতে এসেছেন। তাঁরা ভারতের মানচিত্রকে বেছে নিয়েছেন নিজেদের নানান প্রয়োজনের তাগিদে। এই অগণিত মানুষের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠার জন্য বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হয়েছে ভারত এবং উজ্জ্বল করেছে তার ভাবমূর্তি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে রয়েছেন এমন অগণিত বিদেশি জনগোষ্ঠীর মানুষ। তবে সাম্প্রতিককালে একাধিক সমস্যার কারণে এঁরা অনেকেই পুনরায় নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছেন অথবা

দেশান্তরিত হচ্ছেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। ফলে ভূ-লুণ্ঠিত হচ্ছে ভারতবর্ষের অতীত গরিমা। বর্তমানে এই সমস্যা থেকে কলকাতা মুক্ত নয়। কারণ সুদূর কলকাতা থেকে জিউস, আর্মেনিয়ান, চিনা, ফরাসি, জার্মান এবং আফগানদের মত বিদেশি জনগোষ্ঠীর মানুষ দেশে ফিরে যাচ্ছেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকট, বাসস্থানজনিত সমস্যা, নাগরিকত্বের সঙ্কটের মত একাধিক কারণে। এই সমস্ত বিদেশি জনগোষ্ঠীর সমস্যার প্রতি যদি রাষ্ট্র এবং এ-দেশের সাধরণ মানুষের সহানুভূতি না থাকে তাহলে এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। আবার একইভাবে এই সব বিদেশি জনগোষ্ঠীগুলি যদি কলকাতার ইতিহাসে তাঁদের অবদানের কথা তুলে ধরতে না পারেন, তাহলে কলকাতার অতীত এবং বর্তমান ইতিহাস উন্মোচন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে এমনই এক উদ্দেশ্য নিয়ে বহুল আলোচিত, তবে অ-চর্চিত বিষয় হিসাবে 'কলকাতার কাবুলিওয়ালা' নামের একটি বৈদেশিক জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পুনর্লিখন ও পুনর্নির্মাণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মূলত কয়েকটি প্রশ্নকে সামনে রেখে এই সন্দর্ভের অবয়ব নির্মাণের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। যেমন ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনে কীভাবে বাংলায় কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল? ঔপনিবেশিক আমলে কীভাবে তাঁরা কলকাতার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কীভাবে তাঁরা নিজেদেরকে অভিযোজিত করে চলেছেন? আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে তাঁরা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? --এই সমস্ত বিষয়গুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই সন্দর্ভে।

১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। যেখানে বর্ণিত হয়েছে রহমত নামের একজন আফগান নাগরিকের কথা। যিনি সুদূর আফগানিস্তান থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে। রহমত আফগানিস্তানের কাবুল প্রদেশের অধিবাসী হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্ভবত এঁদেরকে 'কাবুলিওয়ালা' বলেছেন। কাজেই বর্তমান গবেষণাতে কলকাতাতে অবস্থিত আফগান কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। কারণ ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রবাহ প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময়

পর্যন্ত প্রবাহমান থাকলেও, ভারতে অবস্থিত আফগান জনগোষ্ঠীর শেষ প্রতিনিধি হিসাবে ‘কাবুলিওয়ালাদের’ নিয়ে ঐতিহাসিক ও গবেষক মহলে উপেক্ষা এবং অনালোচিত প্রেক্ষিত হিসাবে রয়ে গেছে। অথচ বর্তমানে কলকাতায় অবস্থিত আফগান জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। যা কলকাতার অন্যান্য বৈদেশিক জনসংখ্যার নিরিখে বেশ কয়েকগুণ বেশি। তবুও ঐতিহাসিক এবং গবেষক মহলে আফগান কাবুলিওয়ালা বিষয়ক আলোচনা ব্রাত্য। তাই উপেক্ষার এই ইতিহাস ও অনালোচিত প্রেক্ষিত আমাকে গভীরভাবে এই কাজের পরিসীমার মধ্যে টেনে এনেছে এবং উৎসাহ প্রদান করেছে।

গবেষণা সন্দর্ভটির মধ্যে দিয়ে কলকাতায় বসবাসরত আফগান কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকে অভিবাসনের ইতিহাস, কলকাতার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা, কলকাতার ‘ডায়াস্পোরা’ এবং ‘প্রান্তিক’ জনগোষ্ঠী হিসাবে কাবুলিওয়ালাদের অবস্থান এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যদি বিষয়ে গবেষণা পত্রটিতে সার্বিক আলোচনার বিশ্লেষণ হলেও, কয়েকটি দিক তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। বিশেষত ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে তাঁরা ঠিক কবে থেকে কলকাতাতে আসতে শুরু করেছিলেন, তা তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। এছাড়া সারা ভারতবর্ষে তাঁদের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য, লোকসংস্কৃতি, এমনকি তাঁদের নেতৃত্ববর্গের মধ্যে অনেক নাম উঠে এলেও অনেকের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোনও উৎস সন্ধান পাওয়া যায়নি। ফলে বিস্তর আলোচনার সুযোগ হয়নি। এছাড়া এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে কয়েকটি বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আমি আকাদেমি বানান অভিধান (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৫) অনুসরণ করেছি।

এই গবেষণা সন্দর্ভটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি অর্জনের জন্য প্রদত্ত হয়েছে। আমার এই সুদীর্ঘ গবেষণা পথের যিনি পথপ্রদর্শক, তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই, আমার অভিভাবক এবং তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. রূপকুমার বর্মণ। যিনি গবেষণার প্রতিটি পর্বে আমাকে পরামর্শ দিয়ে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁর সুচিন্তিত

মতামত ব্যতীত গবেষণা পত্রটি রূপায়িত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আমার এই গবেষণা সন্দর্ভটি পরিপূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থাগার, সংস্থা, সংগ্রহশালা ও বিশেষ প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পেয়েছি সেগুলি হল- কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় লাইব্রেরী, কলকাতা লেখ্যাগার, কলকাতা; রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, গওসিয়া লাইব্রেরী, ওসমানিয়া লাইব্রেরী এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমার রিসার্চ এডভাইসারি কমিটির (Research Advisory Committee) দুই সদস্যকে। অধ্যাপক ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ড. বিজয় কুমার দাশ মহাশয়কে। যাঁদের পরামর্শ আমার গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সাহায্য করেছে। এছাড়া কাবুলিওয়ালাদের সংগঠনের প্রেসিডেন্ট (কলকাতা) আমির খান মহাশয়কে, যিনি কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে আমার কথা বলা এবং দীর্ঘ আলাপ পরিচিতার সুযোগ করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানায় সারা ভারত পাখতুন জনগোষ্ঠীর সভানেত্রী ইয়াসমিন নিগার খান মহাশয়াকে, যিনি আমাকে কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে একাধিক চিঠিপত্র এবং কলকাতার কাবুলিওয়ালা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এছাড়া গবেষণা কার্যে বিশেষ ভাবে পরামর্শ প্রদান করেছেন নাজেস আফরোজ, মোসকা নজিব, শেরজান তাকাল, মহম্মদ গায়ুর বঙ্গেশ, ইন্দ্রজিৎ সিং এবং আব্দুল্লা হাসরত যাঁরা মূল্যবান মতামত দিয়ে আমার গবেষণা কার্যে সহায়তা করেছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ড. শুভাশিষ বিশ্বাস, ড. সুদেষ্ণা ব্যানার্জী, ড. মেরুনা মুর্মু, ড. চন্দ্রানী ব্যানার্জী (মুখার্জী) ও শ্রী সমির দাস সর্বদা আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণাকার্য চলাকালীন সময়ে যাঁরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁরা হল আমার অনুজপ্রতিম কৃষ্ণ কুমার সরকার, যার মতামত গবেষণা সন্দর্ভ প্রস্তুতিতে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন, প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছেন পাভেল

সুলতানা, মৃদুল হক এবং কনক। এছাড়া প্রয়োজনীয় তালিকা প্রস্তুত এবং প্রযুক্তিগত কাজে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন অনেকেই। এছাড়া আমার গবেষণা কার্যে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন মিঠুন মজুমদার, সৌরিশ ঘোষ, শরফারস আজম, প্রসেনজিৎ নস্কর, আত্রেয়ী লাহেড়ি, তন্ময় রায়, অঙ্কন রায়, বিশ্বজিৎ মজুমদার, নন্দ দুলাল মন্ডল, কিশোর রায় সরকার, কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস, রাকিব, শিল্পা মণ্ডল, সুজয় দাস, শুভঙ্কর দে, বনমালী দে, মাহমুদ ইসলাম, সেলিম আকতার, আরমান আলি, শূধ্যায়ন চক্রবর্তী, এবং অরুন কুমার চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। এছাড়া বনানীদি, পূর্নিমাদি, প্রতিমাদি, সজলদা, ভরতদা, জয়শ্রীদির-র প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়া আমার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বন্ধু-বান্ধবদের আমার ধন্যবাদ জানাই।

এই গবেষণা প্রকল্প নির্মাণে UGC (University Grants Commission), RUSA (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan) ও SVMCMS (Swami Vivekananda Merit-Cum-Means Scholarship) কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের আর্থিক সাহায্য এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা দান করেছে।

সবশেষে প্রণাম জানাই আমার বাবা ফজলুল হক ও মা রওশনারা বেগমকে। যাঁরা আমার সকল কাজের অনুপ্রেরণার উৎস, আমার এ কাজের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত থাকতে পেরে নিজেরা গভীর তৃপ্তি অনুভব করেন সবসময়। একইসঙ্গে আমার ভাই, বোন ও পরিবারের অন্যান্যরা আমার পাশে থেকে সাহায্য করেছে নিরন্তর, তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে আমি কৃতজ্ঞ আমার স্কুলজীবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সমস্ত মাষ্টার মহাশয়দের কাছে, যাঁদের থেকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পেয়েছি সর্বদাই।

আনিসুল হক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,

যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২

সংকেতাবলী (Abbreviation)

ANA	Afghan National Army	আফগান ন্যাশনাল আর্মি
ATTA	Afghanistan Transit Trade Agreement	আফগানিস্তান ট্রানজিট ট্রেড চুক্তি
AIFB	All India Forward Block	অল ইণ্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক
AIPJH	All India Pakhtoon Jirga-e-Hind	অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ
BPI	Bolshevik party of India	বলশেভিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া
CIA	Central Intelligence Agency	কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা
CM	Chief Minister	মুখ্যমন্ত্রী
CPI	Communist Party of India	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
CPIM	Communist Party of India (Marxist)	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
ICCR	Indian Council for Cultural Relation	ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন
IHR	Indian Historical Review	ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ
IHC	Indian History Congress	ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস
CONG	Indian National Congress	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
ITEC	Indian Technical and Economic Cooperation	ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কর্পোরেশন
IB	Intelligence Bureau (West Bengal)	ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (পশ্চিমবঙ্গ)
IRA	Islamic Republic of Afghanistan	ইসলামিক রিপাবলিক অফ আফগানিস্তান
LF	Left Front	বামফ্রন্ট
MLA	Member of Legislative Assembly	আইনসভার সদস্য
MP	Member of Parliament	সংসদ সদস্য
MEA	Ministry of External Affairs	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
MHA	Ministry of Home Affairs	স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়

NAI	National Archives of India (Delhi)	ভারতীয় জাতীয় লেখ্যগার (দিল্লি)
NEEP	National Emergency Employment Programme	জাতীয় জরুরী কর্মসংস্থান
NRC	National Register of Citizen	ন্যশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন
NMML	Nehru Memorial Museum and Library	নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি
NGO	Non-Government Organization	বেসরকারি সেবা-প্রতিষ্ঠান
NWFP	North West Frontier Province	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ
PDPA	People's Democratic Party of Afghanistan	পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ আফগানিস্তান
PTA	Preferential Trade Agreement	অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি
RNNB	Report of the Native Newspaper of Bengal	রিপোর্ট অফ দি নেটিভ নিউজপেপার অফ বেঙ্গল
RAE	Royal Afghan Embassy	রয়্যাল আফগান এমব্যাসি
SSP	Samyukta Socialist Party	সম্মিলিত সমাজতান্ত্রিক দল
SSA	Sarva Shiksha Abhijan	সর্বশিক্ষা অভিযান
SP	Socialist Party	সমাজতান্ত্রিক দল
SAARC	South Asian Association for Regional Cooperation	সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কর্পোরেশন
UFO	Under the Foreigners Order	আন্ডার দ্যা ফরেনারস্ অর্ডার
UNDP	United Nation Development Programme	জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম
UN	United Nations	জাতিসংঘ
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugee	ইউনাইটেড নেশনস্ হাইকমিশানার ফর রিফিউজি

সারণি সূচি

সারণি: ১.১. ১৯২৩ সালে ভারতবর্ষে আফগান সরকার কর্তৃক জেনারেল আফগান নিয়োগের তালিকা।

সারণি: ১.২. ভারত-আফগানিস্তান আমদানি ও রপ্তানিজাত পণ্যদ্রব্যের তালিকা।

সারণি: ১.৩. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আফগান শরণার্থীদের পরিসংখ্যান (১৯৭৯-১৯৯০)

সারণি: ২.১. ১৮৩৭ সালে কলকাতার বিভিন্ন অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর তালিকা।

সারণি: ৩.১. পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আফগান জনসংখ্যার তালিকা (১৯৭১-২০১১)

সারণি: ৩.২. ১৯৩৯ সালে কলকাতায় আগত আফগান নাগরিকদের নাম ও ঠিকানার তালিকা।

সারণি: ৪.১. ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালাদের পেশার তালিকা।

সারণি: ৪.২. ১৯৫০ সালে পশ্চিম দিনাজপুর থেকে গ্রেপ্তার আফগান নাগরিকদের তালিকা।

সারণি: ৪.৩. কলকাতার পাখতুন জনগোষ্ঠীর সংগঠন ও নেতৃবৃন্দ

পারিভাষিক শব্দাবলী (Glossary)

কাবুলিওয়ালা	আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত আফগান জনগোষ্ঠী। যাঁরা বর্তমানে ভারত সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেন।
পাশতুন/পাখতুন	আফগানিস্তানের একাধিক জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। পাখতুনরা তাঁদের মধ্যে অন্যতম একটি।
নান	একধরনের আফগানি খাবার।
মহাজনি কারবার	সুদের ব্যবসা।
প্রান্তিক	যার অবস্থান মূল কেন্দ্র থেকে অনেকটা প্রান্তে।
খোদাই-ই-খিদমদ্গার	খান আব্দুল গফফর খান (সীমান্ত গান্ধি) এই সংগঠনের স্থাপন করেছিলেন।
অভিবাসিত জনগোষ্ঠী	এক দেশ থকে অন্য দেশে আশ্রয়প্রার্থী জনগোষ্ঠী।
আদমশুমারি	জনগণনা/ লোকগণনা।
অহিংসা	হিংসার আশ্রয় না নিয়ে অধিকার রক্ষার দৃঢ় সংকল্প।
সত্যাগ্রহ	সত্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প।
খান কোঠি	কলকাতায় কাবুলিওয়ালাদের নির্মিত ঘর।
হিজাব/বোরখা	ইসলামিক রীতি অনুযায়ী মুসলিম নারীর ব্যবহারকৃত একধরনের পোশাক।
আন্ডাকুষ্ঠি/ বুজখাসি	এক ধরনের আফগান ক্রীড়া।
নাকছাবি	আফগান মহিলাদের ব্যবহারের গহনা।
গোস্ত	মাংস।
কবরস্থান	ইসলামি ধর্মমত অনুযায়ী মৃত্যুর পর যেখানে শায়িত করা হয়।
দেন-মোহর	বিবাহের দিন পাত্র পক্ষের পক্ষ থেকে কন্যাকে দেওয়া নগদ অর্থ।
জিরগা-ই-হিন্দ	ভারতে পাশতুন জনগোষ্ঠীর সংগঠন
নারাঙ্গ পোলাও	একধরনের আফগান খাবার।
পুশতু, পশতুন	আফগানিস্তানের ভাষা।
তুর্কমেন	আফগানিস্তানের একটি উপজাতি।
হাজারা	আফগানিস্তানের একটি উপজাতি।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ i-v

সংকেতাবলি vi-vii

সারণি সূচি viii

পারিভাষিক শব্দাবলি ix

ভূমিকা ১-২৭

প্রথম অধ্যায়: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ধারা ২৮-৮০

- ❖ ১.২. প্রাচীনযুগে ভারত-আফগানিস্তান ঐতিহাসিক সম্পর্কের পটভূমি ও বিবর্তন ২৯
- ➢ ১.২.১. ভারত-আফগানিস্তান আদি সম্পর্ক ৩০
- ➢ ১.২.২. মহাকাব্যে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের উৎস সন্ধান ৩১
- ➢ ১.২.৩. হরপ্পা সভ্যতা ও ঋকবৈদিক যুগে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতির যোগসূত্র ৩৩
- ➢ ১.২.৪. মৌর্য যুগে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের বিকাশ ৩৫
- ➢ ১.২.৫. কুষান যুগে ভারত-আফগানিস্তান সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রসার ৩৬
- ❖ ১.৩. মধ্যযুগে ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসন ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিবর্তন ৪০
- ➢ ১.৩.১. মধ্যযুগে আফগান অভিবাসনের প্রেক্ষাপট ও প্রাথমিক পর্ব ৪১
- ➢ ১.৩.২. সুলতানি যুগে আফগান অভিবাসনের ধারা ৪৩
- ➢ ১.৩.৩. মুঘল যুগে আফগান অভিবাসন ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ৪৫
- ➢ ১.৩.৪. মধ্যযুগে বাঙলায় আফগান অভিবাসনের প্রসার ও প্রেক্ষিত ৫১

❖ ১.৪. আধুনিক যুগে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের প্রসার ও আফগান বাস্তুচ্যুতি ৫৩
➢ ১.৪.১. ঔপনিবেশিক আমলে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্ক ও আফগান বাস্তুচ্যুতি ৫৪
➢ ১.৪.২. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আফগান যোগসূত্র ৫৯
➢ ১.৪.৩. স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দু'দেশের আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রসার ৬৩
➢ ১.৪.৪. স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে আফগান বাস্তুচ্যুতি ও নাগরিকত্ব ৬৯
❖ ১.৫. পর্যবেক্ষণ ৭২
❖ টীকা ও সূত্র নির্দেশ ৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: কলকাতার অভিবাসিত, ডায়াস্পোরা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসাবে বাঙালি জীবনে আফগান কাবুলিওয়ালা ৮১-১৩৭

❖ ২.২. কলকাতার অভিবাসনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ৮২
❖ ২.৩. কলকাতার অভিবাসিত বৈদেশিক জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৮৫
❖ ২.৪. অভিবাসনের ধারণা ও প্রকারভেদ ৯৯
➢ ২.৪.১. অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর ধারণায় কলকাতার কাবুলিওয়ালা ১০২
❖ ২.৫. ডায়াস্পোরার সংজ্ঞা ও সংক্ষিপ্ত ধারণা ১০৬
➢ ২.৫.১ ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর ধারণায় কলকাতার কাবুলিওয়ালা ১০৯
❖ ২.৬. প্রান্তিকতার সংজ্ঞা ও ধারণা ১১২
➢ ২.৬.১ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ধারণায় কলকাতার কাবুলিওয়ালা ১১৪
❖ ২.৭. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের আত্মপরিচয়ের সংকট ১১৬
❖ ২.৮. আত্মপরিচয়ের সংকটে আফগানিস্তানে বাঙালি নারী জীবন ১১৯
❖ ২.৯. সাহিত্যে কাবুলিওয়ালাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান ও আফগান সমাজ ১২৩
❖ ২.১০. ভারতীয় চলচ্চিত্রে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পরিচয় ১২৬
❖ ২.১১. পর্যবেক্ষণ ১২৯
❖ টীকা ও সূত্র নির্দেশ ১৩১

তৃতীয় অধ্যায়: কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকট এবং কলকাতা আগমনের প্রেক্ষাপট ১৩৮-১৭৫

- ৩.২. আফগান জনমানস ও আফগানিস্তানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১৩৮
- ৩.৩. কাবুলিওয়ালাদের আদি বাসস্থান ১৪২
- ৩.৪. কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনের অর্থনৈতিক কারণ ১৪৬
- ৩.৫. কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনে ভূ-রাজনৈতিক কারণ ১৫১
- ৩.৬ আফগান কাবুলিওয়ালাদের ভারতবর্ষে আগমনের প্রাথমিক পর্ব ১৫৪
  - ৩.৬.১. ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আফগান জনগোষ্ঠীর বসতি ১৫৭
- ৩.৭. পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আফগান কাবুলিওয়ালাদের বসতি ১৫৯
- ৩.৮. আফগান কাবুলিওয়ালাদের কলকাতা আগমন ও বসতি স্থাপন ১৬৫
- ৩.৯. পর্যবেক্ষণ ১৬৯
- টীকা ও সূত্র নির্দেশ ১৭০

চতুর্থ অধ্যায়: কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পর্যালোচনা ১৭৬-২৪১

- ৪.২. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (১৮৯২-১৯৪৭) ১৭৬
  - ৪.২.১. কাবুলিওয়ালাদের পেশাগত জীবন ১৭৭
- ৪.৩. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক জীবন (১৯৪৭-২০১৬) ১৮১
  - ৪.৩.১. কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনে সংকট ১৮১
  - ৪.৩.২. কাবুলিওয়ালাদের পরিবর্তিত অর্থনীতির খোঁজ ও নতুন পেশার দিগন্ত ১৮৪
  - ৪.৩.৩. কাবুলিওয়ালাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগ ১৮৭
- ৪.৪. কলকাতায় বিকল্প আফগান পণ্যের চাহিদা ও বিপণনে কাবুলিরা ১৯১
- ৪.৫. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ১৯৪

- ➢ ৪.৫.১. কাবুলিওয়ালাদের সমাজে মহিলাদের অবস্থান ১৯৬
- ➢ ৪.৫.২. কাবুলিওয়ালাদের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ১৯৮
- ➢ ৪.৫.৩. কাবুলিওয়ালাদের অঞ্চলগত বিভাজন ২০২
- ➢ ৪.৫.৪. কাবুলিওয়ালাদের জন্মবৃত্তান্ত, নাগরিক সমস্যা ও মৃত্যু ২০৩
- ➢ ৪.৫.৫. কাবুলিওয়ালাদের বিবাহ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত ২০৫
- ➢ ৪.৫.৬. কাবুলিওয়ালাদের সামাজিক কর্মকাণ্ড ও অপরাধ প্রবণতা ২০৮
- ❖ ৪.৬. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের পর্যালোচনা ২১৩
- ➢ ৪.৬.১. কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক চেতনার উৎস ২১৪
- ➢ ৪.৬.২. কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক সংগঠন ও নের্তৃবর্গ ২১৫
- ➢ ৪.৬.৩ কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ১৯৪৭-২০১৬ ২২৩
- ➢ ৪.৬.৪ কাবুলিওয়ালাদের ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক আবেদন ২৩০
- ❖ ৪.৭. পর্যবেক্ষণ ২৩২
- ❖ টীকা ও সূত্র নির্দেশ ২৩৩

পঞ্চম অধ্যায়: কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মীয় জীবনের পর্যালোচনা ২৪২-২৯০

- ❖ ৫.২. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় ২৪৩
- ➢ ৫.২.১. কাবুলিওয়ালাদের পরিবার ও পারিবারিক সংস্কৃতি ২৪৫
- ➢ ৫.২.২. কাবুলিওয়ালাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন ও সাজসজ্জা ২৪৯
- ➢ ৫.২.৩. কাবুলিওয়ালাদের খাদ্য সংস্কৃতি ও কলকাতায় আফগান খাবার ২৫৬
- ➢ ৫.২.৪. কাবুলিওয়ালাদের গৃহ নির্মাণে আফগান সংস্কৃতি ও গৃহের অন্তরমহলের সাজসজ্জা ২৬১
- ➢ ৫.২.৫. কাবুলিওয়ালাদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চা ২৬৩
- ➢ ৫.২.৬. কাবুলিওয়ালাদের ভাষাগত সংস্কৃতি ২৬৭
- ➢ ৫.২.৭. কাবুলিওয়ালাদের বিনোদন নিবেদন ২৭০
- ➢ ৫.২.৮. কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক সংগঠন ও লোককথা ২৭৩
- ❖ ৫.৩. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় জীবনের পরিচয় ২৭৫
- ➢ ৫.৩.১. কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ২৭৬

➢ ৫.৩.২. কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান ২৭৭

➢ ৫.৩.৩. কাবুলিওয়ালাদের প্রার্থনাস্থল ও প্রার্থনা পদ্ধতি ২৮১

❖ ৫.৪. পর্যবেক্ষণ ২৮৩

❖ টীকা ও সূত্র নির্দেশ ২৮৪

উপসংহার ২৯১-২৯৮

সংযোজনী ২৯৯-৩৩৩

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি ৩৩৪-৩৫৬

ভূমিকা

বর্তমান ইতিহাসচর্চায় বেশ কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হতে শুরু করেছে। ক্রমবর্ধমান এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে উঠে আসতে শুরু করেছে বর্তমান ও অতীতের মধ্য অন্তহীন সংলাপ। যা ইতিহাসকে বিকল্প চর্চার প্রয়াস প্রদানে বিশেষভাবে সুযোগ করে দিয়েছে। তবে ইতিহাসকে যখন সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা শুরু হয়, তখন থেকে এই পরিবর্তনশীলতার পরিধি দ্রুত প্রসারিত হতে শুরু করল। যার আলোক এসে পড়ল বর্তমানে ইতিহাসচর্চার উপর। এর ফলে অতীত উঠে এসেছে বর্তমানের আলোকে। আর্যদের ভারতে আগমনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর আগমনের যে ইতিহাস শুরু হয়েছিল, তা আজও বহমান। মানুষ জীবন জীবিকার লড়াইয়ে চেনা জগতের পরিসীমাকে পেরিয়ে অচেনা-অজানা জগতের দিকে পাড়ি দিয়েছেন যুগ যুগ ধরে। এটাই মানব জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অভিবাসিত মানুষের আগমনের ইতিহাসের মধ্যও একই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত ঔপনিবেশিক কালপর্ব থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অগণিত মানুষ অভিবাসনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন যুগ যুগ ধরে, যাঁদেরকে শুধুমাত্র 'অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর' মধ্য সীমাবদ্ধ না রেখে ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর (Diaspora Community) ধারণায় সংজ্ঞায়িত করার প্রকল্প শুরু হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর একটা অংশকে 'প্রান্তিক' জনগোষ্ঠীর (Marginal Community) পর্যায়ভুক্ত করে তাত্ত্বিকেরা আলোচনা করার প্রয়াস নিয়েছেন। ফলে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চার অগ্রগতির ফলস্বরূপ অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর ইতিহাস সীমাবদ্ধ ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে অভিন্ন অঙ্গিকের মধ্য দিয়ে তাত্ত্বিকেরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এই সমস্ত দেশান্তরিত মানুষ ভারত ভূমিকে বেছে নিয়েছেন নিজেদের সংকট মোচনের লড়াইয়ে। এই সব মানুষের কথা ইতিহাসের পাতা থেকে সাহিত্যের স্তবকে, রাজনীতি থেকে সমাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। অনেক সময় এই সমস্ত অভিবাসিত মানুষের আগমনের ফলে বদলে গেছে এদেশের বৈচিত্র্যের গঠন।

এঁরাই দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেখে গেছেন অভিন্নতার ছাপ। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রদেশে রয়েছে এই সমস্ত অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মানুষ। যাঁরা এদেশের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির মতো ক্ষেত্রগুলিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছেন যুগ যুগ ধরে। ফলে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে ইতিহাস চর্চার দিগন্তে অভিবাসন, ডায়াস্পোরা, প্রান্তিকতা এবং আত্মপরিচয়ের সংকটের মতো বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যকালীন সময়ে দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য মানুষের অভিবাসন ঘটেছে বিভিন্ন কারণে। তবে ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে অভিগমনকারী বিদেশি জনগোষ্ঠীর অভিবাসনের ধরন খানিকটা ভিন্ন রকম। কারণ এই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর মানুষ বাসস্থান হিসাবে ভারতকে বেছে নিয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তার আগে এসেছিলেন পর্তুগিজরা ১৫২৮ সালে এবং ওলন্দাজরা ১৬০৫ সালে। যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। কিন্তু ব্রিটিশরা ধীরে ধীরে সাম্যাজ্য বিস্তারের নেশায় মেতে উঠে ভারতবর্ষের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বাকিরা ব্রিটিশদের সঙ্গে আধিপত্যবাদের প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেন। এর পর একে একে জিউসরা ১৭৯৮ সালে, আর্মেনিয়ানরা ১৬৪৫ সালে, চিনারা ১৭১৮ সালে, গ্রিকরা ১৭৭৫ সালে, এবং আফগান সহ একাধিক বৈদেশিক জনগোষ্ঠীর মানুষ অভিবাসনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন। যাঁদেরকে বর্তমানে তাত্ত্বিকরা ‘ডায়াস্পোরা’ জনগোষ্ঠীর অভিধায় ভূষিত করেছেন।

এই সমস্ত অভিবাসিত বিদেশী জনগোষ্ঠী হিসাবে জিউস এবং আর্মেনিয়ানরা ছিলেন সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠী, যাঁরা বহু বছর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য লিপ্ত ছিলেন। এর পর ধীরে ধীরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হিসাবে কলকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাঁরা একে একে কলকাতার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং কলকাতায় বসতি স্থাপন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকেন। ফলে কলকাতায় শুরু হয় জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার অসম লড়াই। সমাজবিজ্ঞানী তথা ঐতিহাসিকরা তাঁদের চর্চার ক্ষেত্রে কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর একাংশকে গুরুত্ব প্রদান

করলেও, সমগ্র অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে তুলে ধরার প্রয়াস অনুভব করেননি। এমনকি আর্মেনিয়ান, জিউস, চিনা, পার্সি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস তাঁদের লেখায় উঠে এলেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কলকাতায় আসা আফগান 'কাবুলিওয়ালা' জনগোষ্ঠী বিষয়ে তাঁরা আলোকপাত করেননি, অথচ এই বাংলার সঙ্গে আফগান যোগাযোগের ইতিহাস ছিল কয়েকশো বছরের। বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে উপেক্ষিত, অবহেলিত, অনালোচিত এবং ব্রাত্য বিদেশি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী 'কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালা' নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

কলকাতাতে যেমন অ-বাঙালি ভারতীয়রা অনেক আগে থেকেই রয়েছেন, তেমনই করে গোটা পৃথিবী থেকে আসা জনগোষ্ঠীর বিরাট বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। তবে এদের মধ্য আফগানদের নিয়ে সাধারণ মানুষের মনের মধ্য একটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (Rabindranath Tagore) হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম আফগানরা উঠে এসেছিলেন 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মধ্য দিয়ে।[১] যাঁরা আঠারো শতকের বিশ ও চল্লিশের দশকে কলকাতায় এসেছিলেন মূলত শুকনো ফল, হিং, সুরমা প্রভৃতি বিক্রয়কে পেশা হিসাবে বেছে নিয়ে। এঁরা মূলত কাবুলের অধিবাসী হওয়ায় এঁদেরকে কাবুলিওয়ালা বলা হয়। ১৮৯২ সালে রচিত হয়েছিল কাবুলিওয়ালা গল্পটি এরপর তা পৌঁছে যায় সাধারণ বাঙালি পাঠকের মনে। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে সাধারণ মানসপটে তৈরি হয়েছে অন্যরকম আকর্ষণ।

'কাবুলিওয়ালা' গল্প রচনার প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে কবিগুরু নিজেই মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯৩১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'কাবুলিওয়ালা বাস্তব ঘটনা নয়, মিনি আমার বড় মেয়ের আদর্শে রচিত।[২] আবার নিজের বড়মেয়ে বেলা-র ছোটবেলার কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সীতা দেবীকে বলেছিলেন "মিনির কথা প্রায় তাঁর (বেলা) কথায় তুলে দিয়েছি"।[৩] প্রসঙ্গত কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই বাল্যকালে লাভ করেছিলেন। তিনি 'জীবনস্মৃতি'-র (১৯৩১) পিতৃদেব অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছদে তা উল্লেখ করেছেন। প্রথম অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- "ঘরের খাঁচায় বদ্ধ ছিলাম বলিয়া যাহা কিছু বিদেশের, যাহা কিছু দূরদেশের, তাহাই আমার মনকে

অত্যন্ত টানিয়া লইত। তাই লেনুকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এই কারণে গাব্রিয়েল বলিয়া একটি ইহুদি তাহার ঘুন্টি-দেওয়া পোশাক পরিয়া যখন আঁতর বেচিতে আসিত, আমার মনে ভারি একটা নাড়া দিত এবং ঝোলাঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পায়জামা পরা বিপুলাকায় কাবুলিওয়ালাও আমার ভীতমিশ্রিত রহস্যের সামগ্রী ছিল”।[৪] (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে তিন জনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১. পিতৃদেবের পাঞ্জাবি ভৃত্য ছিলেন লেনু ২. আতর-বিক্রেতা ইহুদি গ্যাব্রিয়েল ৩. ঝোলাঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পায়জামা পরা বিপুলকায় কাবুলিওয়ালা।[৫] কাজেই কাবুলিওয়ালাদেরকে তিনি যে কলকাতায় নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এই ঘটনাগুলি থেকে তা নিশ্চিত হওয়া যায়।

তবে ঔপনিবেশিক নথিতে কাবুলিওয়ালাদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ না পাওয়া গেলেও, ব্রিটিশ ভারতে আফগানিস্তানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ এই সময়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আফগান পাঠানদের অংশগ্রহণ এবং সীমান্তগান্ধির সঙ্গে ভারতীয় নেতৃবর্গের যোগাযোগ সে কথা প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে দীর্ঘ ইতিহাসের পথ ধরে আফগানিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং সংকটজনিত কারণে আফগানিস্তান থেকে অগণিত মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভিবাসিত হতে শুরু করেন। যাঁদের মধ্য একাংশ ভারতবর্ষকে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও ভারতে আফগান অভিবাসনের পূর্ব ইতিহাস কখনও মুছে যায়নি বরং নতুন রূপে ফিরে এসেছে বারবার। অনেকেই মনে করেন ‘ডুরান্ড লাইন’ (Durand Line) স্থাপন হয়ে যাওয়ার পরে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য সীমান্ত নির্ধারণ হয়ে গেলে অনেক আফগান আটকে পড়ে সীমান্তের এপারে। যাঁদের মধ্য অনেকেই আর দেশে ফিরতে পারেননি।[৬] তাঁদেরই একটা অংশ ভারতে প্রবেশ করেন। যাঁরা পরবর্তীকালে কলকাতার অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ‘কাবুলিওয়ালা’ হিসাবে পরিচিত হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা ছিল স্বল্প সংখ্যক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমানে সারা কলকাতাতে আনুমানিক প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজারের মতো কাবুলিওয়ালাদের বসতি রয়েছে, যা কলকাতায় বসবাসরত অন্যান্য বিদেশি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিরিখে একটা বিরাট

অংশ। প্রথম দিকে এঁরা কলকাতা শহরের বড়বাজার, নিউমার্কেট, ধর্মতলা, ওয়েলিংটন, শ্যমবাজার, দমদম, সুখিয়া স্ট্রিট, ইকবালপুর, সেলিমপুর, পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার, খিদিরপুর, ডায়মন্ড হারবার মতো জায়গাগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে উত্তর চব্বিশ পরগণার কাঁকিনাড়া, নৈহাটি থেকে শুরু করে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশে, শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন।[৭] তবে সাম্প্রতিক এমন অনেক আফগান জনগোষ্ঠীর মানুষ কলকাতায় এসেছেন যাঁরা নিজেদেরকে কাবুলিওয়ালা হিসাবে পরিচয় দেওয়ার চেয়ে 'পাখতুন' জনগোষ্ঠীর মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সুতরাং কলকাতার আফগান জনগোষ্ঠীর মধ্য একটা স্ব-বিরোধের চিত্র ফুটে ওঠে।

তবে জীবিকার সন্ধানে ভারতে এসে 'কাবুলিওয়ালা'রা পেশা হিসাবে শুকনো ফল, মশলা ইত্যাদি ফেরি করে বেড়াতেন শহর থেকে মফসস্‌লের প্রান্তে প্রান্তে। যেমনটি আমারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাবুলিওয়ালা গল্পের মধ্য দেখতে পাই। তবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পেশার ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য এসেছিল। অতীতের পুরনো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'মহাজনী কারবার' বা 'সুদের ব্যবসা' (Money Lending)। ভারত সরকার সুদের ব্যবসার জন্য কাবুলিওয়ালাদের লাইসেন্স (License) প্রদান করেছিলেন।[৮] তবে বর্তমান সময়ে নতুন প্রজন্মের কাবুলিওয়ালাদের সন্তানদের মধ্য পেশার বৈচিত্র্য এসেছে। মূলত এই বদলটি শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের আশির দশক থেকে। কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে দর্জির দোকান, ছোট ছোট খাবারের দোকান, বিশেষত আফগান খাবারের বৈচিত্র্য নিয়ে হোটেল ব্যবসার মধ্য দিয়ে। বর্তমানে এমন অনেক কাবুলিওয়াদের পরিবার কলকাতায় রয়েছেন যাঁরা মাইক্রোফিনান্স এবং প্রোমোটারি ব্যবসার সঙ্গে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। তবে নবীন প্রজন্মের আফগানরা স্বাধীন ব্যবসা, পড়াশোনা এবং চাকরির দিকে নিজেদের যুক্ত করতে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৯]

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের কথা উঠে আসে। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কাবুলিওয়ালাদের চেহারার মধ্য একটা আফগান সংস্কৃতি বেঁচে ছিল। আশির দশক পর্যন্ত কাবুলিওয়ালা বলতে মূলত তাঁদের পোশাক ও

চেহারার গঠনের মধ্যই আফগান সত্তা লক্ষ করা যেত। গায়ে সলোয়ার কামিজ, মাথায় টুপি বা পাগড়ি, মুখে দাড়ি, রুক্ষ চেহারার মানুষগুলোকেই বোঝাত। এঁদের খাদ্য সংস্কৃতি, বাসস্থান এবং পারিবারিক জীবনের নানা ক্ষত্রে আফগান আচার আচরণকে অক্ষত রেখে নিজেদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ধরে রেখেছিলেন। তবে এসবের মধ্যও তাঁদের জীবনে সংকটের অভাব ছিল না। বর্তমানে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা নানারকমের সমস্যার মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে চলেছেন। এদের সামাজিক পরিচয় এবং নাগরিকত্বের মতো সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনও সুযোগ সুবিধা না পেয়ে বিদেশি জনগোষ্ঠী হিসাবে কাবুলিওয়ালারা নিজেদের খুবই অসহায় মনে করছেন।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত কাবুলিওয়ালা কলকাতাতে আকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন তাঁরা কলকাতার 'প্রান্তিক' জনগোষ্ঠী হিসাবে রয়ে গেছে। অথচ কাবুলিওয়ালাদের পূর্বসূরী ইতিহাসের মধ্য রয়ে গেছে ভারত-আফগানিস্তান যোগের গল্পগাথা, যা মহাভারতে গান্ধারীর উপাখ্যান থেকে কুষান যুগের গান্ধার শিল্পধারার মধ্য আজও বহমান।[১০] একই সঙ্গে মধ্যযুগের ইতিহাসে বাংলার সঙ্গে আফগান যোগাযোগের যে অতীত ইতিহাস ছিল তা বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, আফগান কাবুলিওয়ালারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে যে 'আত্মপরিচয়ের সংকটের' (Identity Crisis) সম্মুখীন হচ্ছে একথা অনস্বীকার্য। আত্মপরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে তাঁদের স্থায়ী বসবাসের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেকথা ফুটে উঠেছে বারে বারে। একই সঙ্গে 'অভিবাসিত' ও 'ডায়াস্পোরা' জনগোষ্ঠী হিসাবে কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায় কলকাতার সমাজ-অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে কীভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে সে কথা উঠে আসে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাসের দৃষ্টিতে এবং গবেষণাতে কলকাতাতে বসবাসরত আফগান জনগোষ্ঠীর যে গুরুত্ব আছে তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কাজেই বর্তমান সন্দর্ভে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবন জীবিকার বহুবর্ণ দিকের উপর আলোকপাতের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি

গবেষণা সন্দর্ভটিতে ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা এবং স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার মধ্য সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কলকাতাকে। কারণ ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কাজেই বেশিরভাগ সংখ্যালঘু বৈদেশিক জনগোষ্ঠী প্রাথমিক অবস্থায় কলকাতাতে বসতি স্থাপন করেছিল। এক্ষেত্রে আফগান কাবুলিওয়ালারা কলকাতায় নিজেদের বাসস্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এছাড়া কাবুলিওয়ালাদের মধ্য একাংশ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলাগুলিতে বসতি স্থাপনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন।

গবেষণা কার্যের সময়কালকে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ১৮৯২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়সীমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সময়সীমাকে বেছে নেওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হল ১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। আবার এই সমসাময়িক সময়ে অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য বর্ডার স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিকরা যাকে 'ডুরান্ড লাইন' বলে আখ্যায়িত করেন। এই ডুরান্ড লাইন স্থাপিত হওয়ার কারণে অসংখ্য আফগান দেশান্তরিত হয়েছিলেন। যাঁদের একটা অংশ বাধ্য হয়ে ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হয়। ফলে ধরে নেওয়া হয় সেই সময় থেকেই কাবুলিওয়ালারা আগমন পর্ব শুরু হয়। আবার ২০১৬ সালে কলকাতার কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায় তাঁদের সংগঠন 'খুদাই-ই-খিদমদ্গার' (Khudai Khidmatgar) নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম কলকাতাতে সমাজসেবা মূলক কাজের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিস্থাপন করেন। একশো বছরের বেশি সময় ধরে কাবুলিওয়ালাদের কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই দীর্ঘ কালপর্বে কলকাতার কাবুলিওয়ালদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি কাবুলিওয়ালা বিষয়ক একাধিক বিষয়ের দিকে আমারা অনুধাবন করতে পারব বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি থেকে।

পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন

ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতায় আগত বিভিন্ন বিদেশি সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী নিয়ে পর্যাপ্ত সাহিত্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং ইতিহাসে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেলেও, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আগত কলকাতার আফগান 'কাবুলিওয়ালা'দের নিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তেমন কোনও ইতিহাস উঠে আসে না। একইসঙ্গে উঠে আসে না কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে ঐতিহাসিক এবং তথ্যনির্ভর আলোচনা। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ বা প্রবন্ধে ভারত আফগান সম্পর্ক বিষয়ক বিষয়ে আলোচিত হলেও, কাবুলিওয়ালা নিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচনা সমূহের অপ্রতুলতা রয়ে গেছে। বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্য সম্পর্কের প্রেক্ষিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের বিস্তারিত ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে আফগানিস্তান প্রসঙ্গ একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে৷ প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে সে কথা আমরা প্রথমে জানতে পারি। পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত একাধিক আলোচনাতে ভারত-আফগানিস্তান প্রসঙ্গ বার বার উঠে আসে। একইভাবে মধ্য যুগের ইতিহাসে ভারত-আফগান সম্পর্কের বিবিধ বিষয় ইতিহাস চর্চায় উঠে আসে। এক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবে উঠে আসে 'আকবরনামা'। এখানে ভারতের পূর্বাংশে আফগানদের বিষয়ে তথ্য ও উপকরণে পরিপূর্ণ। এরপর একে একে বাবরনামা, হুমায়ুননামা ইত্যাদি গ্রন্থগুলি থেকে বাংলার সঙ্গে আফগানদের সম্পর্ক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে। এই গ্রন্থগুলি থেকে আমরা জানতে পারি কীভাবে তুর্ক-আফগান যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের সম্পর্ক স্থাপন এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পাদিত হওয়ার ইতিহাস। পরবর্তী সময়ে বিশেষত ঔপনিবেশিক আমলে ইঙ্গ-আফগান বিষয় সম্পর্কিত ইতিহাস চর্চায় অগণিত পুস্তক, দলিল দস্তাবেজ, ঔপনিবেশক নথিতে আফগানিস্তানের কথা জানা যায়। এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দু-দেশের সম্পর্কের ইতিহাস নিয়েও উঠে আসে অসংখ্য আলোচনা। এই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আফগানদের আগমনের ইতিহাস

উঠে আসে। যার মধ্য পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহর ছিল অন্যতম। কারণ কলকাতা তখন অভিবাসিত এবং ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান পীঠস্থান। ফলে আর্মেনিয়ান, জিউস, পার্সি, চাইনিজ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, চিনা, ফরাসি, রাশিয়ান, পর্তুগিজ এবং সর্বোপরি আফগানরা কলকাতাকে বাসস্থান হিসাবে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

১৮৭০ এর দশকে আদমশুমারির মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ ও বর্ণ ইত্যাদির তথ্য উঠে আসে ঔপনিবেশিক নথিতে। প্রথম আদমশুমারি ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে ধর্মের নিরিখে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যার অবস্থান এবং তাঁদের পেশা ইত্যদি বিষয় গুরুত্ব পায়। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত মানুষের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা থেকে আগত জনগোষ্ঠীর ইতিহাস উঠে আসে। ১৮৭২ সালে H. Beverley[১১] (1872) বাংলার জনগণনাতে দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাতে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশি জনগোষ্ঠীর কথা। বেভারেলি এখানে কয়েকটি জনগোষ্ঠীর কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আফগানরা সম্ভবত মুর্শিদাবাদে নবাবের রাজদরবারে চাকরি করতেন, আর্মেনিয়ানরা মূলত কলকাতাতেই বসবাস করতেন, চিনারা জুতোর কারখানা এবং ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করতেন কলকাতা এবং ঢাকাতে। এছাড়া জিউস এবং পার্সিরা কলকাতা শহরেই বসবাস করতেন। সুতরাং ঔপনিবেশিক আমলে বেভারেলির রচনা ছিল সর্বপ্রথম বাংলা তথা কলকাতায় অবস্থিত আফগান সহ অন্যান্য বৈদেশিক সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস চর্চার অন্যতম প্রধান দলিল।

Reverond Father Jems Long তাঁর *Calcutta and its Neighborhood History of people and Localities from 1690 to 1857* [১২] (1974) গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়ে বিভিক্ত। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক লিখেছেন সেকালের কলকাতার মানুষের ইতিহাস। যেখানে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ডাচ, পর্তুগিজ, জার্মানিদের আগমনের কথা জানা যায়। এছাড়া পরবর্তী সময়ে জিউস, আর্মেনিয়ান এবং মাড়োয়ারিদের কথা জানা যায়। এই সমস্ত বিদেশি জনগোষ্ঠীর তৈরি স্মৃতি সৌধ

কলকাতার বুকে কোথায় কীভাবে রয়েছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ফুটে ওঠে। তবে আফগানদের বিষয়ে তেমন কোনও আলোচনা পাওয়া যায় না। *Calcutta Old and New* [১৩] (1907) গ্রন্থে H.E.A Cotton ও একই ভাবে বর্ণনা করেছেন কলকাতার উৎপত্তি সংক্রান্ত ইতিহাসের সঙ্গে কীভাবে ডাচ, পর্তুগিজ সহ অন্যান্য বিদেশি জনগোষ্ঠী কলকাতাতে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে তাঁরা কীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল সে বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে William Wilson Hunter এর রচিত *The Indian Musalmans* [১৪] (1876) গ্রন্থে তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের পাঠান জাতিদের কথা উল্লেখযোগ্য ভাবে উঠে আসে।

তবে শুধু ঔপনিবেশিক শাসকের রচিত ইতিহাস নয়, ভারতের নৃতাত্বিক, ঐতিহাসিক, গবেষক, সমাজবিজ্ঞানীদের লেখাতেও কলকাতাতে বসবাসরত আফগান কাবুলিওয়ালাদের কথা উঠে এসেছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব* [১৫] (১৪০০) যেখানে বাঙালির ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণের সঙ্গে প্রাচীনকালে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, বাংলার গ্রাম নগর বিন্যাস, দেশ পরিচিতি, সমাজ বিন্যাস, বর্ণ বিন্যাস সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক ও বৈদেশক বাণিজ্য বিষয়ে বাংলার অবস্থানের কথা জানা যায়। ঐতিহাসিক নীহাররজ্ঞন রায় দেখিয়েছেন কীভাবে রেশম দ্রব্য চিনের মধ্য দিয়ে সিল্করুট হয়ে আফগানিস্তান হয়ে বাংলাতে প্রবেশ করত। তবে এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ বা প্রবন্ধে ভারত আফগান সম্পর্ক নিয়ে বেশি আলোচিত হলেও কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচনা সমূহের অপ্রতুলতা রয়ে গেছে।

ঋক বৈদিক যুগে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্য সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যতার বেশ কিছু চিত্র পাওয়া যায়। যেখানে দু-দেশের মধ্য সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্কের মেলবন্ধনের ইতিহাস পাওয়া যায়। যেমন মহম্মদ আলির (Mohammed Ali) লেখা *Ariyana or Ancient Afghanistan* [১৬] (1957) গ্রন্থে আফগানিস্তানের বামিয়ানে শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং গান্ধার শিল্পের ঐতিহ্যের কথা জানতে পারা

যায়। একই সঙ্গে *'Ancient Indian Culture In Afghanistan'* নামক গ্রন্থে উপ্রেন্দ্রনাথ ঘোষাল লিখেছেন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য কীভাবে আফগানিস্তানের সঙ্গে পরস্পর সংযুক্ত ছিল। মহাকাব্যের যুগ থেকে দুটি দেশের ইতিহাসের মধ্যে একাধিক সংস্কৃতিগত এবং স্থানগত সাদৃশ্যতাও লক্ষ করা যায়। একই সঙ্গে মৌর্যযুগ থেকে কুষাণ যুগের রাজ্য সীমানা এবং কুষাণ শিল্পরীতির সঙ্গে গান্ধার শিল্পকলার সাদৃশ্যতার কথা লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর প্রবন্ধে।[১৭] (1928) এছাড়া উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন ভারতের শেষ বৌদ্ধ মূর্তিগুলির সন্ধান আফগানিস্তানেই সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

তবে আফগানিস্তান এবং আফগান বিষয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে একাধিক আলোচনা পাওয়া গেলেও, কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে আমাদের সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বিশ্বনন্দিত ছোটগল্প *'কাবুলিওয়ালা'* নামক গল্পটির মধ্য দিয়ে। গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে।[১৮] (১২৯২ বঙ্গাব্দ) মূল গল্পে রবীন্দ্রনাথ রহমত নামের একজন আফগান কাবুলিওয়ালাকে দেখিয়েছেন, যিনি ব্যাবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতাতে এসেছিলেন সুদূর আফগানিস্তান থেকে। যাঁর পেশা ছিল শুকনো ফল, হিং, সুরমার মতো দ্রব্যাদি গ্রামে গ্রামে বিক্রি করা বেড়ানো এবং মহাজনী ব্যবসা। গল্পের মাঝখানে কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠার কাহিনি ফুটে ওঠে। গল্পটি যত এগিয়ে যায় ততই ফুটে ওঠে কাবুলিওয়ালার বিস্তারিত পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গল্পের মধ্য দিয়ে যেন আভাস দিতে চেয়েছিলেন, কাবুলিওয়ালা গল্পের নায়ক রহমতের মতো এমন আরও অনেক আফগান কলকাতাতে আছেন। যাঁদের সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবন এবং অর্থনৈতিক জীবন কাবুলিওয়ালা গল্পের নায়ক রহমতের মতোই। সুতরাং কাবুলিওয়ালা গল্পের এই ছোট্ট পরিসরে উঠে আসে কলকাতার কাবুলিওয়াদের খণ্ড খণ্ড জীবনের সময়চিত্র। তবে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রহমতের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উঠে এলেও সমগ্র কাবুলিওয়ালাদের সামগ্রিক চিত্র ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সেভাবে উঠে আসেনি। এছাড়া রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে কাবুলিওয়ালাদে জীবন-জীবিকার মধ্য যে বহুবিধ পরিবর্তন এসেছিল সে কথা জানবার

অবকাশ কাবুলিওয়ালা গল্পের মধ্য পাওয়া যায় না। কাজেই বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটিতে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মধ্য বসবাসরত কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে সামগ্রিক চিত্রকে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা *দেশে বিদেশে* [১৯] (১৯৪৮) গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম এক আকরগ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। মুজতবা আলী তার নিজস্ব সহজাত শৈল্পিক কাব্যগুণের মাধ্যমে গ্রন্থটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক যুগের অনেক অজানা গল্পকথা ও ইতিহাস। মূল গল্পে তিনি ভারত আফগানিস্তানের মধ্য প্রাচীন সম্পর্ক, আফগানিস্তানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন, আফগান রূপকথার বৈচিত্র্য, আফগানিস্তানের বিস্তীর্ণ সময়ের রাজনীতি, গৃহযুদ্ধ, ব্রিটিশ আমলের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। আবার কাবুলিওয়ালাদের কথাও সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। যেখান থেকে জানা যায় কাবুলিয়ালারা আফগানিস্তানের কোন প্রদেশগুলি থেকে কলকাতায় এসেছিলেন এবং কোন পথ দিয়ে তাঁরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করতেন। এছাড়া তাঁদের খাদ্যাভাস এবং সাংস্কৃতিক জীবনের একাধিক চিত্র গ্রন্থটিতে উঠে আসে। তবে গ্রন্থের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে আছে আফগানিস্তানের বর্ণনা, রাজা বাদশাদের সময়ের একাধিক কাহিনি। তবে গ্রন্থটিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে সে সমস্ত তথ্য উঠে আসে তা নিতান্ত যৎসামান্য। তাঁর লেখা অন্য আর একটি গল্প *শবনম* [২০]। (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) এই গল্পের মধ্য দিয়েও আফগানিস্তানের ইতিহাসের কয়েকটি প্রচ্ছন্ন দিক উঠে আসে। যেখানে কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অপ্রতুলতা আছে।

১৩৬৯ বঙ্গাব্দে শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *পথ-চল্‌তি* [২১] (১৯৬০) গ্রন্থে বারোটি প্রবন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্য অন্যতম একটি ছিল ‘কাবুলিওয়ালার সহযাত্রী’ নামক গল্পটি। এই গল্পের মধ্য কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে অনেকটা তথ্য উঠে আসে। যেমন কাবুলিওয়ালাদের ভাষা, তাঁদের খাদ্য, পাঠান উপজাতির শ্রেণিবিভাগ এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের বরিশালের পটুয়াখালিতে যে কাবুলিওয়ালাদের সুদের কারবার ছিল, সে কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। সুনীতি বাবু আরও দেখিয়েছেন বরিশালের কাবুলিওয়ালারা তাঁদের নিজেদের ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে যেমন দক্ষতা ছিল, তেমনই

বরিশালি ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে তাঁদের সমান দক্ষতা ছিল। তবে তাঁরা কলকাতার বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারতেন না। এছাড়া শ্রী রমানাথ বিশ্বাসের লেখা *আফগানিস্তান ভ্রমণ* [২২] (১৯৪৩) নামক গ্রন্থে তিনি আফগানিস্তানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটির মধ্য কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে লিখতে গিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেমন এঁরা সুদের ব্যবসা করার জন্য কলকাতায় আসতেন এবং কলকাতাতে যে সমস্ত কাবুলিওয়ালারা আসতেন তাঁদের মধ্য শুধুই যে মুসলিম পাঠান ছিলেন তা নয়। অনেকেই এমন আছেন যাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ের। এছাড়া গ্রন্থটিতে তিনি দেখিয়েছেন আফগানিস্তানে কীভাবে বাঙালি পরিবারের মেয়েরা কাবুলিওয়ালাদেরকে বিয়ে করে সংসার জীবন অতিবাহিত করছেন। তবে এখানেও কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালাদের বর্ণনা বিস্তারিত ফুটে ওঠে না। সুতরাং উক্ত গবেষণা সন্দর্ভে কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিত আলোচনায় অবকাশ রইল।

সাম্প্রতিক সময়ে *কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ*[২৩] (১৯৯৮) গ্রন্থটিতে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে একেবারে অন্য এক চিত্র চিত্রায়িত করেছেন। গল্পটি লেখিকার জীবনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ। যেখানে জাম্বাজ নামের এক আফগান কাবুলিওয়ালার সঙ্গে লেখিকার প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং আফগানিস্তানের কঠিন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশের মধ্য কাটানোর দীর্ঘ সময়ের দিনলিপি বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে উঠে এসেছে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবনের একাধিক দিক। বিশেষত কলকাতা শহরে তাঁদের আগমনের কাহিনি, তাঁদের বসতি স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশাগত জীবন, আফগানিস্তানে বাঙালি নারীর অবস্থা এবং ধর্মীয় মৌলবাদ সম্পর্কিত একাধিক প্রসঙ্গ। তবে এখানেও কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে সামগ্রিক তথ্য উঠে আসে না। সুস্মিতা বন্দোপাধ্যায়ের লেখা আফগানিস্তান সম্পর্কিত লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ *মোল্লা ওমর তালিবান ও আমি*[২৪] (২০০১) এবং *এক বর্ণ মিথ্যে নয়* [২৫] (২০০২) গ্রন্থগুলিতেও উঠে আসে আফগানিস্তান সম্পর্কিত একাধিক অজানা ইতিহাস।

কাবুলিওয়ালাদের অন্যান্য অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য অন্যতম ছিল সুদের ব্যবসা। এই সুদের কারবার পরিচালনা করার কারণে অনেক সময় তাঁরা এ-দেশীয় লোকেদের নিয়োগ করতেন। বাংলা গল্প সংকলনে *সুলেমানের বিচার* [২৬] (২০১৬) নামক গল্পে সুব্রত সেনগুপ্ত এই একই বিষয়ের উপরে আলোকপাত করেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র সুলেমানের কাজ ছিল কাবুলিওয়ালাদের অনাদায়ে পড়ে থাকা সুদের টাকা আদায় করা। এই গল্পের মাধ্যমে জানা যায় কীভাবে কাবুলিরা সুদের টাকা আদায় করতেন বাজার থেকে। আবার *কাবুলের পথে পথে* [২৭] (২০০৯) নামক গ্রন্থে পান্থজন বর্ণনা করেছেন আফগানিস্তান বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনালোচিত ইতিহাস। যেখানে আফগান স্বাস্থ্য, বিয়ে, খাদ্য, আফগান নারীদের কথা তুলে ধরেছেন। এখানেও কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে আলোচিত হলেও তা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। এছাড়া অমিতাভ রায়ের লেখা *কাবুলনামা* [২৮] (২০১০) গ্রন্থে আফগানিস্তান বিষয়ে বেশকিছু তথ্য উঠে আসে। এছাড়া সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর লেখা *সীমান্তের অন্তরালে* [২৯] (২০১৭) গ্রন্থেও কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে খুবই স্বল্প পরিসরে আলোচিত হয়েছে। এখানে কোন পথ দিয়ে কাবুলিওয়ালারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হলেও কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে আলোচনা ইতিহাসের প্রেক্ষিতে অপ্রতুল আছে।

The Kabuliwalas: Afghan moneylending and the credit cosmopolis of British India 1880-1947[৩০] (2020) নামক প্রবন্ধে H.William Warner কাবুলিওয়ালাদের সুদের ব্যবসার উপরে মূলত আলোকপাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আফগানিস্তানের কোন অঞ্চলের পাঠানরা সুদের ব্যবসাতে নিযুক্ত ছিলেন এবং ভারতের কোন প্রদেশগুলি থেকে এঁরা সুদের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। লেখক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখিয়েছেন ঠিক কত সংখ্যক কাবুলিওয়ালারা সুদের ব্যবসাতে জড়িত ছিলেন। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কাবুলিওয়ালারা এই সুদের ব্যবসা করতে গিয়ে কীভাবে কলকাতার মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ফলে একটা সময়ের পরে তাঁরা এই মহাজনি ব্যবসা থেকে অব্যহতি নিয়ে অন্য কাজ খুঁজতে উদ্যত হয়েছিলেন। *My Enemy's Enemy* [৩১] (2017) গ্রন্থে *Avinash Paliwal' তাঁর Kabuliwallah A*

Brief History of India- Afganisthan নামক প্রবন্ধে লিখেছেন ভারত-আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্মাণে আফগান কাবুলিওয়ালাদের ভূমিকা কেমন ছিল। তবে উক্ত প্রবন্ধের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। *Afghan Hindus and Shikh*[৩২] (2019) গ্রন্থে Indrajeet Singh আফগান শিখ ও আফগান হিন্দুদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে উক্ত প্রবন্ধ এবং গ্রন্থগুলিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সামগ্রিক আলোচনার অপ্রতুলতা রয়েছে।

Afghan Refugee In Indo-Afghan Relation[৩৩] (2013) প্রবন্ধে Anne Sophie Bentz এবং *India's relation with Afghanistan*[৩৪] (2011) প্রবন্ধে রাখব শর্মা ব্যাখ্যা করেছেন আফগানিস্তানের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থাতে ভারত কীভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ক্রমাগত।*The Boat People: The UNHCR and Afghan Refugees', 1978-1989*[৩৫] (2013) তে Jaci Eisenberg দেখিয়েছেন ভারতে বসবাসরত আফগান শরণার্থীর অবস্থা এবং ভারত এই শরণার্থীদের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। ভারত সরকার শরণার্থী বিষয়ক আইন মোতাবেক আফগান অভিবাসিত নাগরিককদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন সেই বিষয়ে একাধিক তথ্য উঠে আসে। আবার Asish Bose এর লেখা *Afghan Refugee in India*[৩৬] (2004) প্রবন্ধে ভারতে অবস্থিত আফগান শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিবাসিদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। যাঁরা দিল্লি ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে দীর্ঘদিন বসবাস করছেন। আশিস বোস আরও দেখিয়েছেন *UNCHER* এর তথ্য অনুযায়ী ভারতে আফগান অভিবাসিত মানুষের অবস্থানের কথা। এখানে তিনি আফগান কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে আংশিক আলোচনা করেছেন। দেখানো হয়েছে কাবুলিওয়ালাদের মহাজনি কারবারের প্রসঙ্গ, কাবুলি চানা বিক্রেতা থেকে তাঁদের 'কাবুলিওয়ালা' নামে ভূষিত হওয়ার প্রসঙ্গ এবং পরবর্তীকালে আফিম ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরে তাঁদের হাতে যে প্রচুর টাকা পয়সা আসে এবং তা দিয়েই বাংলাতে সুদের কারবার শুরু করে। তবে এখানেও আফগান অভিবাসী নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক

অবস্থার কথা বড় করে দেখানোর প্রয়াস নেওয়া হলেও কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে তেমন কোনও আলোচনার অবকাশ পাওয়া যায় না।

হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা গুপ্তা, শিপ্রা মুখার্জী সম্পাদিত *'Calcutta Mosaic Essaysa and Minority Communities of Calcutta*[৩৭] (2012) গ্রন্থে কলকাতার সংখ্যালঘু দেশি এবং বিদেশি জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এখানে আর্মেনিয়ান, জিউস, চিনা, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, সিন্ধি, শিখ, দক্ষিণ ভারতীয় ইত্যাদি জনগোষ্ঠির কথা উঠে এসেছে। কলকাতাতে তাঁদের বাসস্থান, জনসংখ্যার অনুপাত, পেশা, খাদ্য ইত্যদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা পাওয়া যায়। তবে গ্রন্থটিতে আফগান কাবুলিওয়ালা জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কোনও ইতিহাস উঠে আসে না। সুকান্ত চৌধুরী তাঁর *Calcutta The living city*[৩৮] (1990) নামক দুই খণ্ডের গ্রন্থে কলকাতার ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। যেখান 'চিতপুর' নামক (Chitpur) প্রবন্ধে বাণী গুপ্তা ও জয়া চাহলিয়া স্বল্প পরিসরে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে দেখানো হয়েছে কাবুলিওয়ালারা কলকাতার মোমিনপুরে জুতোর (Chappal) ব্যবসাতে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া *Muslims of Calcutta*[৩৯] (1974) গ্রন্থে M.K.M Siddique তুলে ধরেছেন কলকাতার মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক ইতিহাসকে। যেখানে বিদেশি মুসলিম জনগোষ্ঠী হিসাবে আফগান কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে একাধিক তথ্য উঠে আসে। যেমন কাবুলিওয়ালাদের আদি বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মীয় রীতিনীতি, আফগান বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে নানা রকমের তথ্য উঠে আসে। তবে উক্ত গ্রন্থগুলিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অপ্রতুলতা রয়ে গেছে।

New Faces in old Calcutta[৪০] (2008) গ্রন্থে পীযূষ কান্তি রায় কলকাতার ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি কলকাতার জিউস, আর্মেনিয়ান, চিনা, ফার্সি, গ্রিক, পর্তুগিজ, অ্যাংলো- ইন্ডিয়ান প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের কথা আলোচনা করেছেন। তবে কলকাতার অভিবাসী জনগোষ্ঠীর কাবুলিওয়ালাদের উপরে তিনি কোনও আলোকপাত করেননি গ্রন্থটিতে। *Home, city and Diaspora:*

Anglo-Indian and chinese attachment to calcatta[৪১] (2012) তে এলিসন ব্লুন্ট ও জয়ানি ব্যনার্জি কলকাতার ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠী হিসাবে 'চিনা' এবং 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান'দের কথা উল্লেখ করলেও কলকাতার অন্যান্য ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীদের বিষয়ে আলোকপাত করেননি। এছাড়া কলকাতার বিদেশি জনগোষ্ঠী বিষয়ে লিখিত একাধিক গন্থ, প্রবন্ধ এবং সূত্রগুলি থেকে কলকাতার আফগান জনগোষ্ঠীদের বিষয়ে খণ্ড খণ্ড সময়চিত্র উঠে আসলেও, তাঁদের সামগ্রিক চিত্র উঠে আসে না। এছাড়া বিলাল সেখ রচিত *Pattern of Afghan Migration to India during Medieval Period* [৪২] (2016) প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন মধ্যযুগে আফগানরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন দিল্লি সুলতানের অধীনে সামরিক বাহিনীতে চকরির খোঁজে। আবার অনেকেই এসেছিলেন ব্যবসা বাণিজ্যের খোঁজে। বিলাল সেখের এই প্রবন্ধে সুলতানি যুগ থেকে মুঘল যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসনের কারণ সন্ধানের প্রচেষ্টা করা হলেও সাম্প্রতিককালে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের উপরে তিনি আলোকপাত করেননি।

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কলকাতার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় [৪৩] (২০০৩) গ্রন্থে শেখ মকবুল ইসলাম কলকাতার মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে কলকাতার পত্তন, নগর কলকাতার বিকাশে মুসলিমদের ভূমিকা, কলকাতার মুসলমানদের জীবিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন একইসঙ্গে কলকাতায় বসবাসরত দেশি বিদেশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস লিখেছেন। যাদের মধ্য আফগানদের কথা লিখতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কান্দাহার, মাজারশরিফ, গজনি থেকে কাবুলিওয়াদের কলকাতাতে আগমন ঘটেছিল। একই সঙ্গে গ্রন্থটিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ভাষা, সুদের কারবার ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তবে গ্রন্থটিতে কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে কলকাতার প্রেক্ষিতে বিস্তারিত তথ্য উঠে আসে না। *কলকাতার প্রতিবেশী* [৪৪] (২০০২) গ্রন্থে পীযূষ কান্তি রায় আলোচনা করেছেন কলকাতাতে বসবাসরত চিনা, আর্মানি, ইহুদি, পার্শি এবং শিখ জনগোষ্ঠীর কথা। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবন, ভাষা, ধর্মস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উঠে এলেও কলকাতার অন্যতম বিদেশি জনগোষ্ঠী আফগান কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ইতিহাসের আলোকে উঠে আসে না।

মোঃ ফজলুল হকের লেখা *আফগানিস্তানের ইতিহাস*[৪৫] (২০১৭), দেবাশিশ চক্রবর্তী, অধৃষ্য কুমার এবং স্বাতী বিশ্বাসের সম্পাদিত *আফগানিস্তান এবং সমসাময়িক বিশ্ব*[৪৬] (২০০১)ও Shaista Wahab এবং Barry Youngerman *রচিত A Brief History of Afganisthan*[৪৭] (2010) গ্রন্থগুলিতে আফগানিস্তানের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আফগান জনজাতির ভাষা ও গোষ্ঠী সম্পর্কে একাধিক তথ্য উঠে আসে। যার মধ্য দিয়ে কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তবে গ্রন্থগুলিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে আলোচনার পরিসর খুবই সংক্ষিপ্ত।

রমেশচন্দ্র চন্দের লেখা *গান্ধারীর দেশে*[৪৮] (২০২১) এবং *গাঁ শহর বিভূঁই দিল্লি ও কাবুল*[৪৯] (২০১০) গ্রন্থে কাবুলের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আফগানিস্থান থেকে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত আফগানিস্তানের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এরই মাঝে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পাকিস্তান লাগোয়া ‘পাক্তিয়া’ বা ‘পাকতিয়া’ অঞ্চলে থেকে ভারতে আগমনের ইতিহাস উঠে আসে। একই সঙ্গে লেখক পাখতুনিস্তানের পাখতুন জনগোষ্ঠীর অভ্যুদয় ও আফগান রাষ্ট্রের গোড়া পত্তনের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছেন।

এছাড়া কলকাতা বিষয়ক একাধিক পত্র পত্রিকা, প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে খণ্ড খণ্ড চিত্র উঠে আসে। যেমন অতুল সুরের লেখা *৩০০ বছরের কলকাতা* [৫০] (২০১৪), রাধারমণ রায়ের লেখা *কলকাতা বিচিত্রা* [৫১] (১৯৯১) এবং নিখিল সুরের লেখা *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা* [৫২] (২০১৫) নামক গ্রন্থগুলিতে কলকাতার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাবুলিওয়াদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উঠে এসেছে। তবে আফগান কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে গ্রন্থগুলিতে পর্যাপ্ত তথ্য উঠে আসে না। তাই আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে ‘কাবুলিওয়ালা’ এবং ‘কলকাতার আফগান’ জনগোষ্ঠীদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য ভারত আফগানিস্তান সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে কলকাতাতে বসবাসরত আফগান কাবুলিওয়ালাদের আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়

ও রাজনৈতিক জীবনের উপরে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং সন্দর্ভটির মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পরিচয়, তাঁদের পেশাগত জীবন ও তাঁদের বেঁচে থাকার কৌশল এবং সর্বোপরি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক অবস্থান এবং ধর্মীয় জীবনের একাধিক বৈচিত্র্যের কথা তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এছাড়া 'আত্মপরিচয় সংকট' কীভাবে তাঁদের জীবনের উপরে প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

গবেষণা প্রকল্প

কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্য আফগানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল অনেকখানি নিম্নমুখী। ব্রিটিশ ভারতে আফগান কাবুলিওয়ালারা সূদুর আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শুকনো ফল, আতর, সুরমা ইত্যাদি নিয়ে কলকাতাতে ব্যবসা বাণিজ্যের পসড়া সাজিয়েছিলেন। ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবন ছিল স্বাধীন ও স্বচ্ছল। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে আফগানিস্তান থেকে এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসতে তাঁদের বেশ সমস্যার মধ্য পড়তে হয়। একই সঙ্গে কলকাতার অর্থনৈতিক মানচিত্রে তাঁদের মানিয়ে নিতে অসুবিধা হতে থাকে। এর ফলে তাঁরা সংকটের মধ্য পড়তে বাধ্য হয়। তবে বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের পর থেকে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা আবার উন্নতি সাধন করতে শুরু করে। কারণ এই সময় থেকে ভারত আফগানিস্তান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নতি হতে থাকে, এছাড়া শহর কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা নিত্য নতুন পেশা গ্রহণ করতে থাকে। বর্তমানে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা এই শহরে নিজেদের আত্মপরিচিতি নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং ক্রমশ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে। গবেষণা সন্দর্ভটিতে এই আলোচনার রেশকে উল্লেখ্য করে কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হল।

- ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতার বিভিন্ন অভিবাসিত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্য আফগান কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল খানিকটা অনগ্রসর।
- ঔপনিবেশিক ভারতে খুব সহজেই আফগানিস্তান থেকে বিভিন্ন রকমের ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য আমদানি করা যেত ফলে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে তাঁরা ছিলেন অনেকটা স্বাধীন ও স্বচ্ছল।
- স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে এক দেশ থেকে অপর দেশে অবাধ যাতায়াতের ক্ষেত্রে নানা রকমের নিয়মকানুন ও নির্দেশিকা জারি হওয়ার ফলে কাবুলিওয়ালা সংকটের মধ্য পড়ে যায়। ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনে একাধিক সমস্যা দেখা দেয়।
- নব্বইয়ের দশকের পর থেকে ভারত আফগানিস্তান আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন হওয়াতে পুনরায় আবার যোগাযোগের ক্ষেত্র নির্মাণ হয়। তবে নাগরিকত্বের সমস্যা তাঁদের জীবনে অন্যতম সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়।
- সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা পেশাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কলকাতার সাধারণ মানুষের মতো তাঁরা পেশা গ্রহণ করতে উদ্যত হতে থাকেন এবং এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নিজেদের অভিযোজন করে চলেছেন প্রত্যেক মুহূর্তে।

গবেষণা সম্পর্কিত প্রশ্ন

সন্দর্ভের মূল প্রকল্পগুলিকে সামনে রেখে বর্তমান সন্দর্ভে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন-

১. ঔপনিবেশিক আমলে কীভাবে কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?

২. ব্রিটিশ ভারতে আফগান কাবুলিওয়ালারা কীভাবে কলকাতার অর্থনীতির সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল?

৩. স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা কীভাবে নিজেদের অভিযোজিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন?

৪. ভারত-আফগানিস্থান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাব কাবুলিওয়ালাদের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল?

৫. কলকাতার মিশ্র অর্থনৈতিক জীবন এবং কাবুলিওয়ালাদের নিজেস্ব পেশার ধরন কীভাবে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল?

গবেষণার উপাদান

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটিকে পূর্ণতা দান করার জন্য প্রাথমিক/ মুখ্য উপাদানের হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ঔপনিবেশিক বাংলার আদমশুমারির তথ্য, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উল্লেখযোগ্য নথিপত্র (Calcutta Municipal Corporation), ভারতীয় জাতীয় লেখ্যগার (National Archives of India), পশ্চিমবঙ্গ লেখ্যগারের (West Bengal State Archives) উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কিত মুখ্য গ্রন্থাবলি, বিভিন্ন গেজেটিয়ার তথ্য, আফগান বিষয়ক বিভিন্ন আকর গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং প্রবন্ধ। এছাড়াও বিভিন্ন সংবাদপত্র, জার্নাল থেকে প্রকাশিত তথ্য ইত্যাদি। এর সঙ্গে মুখ্য উপাদান হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে আহৃত তথ্য। এছাড়া কলকাতা সহ তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের উপরে পর্যবেক্ষণ (ক্ষেত্রসমীক্ষা) করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গবেষণা সন্দর্ভ, এছাড়া বৈদুতিন মাধ্যম (ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট) থেকে সংগৃহীত তথ্য উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এই সমস্ত তথ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন এবং ইতিহাসের যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব এই গবেষণা সন্দর্ভ নির্মাণে মুখ্য ও গৌণ দুই ধরণের উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভ সমীক্ষা, তথ্য ও তত্ত্বের মেলবন্ধন নির্মিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণাপত্র নির্মাণের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন প্রথম পর্যায়ে-

তথ্য সংগ্রহ করা, এগুলি বিভিন্ন লেখ্যগার, গ্রন্থাগার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে-সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সঠিকভাবে চয়ন করে তার ব্যবহার করা এবং সবশেষে নির্বাচিত তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত বা উপসংহারে উপনীত হওয়া। গবেষণার মূল উপাদানগুলি কলিকাতা জাতীয় গন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা লেখ্যগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার লাইব্রেরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা মেট্রোপলিটন লাইব্রেরি, ও বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠিত গন্থাগার, এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বা সংবাদপত্রের লেখ্যগার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সব উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থের বক্তব্যও এখানে সমান্তরালভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

বর্তমান সন্দর্ভটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। ভূমিকাতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, সাহিত্য অভীক্ষা, উদ্দেশ্য, গবেষণা সম্পর্কিত প্রশ্ন, গবেষণার উপাদান, পদ্ধতি ও প্রতি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে: ভারত আফগানিস্থান ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে দু-দেশের মধ্য সম্পর্কের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ এবং আফগানদের ভারত আগমনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে দু-দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাব কীভাবে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের উপরে পড়েছিল। এক্ষেত্রে তথ্যের উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে: আলোচিত হয়েছে কলকাতার অভিবাসনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবং কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়া অধ্যায়টিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কলকাতার অন্যান্য অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের পার্থক্য কোথায়। একই সঙ্গে এই সমস্ত অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্য কাবুলিওয়ালারা ‘প্রান্তিক’ ও ‘ডায়াস্পোরা’ জনগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত কিনা সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া কাবুলিওয়াদের জীবনে কীভাবে আত্মপরিচয়ের সংকট নেমে

এসেছে তার নিরিখে বাস্তুচ্যুতি এবং নাগরিকত্বের মতো সমস্যার উপরে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে: আলোচিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে আফগান কাবুলিওয়ালাদের কলকাতাতে আগমনের প্রেক্ষাপট এবং বসতি স্থাপনের কারণ। এছাড়া আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা, ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে তাঁদের অন্য দেশে দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল। একই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে সমসাময়িক সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার গুরুত্ব এবং কলকাতাতে কাবুলিওয়ালাদের আগমনের প্রাথামিক পর্বের ইতিহাস। সর্বোপরি শহর কলকাতার সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের সম্পর্কের গোড়ার কথা এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে: আলোচনা করা হয়েছে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের পর্যালোচনা। অধ্যায়টিতে আলোচিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক জীবন কেমন ছিল এবং তাঁরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রথম দিকে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনের ধরন কেমন ছিল এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কী কী পরিবর্তন এসেছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তাঁদের সামাজ জীবনের অঙ্গ হিসাবে তাঁদের পারিবারিক জীবন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অঞ্চলগত বিভাজন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে তাঁরা কীভাবে রাজনীতির আঙিনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে স্বজাতির উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে: কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে কলকাতার সংস্কৃতির সঙ্গে কাবুলিওয়ালারা কীভাবে নিজেদের সংস্কৃতিকে সম্পৃক্ত করেছিলেন এবং একই সঙ্গে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ফলে তঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন, সাজসজ্জা খাদ্য সংস্কৃতি, খেলাধূলা ও শরীর চর্চা, ভাষার মতো বিষয় গুলিকে গভীরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ধর্মীয়

জীবনের ক্ষেত্রে তাঁদের ধর্মীয় কার্যকলাপের বিভিন্ন দিকের মধ্যে তাঁদের ধর্মীয় জীবন, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের উপরে আলোচিত হয়েছে। সবশেষে উপসংহারে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সার্বিক ইতিহাস তথা গবেষণার মূল বক্তব্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংযোজনীতে গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্য, চিত্র, মানচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আর গবেষণায় ব্যবহৃত উপাদান ও সহযোগী উপাদানগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে।

টীকা ও সূত্র-নির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *কাবুলিওয়ালা,* (বিশ্বভারতী, সাধনা পত্রিকা, ১২৯৯)।

২. রবীন্দ্রনাথ: *চিঠিপত্র, নবম খন্ড,* ৪৫ নং চিঠি, (বিশ্বভারতী, ১৯৬৪)।

৩. শ্রী সীতা দেবী: *পুণ্যস্মৃতি,* (কলকাতা, মৈত্রী পরিবেশক, ১৯৬৪) পৃ. ১৭৮।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *জীবনস্মৃতি,* (কলকাতা, বিশ্বভারতী, প্রবাসী, ভাদ্র ১৯৩১) বিশ্বভারতী, পৃ. ৪৭।

৫. *তদেব*: পৃ. ৪৭।

৬. Arka Biswas: *Durand Line: History, Legality and Future,* (Vivekananda International Foundation, 2013).

৭. IB File: *236/1939 Afghan National in Calcutta, North 24 Parganas* এর ফাইলগুলি দেখুন।

৮. H. William Warner: *The kabuliwalas: Afghan Moneylending and the credit cosmopolis of British India, c 1880-1947,* (Delhi, The Indian Economic and Social History Review, sage Publication, 2020) পৃ.১৮৬। এছাড়া কাবুলিওয়ালাদের সুদের ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য জানতে আরও দেখুন নাজিয়া আফরিন: *কাবুলিওয়ালার খোঁজে,* (বাংলাদেশ, বিডিনিউজ টোয়েন্টি ফোর ডটকম)।

৯. Moaka Najib and Najesh Afroz: *Kabul to Kolkata,* (Kolkata, BBC News, 2015).

১০. Vesdev: *The Mahabharata* বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন শ্লোক- ২৫৭, ৩২৬, ৫০৩, ১১৮৮ ও ১১১০, ৬১৯। এছাড়া আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন Upendra Nath

Ghoshals: *Ancient Indian Culture in Afghanistan,* (Calcutta, Greater India Society, Bulletin No-5, 1928).

১১. H. Beverley: *Report on the Census of Bengal 1872,* (Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1872).

১২. Reverend Father James Long: *Calcutta and its Neighborhood: History of the People and localities from 1690 to 1857,* (Calcutta Indian Publication, Calcutta, 1974).

১৩. H.E.A Cotton: *Calcutta Old and New,* (Calcutta, W. Newman & Company, 1907).

১৪. W.W Hunter: *The Indian Musalmans,* (London, Trubner & Co., 1876).

১৫. নীহাররঞ্জন রায়: *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* (কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০)।

১৬. Mohammad Ali: *Ancient Afghanistan,* (Kabul, Historical Society of Afghanistan, 1957).

১৭. Upendra Nath Ghoshal: *Ancient Indian Culture in Afghanistan,* (Calcutta, Greater India Society, Bulletin No-5, 1928).

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *কাবুলিওয়ালা,* (বিশ্বভারতী, সাধনা পত্রিকা, ১২৯৯)।

১৯. সৈয়দ মুজতবা আলী: *দেশে বিদেশে,* (কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৬)।

২০. সৈয়দ মুজতবা আলী: *শবনম,* (কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মাঘ ১৩৬৭)।

২১. শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়: *পথ চল্‌তি,* (কলকাতা, ব্‌াক সাহিত্য প্রা: লি:, ১৯৬০) পৃ.পৃ ১২৬-১৩৪।

২২. শ্রী রমানাথ বিশ্বাস: *আফাগানিস্থান,* (কলকাতা, কোরক, প্রথম সংস্করণ ২০২০)।

২৩. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়: *কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ,* (কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ২০০১)।

২৪. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়: *মোল্লা ওমর তালিবান ও আমি,* (কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ২০০২)।

২৫. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়: *এক বর্ণও মিথ্যে নয়,* (কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ২০০১)।

২৬. সুব্রত সেনগুপ্ত, সুনিল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.): *সুলেমানের বিচার,* (কলকাতা, সাহিত্য আকাডেমি, ২০১৬)।

২৭. পান্থজন: *কাবুলের পথে পথে,* (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯)।

২৮. অমিতাভ রায়: *কাবুল নামা,* (কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১০)।

২৯. সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী: *সীমান্তের অন্তরালে,* (কলকাতা, জয়ঢাক প্রকাশনা, ২০১৭)।

৩০. H. William: *The Kabuliwalas: Afghan Moneylending and the credit cosmopolis of British India, c 1880-1947,* (New Delhi, Economic and Social History Review, Sage Publication, 2020).

৩১. Avinash Paliwal*: My Enemy's Enemy: India in Afghanistan from the Soviet Invention to the US Withdrawal,* (United Kingdom, C. Hurst & Co. Publishers Ltd., 2017).

৩২. Indrajit Singh: *Afghan Hindus and Sikhs,* (New Delhi, Readomania Publishing, 2019).

৩৩. Anne Sophie Bentz: *Afghan Refugees in Indo-Afghan Relation,* (Cambridge Review of International Affairs, 2013).

৩৪. Raghav Sharma: *India's Relation with Afganistan, Davied Scott (Ed.) Handbook of Indias International Relation,* (United Kingdom, Routledge, 2011).

৩৫. Jaci Eisenberg: The Boatless People, The UNHCR and Afghan Refugees, 1978-1989, (Geneva, Working Papers in International History, 2013), পৃ.পৃ.২৪-২৫।

৩৬. Ashish Bose: Afghan Refugees in India, (Economic and Political Weekly, vol. 39, No. 43, October, 2004).

৩৭. Himadri Banerjee, Nilanjana Gupta, Sipra Mukherje (ed): *Calcutta Mosaic: Essays and Interviews on the Minority Communities of Calcutta,* (Delhi, Anthem press, 2012).

৩৮. Sukanta Chaudhuri (ed): *Calcutta The Living City,* (Calcutta, Oxford University Press, Vol-I, The Past, 1990), পৃ.৪০।

৩৯. M.K.A Siddique: *Muslims of Calcutta,* (Kolkata, Anthropological Survey of India, September 1974).

৪০. Pijush Kanti Roy: *New Face in Old Calcutta,* (Kolkata, Sarat Book Distributors, 2008).

৪১. Alison Blunt and Jayani Bonnerjee: *Home, City and Diaspora: Anglo-Indian and Chinese attachments to Calcutta,* (London, Queen Mary University, School of Geography, 2012).

৪২. Bilal Sheikh: *Pattern of Afghan Migration to India during Medieval Period,* (Kerala, Indian History Congress, 77th Session, 2016).

৪৩. শেখ মকবুল ইসলাম: *ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কলকাতার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়,* (সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৩)।

৪৪. পীযুষ কান্তি রায়: *কলকাতার প্রতিবেশী,* (কলকাতা, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কলকাতা পৌরসংস্থা, ২০০২)।

৪৫. মোঃ ফজলুল হক: *আফগানিস্তানের ইতিহাস ১৭৪৭-১৯৭৮,* (রাজশাহী, পাপিয়া সুলতানা, মার্চ ২০১৭)।

৪৬. দেবাশিশ চক্রবর্তী, অধৃষ্য কুমার, স্বাতী বিশ্বাস (সম্পা.): *আফগানিস্তান এবং সমসাময়িক বিশ্ব,* (কলকাতা, ন্যশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১)।

৪৭. Shaista Wahab and Barry Youngerman: *A Brief History of Afghanistan,* (New York, Fact on File an imprint of Infobase Publishing, Second edition, 2010).

৪৮. রমেশচন্দ্র চন্দ: *গান্ধারীর দেশে,* (কলকাতা, সেরিবান, নভেম্বর ২০২১)।

৪৯. রমেশচন্দ্র চন্দ: *গাঁ শহর বিভুঁই দিল্লি ও কাবুল,* (কলকাতা, একুশ শতক, আগস্ট ২০১০)।

৫০. অতুল সুর: *৩০০ বছরের কলকাতা পটভূমি ও কলকাতা,* (কলকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ২০১৪)।

৫১. রাধারমণ রায়: *কলকাতা বিচিত্রা,* (কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯১)।

৫২. নিখিল সুর: *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* (কলকাতা, সেতু পাবলিশার্স, ২০১৫)।

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং বিবর্তনের ধারা

ভারতবর্ষের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সম্পর্কের ইতিহাস বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই সমস্ত উপাদানের উপরে নির্ভর করে খ্রিস্টপূর্ব সহস্রাব্দ বছরের ইতিহাস রচিত হয়েছে। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে আফগানিস্তান এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশ। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে আফগানিস্তানের এই যোগাযোগ। প্রাচীনযুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে ইতিহাস ও ঐতিহ্য ছিল তার সঙ্গে আফগানিস্তানের সংস্কৃতির বেশ কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। পৌরাণিক কাল থেকে আফগানিস্তানকে যদি দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে একাধিক 'সাম্রাজ্য' এবং 'সংস্কৃতির' প্রবেশ ঘটছে দেশটির মধ্য দিয়ে। এর মধ্যে একদিকে পারস্য সম্রাট সাইরাসের সাম্রাজ্য, আলেকজান্ডার দি গ্রেটের গ্রিক সাম্রাজ্য, অন্যদিকে ভারতীয় মৌর্য সাম্রাজ্য থেকে কুষাণ যুগ পর্যন্ত দেশটির বিস্তৃতি লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে একে একে হূণ, ঘোরি, মুঘল এবং দুরানী সাম্রাজ্যের আধিপত্যবাদের মধ্য দিয়ে যেতে হয় আফগানিস্তানকে। আফগানিস্তানের উপরে বিদেশিদের এই আধিপত্যবাদের ইতিহাস যুগ যুগ ধরে বহমান। এরই মধ্যে ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক নির্মাণের পথ প্রশস্ত হয়। যার স্থায়িত্ব আজও ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই পর্বের সূচনা হরপ্পা থেকে শুরু করে বৈদিক যুগ, মৈর্য যুগ, গুপ্ত যুগ এবং কুষাণ যুগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল।

প্রাচীন যুগে ভারত এবং আফগানিস্তান সম্পর্ক স্থাপনের সমীকরণ যেমনটা ছিল, মধ্যযুগে এই সম্পর্কের রসায়ন অনেকটা পরিবর্তিত ও প্রসারিত হয়েছিল। মধ্যযুগে আফগানরা ভারতে এসেছিলেন মূলত লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ নিয়ে। আদি-মধ্য যুগে আফগান শাসক গোষ্ঠী অভিবাসনের মধ্যে দিয়েই ভারতে আসতে শুরু করলেও, পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্য দখলের লড়াইয়ে তারা নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। তবে

ঔপনিবেশিক আমলে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের সমীকরণে ব্যাপক বদল শুরু হয়। রাজনৈতিক সম্পর্ক থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের মধ্যে দিয়ে এই সম্পর্কের বদল শুরু হয়। এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে আফগানিস্তানের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সময়ে ভারত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পলন করতে শুরু করে। এমনকী আফগানিস্তানে অতিসংকট সময়ে আফগান অভিবাসিত মানুষের আশ্রয় প্রদানকারী দেশ থেকে শুরু করে, আফগানিস্তানের জাতীয় সম্পত্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে ভারত নিজেকে জড়িয়ে রাখতে শুরু করে। ফলে দু'দেশের সম্পর্ক স্থাপনের এই যোগসূত্র প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত একই ধারায় বহমান।

১.২. প্রাচীনযুগে ভারত-আফগানিস্তান ঐতিহাসিক সম্পর্কের পটভূমি ও বিবর্তন

প্রাচীযুগে ভারত-আফগানিস্তান ঐতিহাসিক সম্পর্কের সূত্রপাত দুই দেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মধ্য দিয়েই সম্পাদিত হতে শুরু করেছিল। কারণ সংস্কৃতি হল কোনও জাতির জীবনপ্রবাহ এবং জাতি সত্তার মৌল চিহ্নায়ক। এই সংস্কৃতির দ্বারা মানুষে-মানুষে, এক সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনেই বিশ্ব সংস্কৃতি গড়ে তোলে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি সমাজ ও দেশের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি থাকে, যা অন্যের থেকে আলাদা। এরই মধ্যে আবার কিছু কিছু দেশের সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের মধ্যে কিছু মিল থাকে। আর এই মিলের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপট। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই সংস্কৃতির এই বিচিত্র বন্ধনে গড়ে উঠেছিল ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক, যা দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পথকে প্রশস্ত করে গড়ে উঠেছিল সামাজিক সম্পর্ক। ভারত আফগানিস্তানের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পর্ব শুরু হয়েছিল আর্যদের ভারতে আগমনের সময় থেকে। পরবর্তীকালে এই সম্পর্কের প্রবাহমানতা দু'দেশের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল।

১.২.১. ভারত-আফগানিস্তান আদি সম্পর্ক

ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে ঐতিহাসিক যোগাযোগ এবং দুটি দেশের মধ্যে আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের ইতিহাস প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বহমান। দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক যোগসূত্রের উপর নির্ভর করে নির্মাণ হয়েছে আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের নতুন নতুন সমীকরণ। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দীর আগে 'আফগানিস্তান' নামের কোনও দেশের পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং ঐতিহাসিক নাম হিসাবে আরাকেশিয়া, জাঙ্গিয়ানা, সাবস্তিয়া, ব্যাকটিকো ইত্যাদি নাম হিসাবে আফগানিস্তানের কিছু কিছু ভূ-খণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে গ্রিক, ল্যাটিন এবং কিছু বৈদিক সূত্র অনুযায়ী 'ভারত' বা 'ইন্ডিয়া'-র পরিচয় পাওয়া যায় ষষ্ঠ শতব্দীর আগে পর্যন্ত। ঠিক এই সময়ে 'আফগানিস্তান' দেশটি ভারত এবং ইরানের মধ্যস্থতাকারী ভূ-খণ্ড হিসাবে পরিচিত ছিল। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই আফগান ভূ-খণ্ডে ভারতীয় এবং ইরানীয় উভয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটতে শুরু করে, যার ফলস্বরূপ প্রাচীনকাল থেকেই আফগানিস্তান অজান্তেই 'বাফার স্টেট' (Buffer State) হিসাবে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ ভারত ও ইরানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ভূখণ্ড হিসাবে দীর্ঘকাল ধরেই আফগানিস্তানের পরিচিতি ছিল। মধ্যস্থতার যুগ হিসাবে এই সময় আফগানিস্তানের কথা উঠে আসে। ফলে আফগান ভূখণ্ডে ইরান ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবেশ বা সংমিশ্রণ ঘটে।[১]

টমাস কার্লাইলের (Calyle Thomas) মতে, যে জাতির বহু ইতিহাস থাকে, সে জাতি দুর্ভাগা। আফগানিস্তানের ইতিহাস তেমনই জটিল ঘটনাবহুল ও বৈচিত্রপূর্ণ। সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছিলেন, 'আফগানিস্তানের ইতিহাস না লিখে ভারত ইতিহাস লেখার জো নেই'। তিনি আরও বলেছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে মুসলিম আফগানিস্তান বিশেষ করে কান্দাহার, গজনী, কাবুল, জালালাবাদ বাদ দিলে ফ্রন্টিয়ার, বান্নু, কোহাট এমনকী পাঞ্জাবও বাদ দিতে হয়।[২] সুতরাং বর্তমানে আফগানিস্তানের ইতিহাস লিখতে গেলে দক্ষিণ এশিয়ার একাধিক দেশের প্রসঙ্গের সঙ্গে অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কারণ ভারতবর্ষের সঙ্গে আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক যোগাযোগের ইতিহাস নির্মাণ হয়েছে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই।

বর্তমানে আফগানিস্তান দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে ভারত-আফগানিস্তানের মধ্যে আদি সম্পর্কের সূচনাকাল সম্বন্ধে খানিকটা ধারণার প্রয়োজন রয়েছে। আফগানিস্তান দেশটিকে ঘিরে রয়েছে পৃথিবীর একাধিক দেশ। যেমন উত্তরে রাশিয়ান কমনওয়েলথের তাজাকিস্তান এবং তুর্কোমেনিস্তান, পশ্চিমে ইরান, পূর্বে ভারত এবং পাকিস্তান। পূর্বে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তের দৈর্ঘ্য ছিল (ওয়াখান অঞ্চল) মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার, বর্তমানে এই অঞ্চল পাকিস্তানের দখলে থাকায় প্রকৃতপক্ষে ভারতের সঙ্গে কোনও সাধারণ সীমান্ত নেই। অতীতে আফগান উপজাতির মানুষেরা হিন্দুকুশ পর্বতের সংকীর্ণ খাইবার গিরিপথ এবং সুলেমান পর্বতের বোলান গিরিপথের মধ্যে দিয়ে ভারতে যাতায়াত করতেন।[৩] এরা এই সময় থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে থাকেন। একইসঙ্গে প্রভাবিত করেছিলেন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসকে। আসলে গাঙ্গেয় উপত্যকার যে উর্বর সমতল ভূমি ছিল তা বরাবর আকৃষ্ট করেছিল বিদেশি জনগোষ্ঠীদের। আফগান উপজাতির মানুষরা ঠিক একইভাবে আকৃষ্ট হয়ে এখানে পর্দাপণ করতে শুরু করেছিলেন। এর ফলস্বরূপ ভারতীয় সংস্কৃতিতে আফগানদের আগমনের ইতিহাস সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে যায়।

১.২.২. মহাকাব্যে ভারত-আফগানিস্তানের সম্পর্কের উৎস সন্ধান

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ‘গান্ধার’ অতি পরিচিত একটি নাম, একই ভাবে ‘গান্ধারী’ নামটিও। ভারত-আফগানিস্তান প্রাচীন সম্পর্কের উৎস সন্ধান করতে গেলে এই নাম দুটি উঠে আসে বারংবার। গান্ধার বলতে প্রাচীন আফগানিস্তানের একটি ঐতিহাসিক স্থানের নাম বোঝায়, যে নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস। অপরপক্ষে ‘গান্ধারী’ নামটির সঙ্গেও জড়িয়ে আছে অন্য এক বহুল জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনি। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে বেদব্যাস রচিত মহাকাব্য ‘মহাভারতের’ মধ্যে প্রথম গান্ধারী নামের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যিনি ছিলেন গান্ধার প্রদেশের রাজা সুবলের কন্যা।[৪] ফলে স্বাভাবতই গান্ধারীকে বলা হত ‘গান্ধারী রাজকন্যা’। আবার বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য ‘রামায়ণের’ মধ্যেও বর্ণিত কিছু অঞ্চল এবং ঘটনার সঙ্গে প্রাচীন আফগানিস্তানের কয়েকটি অঞ্চলের সঙ্গে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।[৫]

যা থেকে অনুমান করা যায় ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারতের’ যুগ থেকে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের যোগসূত্র ছিল।

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ‘গান্ধার’ রাজ্যের ব্যাপ্তি এবং তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ গান্ধার রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু এবং ভৌগোলিক অবস্থান ছিল এই গুরুত্বের জন্য অন্যতম প্রধান কারণ। মহাভারতের মধ্যেই সর্বপ্রথম উঠে আসে উদারপন্থী গান্ধার রাজ্যের কথা। যার অবস্থান ছিল বামিয়ান পাহাড়ের সীমানায়।[৬] বামিয়ান সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক সত্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে উঁচু উঁচু মূর্তিগুলির প্রসঙ্গ যা মহাভারতের মধ্যে বর্ণিত আছে।[৭] এই সমস্ত মূর্তিগুলির স্রষ্টা ছিলেন পাণ্ডবরা, যার প্রমাণ মহাভারতের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। কথিত আছে পাণ্ডবরা পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে বিমাতৃক ভ্রাতা দুর্যোধনের কাছে তাঁদের সাম্রাজ্য বারো বছরের জন্য বন্দক রেখেছিলেন। এই সময়ে পাণ্ডবরা বামিয়ানে নিজেদের সাম্রাজ্য স্থাপন করে অসুখী জীবন অতিবাহিত করছিলেন এবং নিজেদের প্রয়োজনে তাঁরা বামিয়ানে পূজার্চনার ব্যবস্থা ও ধর্মীয় উপাসনার জন্য অনেকগুলি মঠ এবং মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার একইভাবে মহাভারতে বর্ণিত ‘গান্ধার’ নগরীর রাজকন্যা ‘গান্ধারী’র সঙ্গে হস্তিনাপুরের যুবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হয়েছিল। এই বৈবাহিক সূত্র ধরে মহাভারতের শকুনি চরিত্রের কথাও এসে পড়ে।[৮] এছাড়া মহাকাব্য রামায়ণে বর্ণিত বহুল প্রচলিত ‘তক্ষশিলা’ এবং ‘পুষ্কলাবতী’ নামে দুটি নগরীর কথা উঠে আসে।[৯] এই নগর দুটির রাজা ছিলেন ‘রামায়ণে’র অন্যতম চরিত্র রাজা ভরতের দুই পুত্র। এই ‘তক্ষশিলা’ একটা সময়ে ছিল ‘গান্ধারের’ রাজধানী। আর ‘পুষ্কলাবতী’ ছিল প্রাচীন ‘পুরুষপুর’, বর্তমানে যার অবস্থান চারসাড্ডায়।[১০] সুতরাং মহাকাব্যে উল্লেখিত গান্ধার, বামিয়ান, তক্ষশিলা, পুষ্কলাবতীর মতো অঞ্চলের সঙ্গে প্রাচীন ভারত-আফগানিস্তানের অঞ্চলগত সাদৃশ্য ও অভিন্ন যোগাযোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আবার ঐতিহাসিক তথ্যের বিচারে প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের অবস্থান সিন্ধুনদের পূর্বে সিন্ধু সাগরের ‘দোয়াব’ অঞ্চলে। অর্থাৎ সিন্ধুনদ এবং ঝিলম (বিতস্তা) নদীর মধ্যে অবস্থিত। আবার আফগানিস্তানের কান্দাহার, কাবুল এবং কাশ্মীর উপত্যকাও গান্ধারের অন্তর্গত।[১১] অনেকে আবার মনে করেন বর্তমানে ‘কান্দাহার’ প্রদেশটি হল পূর্বের

‘গান্ধার’ প্রদেশ। ভারতীয় মহাকাব্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসাবে বামিয়ান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের কথা চলে আসে, অথচ ইতিহাসের দৃষ্টিতে বর্তমানে সেই বামিয়ান আফগানিস্তানের চৌত্রিশটি প্রদেশের মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। তাই মহাকাব্যের যুগে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দুই দেশের ঐতিহাসিক যোগাযোগের ইতিহাসকে স্পষ্ট করে তোলে।

১.২.৩. হরপ্পা সভ্যতা ও ঋকবৈদিক যুগে দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির যোগসূত্র

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে হরপ্পা সভ্যতার ভৌগোলিক বিন্যাস এবং প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে জানা যায় আফগানিস্তান ছিল হরপ্পা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারত এবং ইরানের মধ্যে যোগসূত্রের সন্ধানের মধ্যে দিয়ে আফগানিস্তানের প্রাচীন ভূ-খণ্ড গুলির নাম উঠে আসে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন হরপ্পা সভ্যতার নগরকেন্দ্রিকতা পরোক্ষভাবে এই সভ্যতাকে বাণিজ্যমুখী করে তুলেছিল।[১২] প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মধ্যে দিয়ে জানা যায় হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা যে সমস্ত ধাতু ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রী ব্যবহার করতেন তা আমদানি করা হত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। হরপ্পার আমদানিকৃত বাণিজ্যের সূত্র ধরেই আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। আফগানিস্তান থেকে প্রাপ্ত রুপো এবং দুর্মূল্য নীলকান্ত মণির আগমন ঘটেছিল হরপ্পাতে। এই নীলকান্ত মণি আমদানি হত আফগানিস্তানের বাদাখশান অঞ্চল থেকে।[১৩] মূলত এই নীলকান্ত মণির আমদানির সূত্র ধরেই ভারতবর্ষের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল।

হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে আফগানিস্তানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম ছিল স্থলপথ। হরপ্পায় বণিক সম্প্রদায়ের উত্থান সেই ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে তোলে। হরপ্পার ‘পণি’ নামক এক বণিক সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়, যারা বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মতো আফগানিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। তবে হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়েও।[১৪] মেহেরগড়

সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে ভারত-আফগানিস্তান সাংস্কৃতিক সম্পর্কের নতুন দিক উন্মোচিত করেছে। ফলে ইতিহাস চর্চাতে হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আফগানিস্তানের 'ব্রাহুই' উপজাতি এই সভ্যতা সৃষ্টিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।[১৫] সুতরাং হরপ্পা সভ্যতার নগর-সংস্কৃতি থেকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আফগান ভূ-খণ্ডের সঙ্গে একাত্মা হয়ে যাওয়ার যে চেষ্টা হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

বৈদিক যুগে আফগানিস্তানের অবস্থান নিয়ে যে সমস্ত সূত্র পাওয়া যায়, তাঁর মধ্যে অন্যতম হল 'ঋকবেদ'। ঋকবেদ অনুযায়ী আর্যদের ভারত আগমনের একেবারে প্রাথমিক পর্বে 'সপ্তসিন্ধু' অঞ্চল অর্থাৎ আফগানিস্তানের কিছু অঞ্চলে তারা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। প্রথমেই তারা হিন্দুকুশের মধ্যে দিয়ে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন। পরে ইন্দো-আর্যরা ব্যাকট্রিয়া-মারজিয়ানা হয়ে ভারতীয় সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়। তখন এই অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম ছিল উত্তর আফগানিস্তান।[১৬] এছাড়া ঋকবেদের দশম মণ্ডল থেকে পাওয়া সূত্র অনুযায়ী ভারতে আগত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীদের আদি বাসস্থান ছিল আফগানিস্তানে।[১৭] ঋকবৈদিক যুগে যে সমস্ত নদ-নদীর কথা জানা যায় তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'সরস্বতী'। যদিও সরস্বতীর অবস্থান নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে, তবুও অনেকেই আবার মনে করেন সরস্বতীর অবস্থান আবেস্তার 'হরখবৈতি' অংশে। রাজেশ খোচরের মতো অনেকেই মনে করেন ঋকবেদে সমুদ্রগামী সরস্বতীর বর্ণনার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্তানের হরখবৈতির কথা উঠে আসে। ঋকবেদে বর্ণিত অন্যান্য নদীগুলি যেমন খুবা, কামু, গোমতি ইত্যাদি নদীগুলি কাবুল, সোয়াত, এবং আধুনিক গোমাল নদীকেই বোঝায়।[১৮] এই নদীগুলির অবস্থান স্পষ্টতই প্রমাণ করে ঋকবৈদিক যুগে সমুদ্রপথে যে সমস্ত অঞ্চলের উপর দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিল আফগানিস্তান।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগে ঋকবেদে আফগানিস্তানের অবস্থান নিয়ে অন্য একটি ধারণার আভাস পাওয়া যায়। যেখান থেকে মনে করা হয় ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে একটা নীরব ঐতিহাসিক যোগাযোগ ছিল। ঋকবেদে 'পাখতুকা' প্রদেশে 'কুভ'

নামে একটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ‘পাখতুকা’ প্রদেশটির অবস্থান সম্ভবত বর্তমানে আফগানিস্তানের ‘পাকতিয়া’ বা ‘পাকতিকা’ প্রদেশে এবং ‘কুভ’ নদীর ভৌগোলিক অবস্থান ‘কাবুল’ প্রদেশটিকে চিহ্নিত করে। আবার গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোডাস উল্লেখ করেন ‘পাক্তুকা’ প্রদেশের ‘ভারতীয়’রা ছিল সবচেয়ে যুদ্ধপ্রিয়।[১৯] সুতরাং বৈদিক যুগে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক সাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয়, যা দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে।

১.২.৪. মৌর্য যুগে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের বিকাশ

বৈদিক সাহিত্য সম্ভারের অন্তিম পর্যায় ভারতবর্ষে ষোলোটি অঙ্গরাজ্যের উত্থান ঘটে যা ‘ষোড়শ মহাজন’ পদ নামে খ্যাত। ষোড়শ মহাজন পদের ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভূ-সীমানার দিকে লক্ষ করলে বোঝা যায় এই মহাজন পদগুলি অধিকাংশ ছিল রাজতান্ত্রিক, এদের মধ্যে গান্ধার ছিল অন্যতম প্রধান একটি ‘রাজতান্ত্রিক’ মহাজন পদ। গান্ধারের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই গান্ধার প্রদেশেকে ঐতিহাসিকরা বর্তমানে কান্দাহার প্রদেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। তবে ভারতবর্ষের সঙ্গে আফগানিস্তানের যোগাযোগের ইতিহাস আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মৌর্য যুগের ইতিহাসে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য থেকে সম্রাট অশোকের সময়ে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা দৃঢ় যোগসূত্র পরিলক্ষিত করা যায়।

মৌর্য যুগের ইতিহাস থেকে জানা যায় গ্রিক রাজাদের হিন্দুকুশের দক্ষিণভাগে অপসারণের আগেই দক্ষিণ আফগানিস্তান মৌর্য সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেড়শো বছর শাসিত হয়েছিল।[২০] পরবর্তীকালে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সময় সাম্রাজ্যের সীমানা নিয়ে আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাস এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। পরে এই বিরোধ থেকে তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে, যুদ্ধে সেলুকাস পরাজিত হয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট, বেলুচিস্তানের অন্তর্গত মাকরান প্রদেশকে

প্রদান করেন। এর ফলে হিন্দ কোহের উত্তরের বালখ্ প্রদেশ ছাড়া প্রায় সমস্ত আফগানিস্তান মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে আসে।[২১] এই বালখ্ প্রদেশ বর্তমানে আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফের সঙ্গে অভিন্নভাবে জড়িত। আবার এই বাণিজ্যিক কারণে এই প্রদেশ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে বাল্খ প্রদেশটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

তবে মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে যোগাযোগের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। অশোকের অনুশাসনগুলি থেকে জানা যায় তাঁর সাম্রাজ্যের সীমারেখা সেলুসয়েড সাম্রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল। এই সময়ে আফগানিস্তানের পরিচিতি ছিল প্যালেপনিসিয়া, আরাকেসিয়ার মতো ইত্যাদি নামে। আফগানিস্তান যে ভারতীয় সভ্যতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, তা সম্রাট অশোকের আফগানিস্তানে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের ভাবনা থেকে জানা যায়। অশোক আফগানিস্তানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকল্পে 'মধ্যন্তিক' নামক এক শ্রমণকে আফগানিস্তানে পাঠান। ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কান্দাহার, জালালাবাদ, লাঘমান সহ আরও কয়েকটি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাপ্ত গ্রিক, আরামেয়িক, প্রাকৃত ভাষায় লিখিত এবং বিভিন্ন লিপিতে উল্লেখিত লেখা অশোকের কয়েকটি শিলালিপি থেকে এই তথ্য আবিষ্কৃত হয়।[২২] সুতরাং মৌর্য সামাজ্যের অবস্থান এবং ব্যাকট্রিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ আফগানিস্তানের একেবারে উত্তর-পূর্বে। আর ব্যাকট্রিয়ার রাজধানী ছিল 'ব্যকট্রা' যা বর্তমানে 'বালখ্' বা 'মাজার-ই-শরিফ' এর সঙ্গে অভিন্ন। সুতরাং ঐতিহাসিক যোগাযোগ নির্মাণে আফগানিস্তানের ভূ-খণ্ডগুলির সঙ্গে প্রাচীন মৌর্য সাম্রাজ্যের এক গভীর যোগাযোগের ইতিহাস পরিলক্ষিত হয়।

১.২.৫. কুষাণ যুগে ভারত-আফগানিস্তান সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রসার

ভারতীয় এবং হেলেনিস্টি শিল্পকলা এবং দর্শনের মধ্যে সংযোগ শুরু হয় গ্রিকো-ব্যাকট্রিয়া ও মৌর্য বংশের পৃষ্ঠপোষকতায়। তবে এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় কুষাণ

সাম্রাজ্যের শাসনকালে। এক সময় এই যোগাযোগ আফগানিস্তান সহ মধ্য এশিয়ার সকল অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ শিল্পকলা ও দর্শনের নানারূপ প্রায় পাঁচশো বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এ শিল্পকলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী উত্তরপ্রজন্ম হল হিন্দু-হেলেনিস্টিক 'গান্ধার শিল্প' এবং 'মহাযানী বৌদ্ধধর্ম' এবং 'মহাযানী বৌদ্ধবাদ'।[২৩] খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৫ অব্দে মধ্য এশিয়ার 'ইউ-চি' জাতির অন্তর্গত কুষাণ উপজাতির নেতৃত্বে আফগান অঞ্চল পরিচালিত হত। কালক্রমে 'ইউ-চি'রা বিভক্ত হয়ে আমুদরিয়া উপত্যকায় পাঁচটি ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কালক্রমে তারা কুষাণ শাখার প্রধান প্রথম কদফিস এর নেতৃত্বে গড়ে তোলে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাজ্য। যিনি পার্থিয়ানদের হারিয়ে কাবুল অধিকার করে তাঁর সাম্রাজ্য ভারতের সীমানা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কুষাণরা সর্বপ্রথম মধ্য এশিয়া থেকে বেরিয়ে যাযাবর গোষ্ঠী হিসাবে দলবদ্ধভাবে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং আফগানিস্তান সহ উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত হয়েছিল। এদের মধ্যে 'ইউ-চি' গোষ্ঠী ছিল অন্যতম। যাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দীর্ঘ সময় পরিলক্ষিত হয়। এই গোষ্ঠীর আদি পর্বের ইতিবৃত্ত চিনা বিবরণ সূত্র থেকে পাওয়া যায়। কুষাণরা ছিল 'ইউ-চি' গোষ্ঠীর অন্যতম একটি শাখা যারা ছিল সবচেয়ে শাক্তিশালী জনগোষ্ঠী।

এছাড়াও আফগানিস্তানের 'রবাতক' শিলালিপি থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে কুষাণ যুগের রাজনৈতিক পরিসীমার বেশ খানিকটা অঞ্চল বর্তমানে আফগানিস্তানে অবস্থিত।[২৪] খ্রিষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণদের শ্রেষ্ঠ নৃপতি কনিষ্কের সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্তান, কাশ্মীর সহ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। কনিষ্কের বিশাল সাম্রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল কাবুলের উত্তরে বর্তমান 'বেগ্রাম' নামক একটি অঞ্চলে। এছাড়া চিনা গ্রন্থের ধারাবিবরণী এবং কুজুল কদফিসের সময়ে চিনা তথ্যসূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে কুষাণ সাম্রাজ্য কাও-ফু (কাবুল) ও জিবিন (কাশ্মীর) পর্যন্ত প্রসারিত হয়।[২৫] কুষাণরা কাবুল এলাকা দখল করেন আর্সাকীয়দের থেকে এবং কাশ্মীর দখল সম্ভবত পল্লবদের থেকে। সুতরাং কুষাণদের

বাসভূমি আফগানিস্তানের সন্নিহিত কিছু অঞ্চলের মধ্যে উপস্থিত ছিল তা 'দশত-ই-নবুর' থেকে পাওয়া যায়।[২৬] এছাড়াও আফগানিস্তান থেকে প্রাপ্ত ব্যাকট্রিয়া ভাষায় পাওয়া কুষাণ লেখাটি থেকে (২৩ পঙ্‌ক্তি ব্যাপী) কনিষ্কের রাজত্ব সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়।[২৭] আফগানিস্তানের সংস্কৃতির মধ্যে ভারতীয় সত্তার যে সচিত্র পরিচয় পাওয়া যায় তার আরও উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল আফগানিস্তানে 'সুর্খ কোটালে' খোদিত বাহ্লিক লেখ। (৩১ কনিষ্কব্দ/শকাব্দ=১০৯ খ্রিঃ) এখান থেকে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা যায় ব্যাকট্রিয়া সহ আফগানিস্তানের বহুলাংশের উপর কুষাণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

হিউয়েন সাঙ (খ্রিঃপূর্ব ৬০২-৬৬৪) ভারত ভূখণ্ডে পৌঁছেছিলেন আধুনিক আফগানিস্তান এবং উজবেকিস্থানের রাস্তা ধরে এবং একই রাস্তা দিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর লেখা 'সি-ইউ-কি'তে ৬২৯ থেকে ৬৪৫ খ্রিঃপূর্বাব্দে আফগানিস্তান ভারতবর্ষের এক উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল সেকথা তিনি স্বীকার করেছেন।[২৮] এছাড়াও কোরিয়ান সন্ন্যাসী হুই-চাও ৮২৭ খ্রিঃপূর্বাব্দে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন; তিনি লিখেছেন ওই সময় বামিয়ানে পুরোটাই ছিল বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত যা এগারো শতকে বামিয়ানে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে পর্যন্ত টিকে ছিল।[২৯] তবে সারা পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস হয়ে গেলেও একমাত্র আফগানিস্তানেই টিকে ছিল। এমনকী আফগানিস্তানে বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসের পরেও সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ছিল যথেষ্ট। কাজেই দুটো দেশের মধ্যে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, তাতে খুব সহজেই অনুমান করা যায় আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের এক অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল।

মূলত উত্তর-পশ্চিম ভারতে অ-ভারতীয়দের যাওয়া আসা এবং বাসস্থান গড়ার ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে অর্ন্তবাণিজ্যের উন্নতি সাধন হতে শুরু করে এবং নতুন নতুন অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ শুরু হতে থাকে। এছাড়া শক, কুষাণ এবং পার্থিয়ান জনগোষ্ঠীদের রাজত্বকালে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্যের দরজা খুলে যেতে শুরু করে।[৩০] স্ট্রাবোর লেখা ভূগোল, প্লিনির ইতিহাস পেরিপ্লাসে ভারতবর্ষের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যোগাযোগের সূত্র পাওয়া যায়। গ্রিক এবং

রোমানদের ইতিহাসে ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগের বিবৃতি রয়েছে। বিশেষত ইন্দো-গ্রিক ধারার মধ্য দিয়েই তৈরি হয়েছিল গান্ধার শিল্প। এই শিল্পের সংমিশ্রণের ইতিহাসে রয়েছে দুটি ধারার মেলবন্ধন। এই শতাব্দীতে আফগানিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের গান্ধার ছিল একমাত্র শিল্পরীতি। গান্ধার শিল্পরীতির সংমিশ্রণ প্রমাণ করে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ততা। গান্ধার শিল্পের উপকরণগুলি মূলত ব্রোঞ্জ এবং প্লাস্টিকের ছাঁচের তৈরি মূর্তি যা পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যপথ দিয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায়।[৩১] ফলে খুব সহজেই অনুমেয় যে পশ্চিম ভারতে বাণিজ্যে অগ্রসর হচ্ছিল ক্রমশ। ফলে আফগানিস্তানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এছাড়াও খ্রিঃ প্রথম-দ্বিতীয় শতকের গান্ধার শৈলীর ভাস্কর্যে কৃষকদেরকেও হালচালনারত অবস্থায় দেখা যায়। যেখানে দুটি বা একটি বলদ লাঙলের সঙ্গে যুক্ত থাকত এবং কৃষকের হাতে লাঠিও দেখা যায়। যেখানে ভারতীয় কৃষক বললে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তার মোটামুটি একটা বিশ্বস্ত প্রতিরূপ প্রাচীনকালে পাওয়া গেছে।[৩২] এছাড়া বৌদ্ধ চিনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সানের বর্ণনায় গান্ধার শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ইতিহাস পাওয়া যায়। আফগানিস্তানে বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস রয়েছে, সে কথাও উঠে আসে তাদের লিখিত বর্ণনায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় দৃঢ়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল বণিকদের কর্মতৎপরতার জন্য। বতীন্দ্রনাথ বসু দেখিয়েছেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে অন্তত চারটি প্রধান যোগাযোগের পথ ছিল। এছাড়া সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর পথের উদ্ভব ঘটেছিল। এর মধ্যে একটি পথ অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পা (ভাগলপুর অঞ্চল) থেকে এবং উত্তর-পশ্চিমে গান্ধার দেশের পুষ্কলাবতী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।[৩৩] এছাড়া বন্দর ভৃগুকচ্ছের সঙ্গে কাবুল অঞ্চলের যোগাযোগের কথা পেরিপ্লাসে বর্ণিত হয়েছে। কাবুল থেকে পুষ্কলাবতী ও তক্ষশীলা হয়ে পাঞ্জাব এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্য দিয়ে মালব অতিক্রম করে পথটি ভৃগুকচ্ছে শেষ হত।

সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভবের পর থেকে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বাণিজ্যপথগুলির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ইতিহাস। তাই

ভারতের সঙ্গে মধ্য- এশিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা যতটা দৃঢ় হয়েছিল, ভারতে ততই বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হয়েছিল। মেগাস্থানিসের ইন্ডিকা, অশোকের শিলালেখ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং পেরিপ্লাসে বর্ণিত ইতিহাস থেকে ভারতের বাণিজ্যের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। যেখানে বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বাণিজ্যের উন্নতি সাধন ঘটেছিল এবং সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয়েছিল। কাজেই দুটি দেশের যোগাযোগের ইতিহাস শুধুমাত্র নিদিষ্ট কয়েকটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। একাধিক বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল এই যোগাযোগ। যা সেই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বহমান রয়েছে।

১.৩. মধ্যযুগে ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসন ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিবর্তন

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কাল বিভাজনের নিরিখে যে সময়পর্বকে মধ্যযুগের ইতিহাস হিসাবে ধরা হয়, অনেকে এই সময়কে আবার 'তুর্কো-আফগান' যুগের ইতিহাস বলেও অভিহিত করে থাকেন। এই তুর্কো-আফগান যুগেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে আফগান আধিপত্যের ইতিহাস লিখিত আছে। সাধারণত ১৪৫১ সাল থেকে ১৫২৬ পর্যন্ত ভারতবর্ষে আফগান শাসনের স্থায়িত্ব হলেও ১৪৫১ সালের অনেক আগে থেকেই আফগানরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে শুরু করেছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই সেই সময়ে দিল্লি সুলতানের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেউ ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে, কেউ সুলতানি শাসকের অধীনে বীর যোদ্ধা হিসাবে, আবার অনেক অভিজাত আফগানরা এসেছিলেন শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। কাজেই এই সময়ে ভারতবর্ষে অভিবাসিত আফগানদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কালক্রমে এই সব আফগানরা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কাজেই একদিকে আফগানরা যেমন ভারতবর্ষের উপরে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, আবার তেমনই মধ্য-এশিয়ার পরাক্রমশালী শক্তিগুলি আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছিল। সুলতান মাহমুদ থেকে বাবর পর্যন্ত সকলেই প্রায় এই চেষ্টা করে গেছেন ক্রমাগত। এমনকি মধ্য-

এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ যত দৃঢ় হয়েছে, ভারতের সঙ্গে আফগানদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ ততই সু'প্রশস্ত হয়েছে।

১.৩.১. মধ্যযুগে অভিবাসনের প্রেক্ষাপট ও প্রাথমিক পর্ব

ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসনের ইতিহাসকে যুগ বিভাজনের কালপর্বের মধ্যে দিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, মধ্যযুগে একটা বড় সময় ধরে ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসনের ইতিহাস রয়েছে। এই সময়ে আফগানরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল মূলত যোদ্ধা হিসাবে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে যখন পাকাপাকিভাবে মুসলিম শাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে, তখন থেকে আফগানরা আরও বেশি করে ভারতে অভিবাসন করতে শুরু করেছিলেন। ভারতবর্ষে আগত ঘুর এবং গজনী এই দুই তুর্কি গোষ্ঠী মধ্য- এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিলেন আক্রমণকারীর ভূমিকা নিয়ে। আফগানরা প্রথম দিকে এই দুই গোষ্ঠীর সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে এই সময় আফগানরা ভারতবর্ষে নিজেদেরকে আলাদা করে পরিচিতি নির্মাণের চেষ্টা করেন, তবে শুরুর দিকে তাঁদের কাছে সেই সুযোগ ছিল না, কারণ সংখ্যাতে তাঁরা ছিলেন খুব অল্প ফলে নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে উঠতে পারেননি। স্বাভাবতই অন্যের অধীনে তাঁদের কাজ করতে হয়েছিল। তবে পরবর্তীকালে শের শাহ সূরি এবং লোদিরা ক্ষমতা বলে এবং দক্ষতার জোরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা রোহ ছিল আফগানদের প্রাচীন বাসস্থল।[৩৪] 'রোহ' পাশতু শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ ছিল পাহাড়। 'রোহ' ভূখণ্ডটি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সোয়াত এবং বাজার্ডর অঞ্চল থেকে সিন্ধু প্রদেশের 'বুস্কর' জেলা হয়ে আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৩৫] এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে আফগানরা ভারতের সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। উপমহাদেশের ইতিহাসে যারা 'আফগান পাঠান' নামে পরিচিত।[৩৬] কাজেই আফগানদের ভারতবর্ষে আগমন এবং পরে ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে দুই দেশের সম্পর্ক স্থাপনের সূচনার ইতিহাস। তাই ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে আফগানদের যে বিশেষ

তাৎপর্য রয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য। আফগান শাসকরা নিজেদের শাসনব্যবস্থা ও ভারতীয় ঐতিহ্যকে মিলিয়ে এক নতুন ধরনের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা পূর্বে তুর্কিদের থেকে অনেকটা আলাদা। তুর্কিরা ভারতবর্ষকে বিজিত দেশ হিসাবে গণ্য করেছিল, সেখানে আফগানরা ভারতবর্ষকে নিজেদের দেশ হিসাবে গণ্য করতেন। কাজেই সমগ্র মুঘল শাসনকাল জুড়ে আফগানরা নিজেদের আত্মপরিচয় ধরে রেখেছিল গরিমার সঙ্গে। এমনকী যাযাবর জনগোষ্ঠী হিসাবে আফগানরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেও দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আফগান অভিবাসনের পিছনে জনসংখ্যার আধিক্য এবং আফগান চরণভূমির অধিকার নিয়ে আফগান সহ মধ্য-এশিয়ার শক্তিগুলির মধ্যে প্রায়শই প্রতিযোগিতা লেগে থাকত। ফলে জমির সংকটের কারণে অনেক আফগান দেশান্তরিত হয়েছিল। সমসাময়িক এই সময়ে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে পরিত্যক্ত খাস জমির সন্ধান পাওয়া যায়, যা আফগান অভিবাসনকে ভারতের দিকে অগ্রসর হতে আকৃষ্ট করেছিল বিশেষভাবে। ফলে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকে আফগান উপজাতি এবং যাযাবর জনগোষ্ঠীরা ভারতবর্ষে অগ্রসর হতে শুরু করেন। আবুল ফজলের লেখা 'আইন-ই-আকবরি'তে ভারতবর্ষে আফগান জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কেন আফগানরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে সে সময়ে।[৩৭] তিনি লিখেছেন আফগান চারণভূমি নিয়ে পাশতুন জনগোষ্ঠীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চরম আকারে পৌঁছালে, যারা দুর্বল অংশ তারা দেশ ছড়াতে বাধ্য হয় এবং তাঁদেরই একটা অংশ ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন, যাঁদের মধ্যে লোদি বংশোদ্ভূতরা ছিল অন্যতম। এঁরা সিন্ধুনদের ডানদিকের সমভূমি অঞ্চলগুলিতে শুরুতেই বসবাস করে এবং পরবর্তীকালে ভারতের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।[৩৮] মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন বলেছেন প্রচুর পরিমাণে ইউসুফজাই উপজাতিদের এই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করতে দেখা যেত। যারা আফগানিস্তান থেকে দেশান্তরিত হয়ে ভারতে এসেছিলেন। যাঁরা পরবর্তীকালে পাঠান হিসাবে ভারতবর্ষে পরিচিতি পেয়েছিলেন।[৩৯]

তবে মধ্যযুগে ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসনের একাধিক পেক্ষাপটগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। অভিবাসনের প্রাথমিক পর্বে আফগান উপজাতি এবং যাযাবর জনগোষ্ঠীর মূল লক্ষ ছিল ভারতবর্ষকে ‘সামরিক পরিষেবা’ (Military Service) প্রদান। সামরিক পরিষেবার মধ্যে অন্যতম ছিল অস্ত্র ব্যবসা এবং ঘোড়ার ব্যবসা। একেবারে শুরুর দিকে আফগানদের অভিবাসনের পিছনে ঘোড়ার ব্যবসা ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। কারণ ভারতবর্ষে ঘোড়া ছিল অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা, যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যবহারের জন্য তখন উন্নত মানের ঘোড়া ছিল একমাত্র সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। ফলে ‘Trading Diaspora’ মাধ্যমেই আফগানরা ভারতবর্ষে অভিবাসিত হতে শুরু করেছিলেন।[৪০] কাজেই মধ্যযুগের ইতিহাসে ভারতে আফগান অভিবাসনের পিছনে একাধিক কারণ পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়।

১.৩.২. সুলতানি যুগে আফগান অভিবাসনের ধারা

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসনের কারণ এবং দু’দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। তবে আফগান অভিবাসনের ধারা শুধুমাত্র অভিজাত আফগানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সম্প্রসারিত হয়েছিল সাধারণ আফগানদের মধ্যেও। স্বাভাবতই অনেকেই এসেছিলেন শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর কাজে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। যাঁরা দিল্লির সুলতানি শাসনকাল থেকে মুঘল পরবর্তী সময় পর্যন্ত অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়া মধ্যযুগ পর্বে আফগানদের ভারতবর্ষে অভিবাসনের ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ মধ্য-প্রাচ্যের শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে প্রায়শই সংঘর্ষে লিপ্ত হতেন আফগান ভূ-খণ্ডকে দখলের চেষ্টায়, এর ফলে অনেক সময় আফগানরা বাধ্য হয়ে নিজেদের ভূমি ছেড়ে ভারতবর্ষে অভিবাসিত হতেন। এছাড়া সুলতানি আমলে আফগান বণিক এবং যাযাবর গোষ্ঠী উপমহাদেশের ইতিহাসে সবসময় অভিবাসিত হয়েছেন সে কথা বলাই বাহুল্য।[৪১]

খ্রিস্টিয় দশম শতকে মাহমুদ গজনীর হাত ধরে সবুক্তিগণ শাসনের আবির্ভাব হয়। সুলতান মাহমুদ ১১৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আফগানিস্তানকে শাসন করেছিলেন।

গজনভি বংশের রাজত্বকালে রাজ্যসীমা কাবুল থেকে বালখ্ এবং পার্সিয়ান হয়ে ভারতবর্ষের কিছু অংশে তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু মঙ্গল আক্রমণের ফলে ত্রয়োদশ শতকে আফগানিস্তানের অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'মধ্যযুগ' বা 'তুর্ক-আফগান' যুগ যাই বলা হোক না কেন রাজনৈতিকভাবে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে পা রাখেন সুলতান মাহমুদ। তিনি ১০০০ থেকে ১০১৭ খ্রিস্টাব্দর মধ্যে মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন।[৪২] সুতরাং মাহমুদের আগমনের মধ্যে দিয়েই মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ সুনিশ্চিত হতে থাকে। শিয়াবউদ্দিন মহম্মদ ঘোরী সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ দিল্লির চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বিরাজ চৌহানকে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে পরাজিত করে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম শাসন স্থাপন করেন। পরে মহম্মদ ঘোরী তাঁর সাম্রাজ্যের জয়ের ধ্বজা বাংলা সূদর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তার সাধন করেছিল।[৪৩]

ভারতবর্ষে দিল্লি সুলতানি শাসনের শুরু থেকেই আফগান অভিবাসিত জনগোষ্ঠীদের প্রতক্ষভাবে বিভিন্ন ভূমিকাতে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এর আগে মহম্মদ ঘোরী (১১৭৫-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) যখন সর্বপ্রথম ভারত অভিযান করেছিলেন তখন আফগানদের একটা বড় অংশকে সেনাবাহিনীতে ব্যবহার করেছিলেন। প্রায় ১২,০০০ আফগান সৈন্য মাহমুদ লোদির নেতৃত্বে মহম্মদ ঘোরীর পক্ষ নিয়ে দিল্লির শাসনকর্তা পৃথ্বীরাজ চৌহানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৪৪] ঐতিহাসিক নিয়ামতউল্লাহর মতানুযায়ী মহম্মদ ঘোরী শিয়ালকোটে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন এবং এই অঞ্চলে শহর নির্মাণ করে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন।[৪৫] এছাড়া সুলতানি যুগে বিভিন্ন সময় জুড়ে আফগানরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন। যেমন সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের (১৩৩৯-১৪১৩ খ্রিস্টাব্দ) সেনাবাহিনীতে বহু আফগান যোদ্ধা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের (১২৬৬-১২৮৬ খ্রিস্টাব্দ) আমলে সীমান্তবর্তী চৌকিগুলিতে আফগান সেনাদের মোতায়েন করা হত।[৪৬] এর ফলে মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে আফগান যোদ্ধারা সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সময় থেকেই ভাগ্যান্বেষী আফগানরা ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং

ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্টত হওয়ার প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়। ইখতিয়ারউদ্দিন ইয়াল আফগান এবং মালিক মাখ আফগান খলজি তুঘলক বংশের রাজত্বকালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতে লোদি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বহলুল লোদি (১৪৫১-১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ) পিতামহ মালিক বাহরাম একটি বাণিজ্য দলের সদস্য হিসাবে ভারতে প্রবেশ করেন এবং ভারতেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া তার অন্যতম পুত্র মালিক খিজির খান (১৪১৪-১৪২০ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক দৌরালার গভর্নর নিযুক্ত হন।[৪৭] এই ভাবে আফগানরা সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ জমিদারি ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। লাহোর থেকে মানিকপুর পর্যন্ত আফগানরা নিজেদের ক্ষমতা ও শক্তি বলে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

১.৩.৩. মুঘল যুগে আফগান অভিবাসন ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক

ভারতে আফগান অভিবাসনের সময়কাল রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় দিক দিয়ে ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আফগানরা ভারতবর্ষে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, যতদিন না পর্যন্ত বাবরের আবির্ভাব হয়েছে। তবে মাঝখানের কিছুটা সময় আফগানরা কেন্দ্রিয় শাসন ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকলেও ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে শেরশাহের প্রচেষ্টায় আফগানরা পুনরায় ক্ষমতা দখল করেন। তবে মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের আমলে মোঘলরা আবার উঠে দাঁড়ায় এবং আফগানদের নিজেদের অধীনে নিয়ে আসেন। মুঘলদের সঙ্গে আফগানদের এই দীর্ঘ টানাপড়েন চলার পরেও মোঘল রাজদরবারে আফগানদের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল, আফগানরা মোঘলদের অধীনে জায়গিরদার এবং মানসব পদের জন্যে নিযুক্ত হতেন। মোঘলরা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারে ও রাজ্যের নিরাপত্তার প্রয়োজনে আফগানদের ব্যবহার করতেন। কারণ আফগানদের বীর যোদ্ধা হিসবে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কাজেই মোঘল রাজদরবারে আফগানদের এই স্বাভাবিক ক্ষমতা সাধারণ আফগানদের ভারতবর্ষে অভিবাসিত হতে আগ্রহ যুগিয়েছিল। ফলে মুঘল যুগে আফগান অভিবাসনের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে আঞ্চলিক স্তরে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা তাঁদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে সক্ষম করে তোলে। এইভাবে সমস্ত মোঘল যুগ ধরেই আফগানরা ভারতবর্ষে অভিবাসিত হয়েছিলেন।

এই ভাবে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে আফগান অভিবাসনের পক্রিয়াটি চলতে থাকে। তবে লোদি ও শূর বংশের পতনের পরে আফগানরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এর ফলে আফগানরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে খানিকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল এবং বাধ্য হয়ে তারা মোঘল বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তবে সপ্তদশ শতকে মোঘলদের পৃষ্ঠপোষকতায় আফগান অভিবাসন যে সংগঠিত হচ্ছিল, তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল এই সময়ে আফগান অভিবাসিত জনগোষ্ঠীকে বসবাসের জন্য মোঘলরা রহিলাখণ্ডের কাতেহার অঞ্চলে জমি প্রদান করেছিলেন। ফলে আফগানরা সিন্ধু নদের পশ্চিম থেকে কাতেহার অঞ্চলে নতুন করে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[৪৮] একইসঙ্গে তাঁদের নিযুক্ত করেছিলেন মোঘল রাজদরবারে যোদ্ধা এবং সেনাবাহিনীর কাজে। এমনকী এই সময়ে কিছু সম্ভ্রান্ত আফগানদের 'সাওয়ার' পদেও মোঘলরা নিযুক্ত করেছিল। কাজেই এই সমস্ত আফগানরা তাঁদের নিজেদের গোষ্ঠী এবং আত্মীয়দের এই অঞ্চলে বসবাসের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে সপ্তদশ শতকে আফগানরা ভারতের দাক্ষিণাত্য এবং পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৪৯]

মুঘল যুগে ভারত-আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক এবং অভিবাসন এই দুই পক্রিয়া একই সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল। ভারতে মুঘল শাসন কায়েমের সময়সীমা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যহত থাকলেও, তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল ১৫২৬ সালে বাবরের আবির্ভাব থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত ঔরাঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত। মোঘলরা এসেছিলেন মধ্য-এশিয়া থেকে, কিন্তু ভারতবর্ষে শাসন ক্ষমতা দখলের পর থেকে আফগানিস্তান একটি মধ্যবর্তী সেতুবন্ধে পরিণত হয়। এর ফলে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে মোঘলরা ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। এক্ষেত্রে কাবুল এবং কান্দাহার এই দুটি অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৫০] ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে মোঘল এবং সাফাদিদের মধ্যে হিন্দুকুশের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতে গমন করার জন্যে যে মহাসড়কটি কাবুল নিয়ন্ত্রণ করত, তেমনই ভারতে প্রবেশের একমাত্র পথ যেটা হিন্দুকুশের পাদদেশে অবস্থিত, সেটি কান্দাহার নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে এই দুটি অঞ্চলের দখল ও আধিপত্য বিস্তারের মধ্যে দিয়েই সম্রাট বাবরের আবির্ভাব ঘটে। বাবর কাবুল দখলের পরে ১৫২২ সালে গজনি ও কান্দাহার দখল করেন এবং

ভারতের দিকে অগ্রসর হয়ে ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে লোদী আফগানদের থেকে লহোর ও পাঞ্জাব অধিকার করে নেন। এর পরে ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে বাবার ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যে স্থাপন করেন। তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা আগ্রা থেকে হিন্দকোহ হয়ে আফগানিস্তানের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[৫১]

মোঘল যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। মোঘল সম্রাট বাবরের (১৫২৬-১৫৪০) উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ দৃঢ় হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাবরের কাবুল অভিযানকে কেন্দ্র করে আফগানিস্তানের সঙ্গেও এই সম্পর্ক দৃঢ় হয়। কারণ বাবর ভারত জয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে কাবুল আক্রমণ করেন। বাবর ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দ আফগানদের পরাজিত করে কাবুল দখল করেন এবং তার পরেই ভারত আক্রমণের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৫২৬ সালের পর থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের নুতন দিক উন্মোচিত হয়। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন "হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য ব্যাপক জনবহুল এবং সমৃদ্ধ ছিল" একইসঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্য কাবুল, কান্দাহার, গজনি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছিল এবং রাজধানী স্থাপন করেছিলেন দিল্লিতে।[৫২] ফলে বাবরের সময় থেকে ভারত-আফগান যোগাযোগের পথ অনেকটাই সমৃদ্ধ হয়েছিল। মধ্যএশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বৈদেশিক সম্পর্ক সমস্ত ক্ষেত্রেই এই ধারার উন্নতি সাধন হয়েছিল। কাবুলকে কেন্দ্র করেই উপমহাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রসারতা বৃদ্ধি পায় ভারতের। এ প্রসঙ্গে বারর তার আত্মজীবনীর একটি স্তবকে কাবুল এবং ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে লিখেছেন- 'শহরটি পণ্য সদাইয়ের জন্য দুর্দান্ত ও লাভজনক বাজার। প্রতি বছর সাত-আট বা দশ হাজার ঘোড়া কাবুলে আসে। হিন্দুস্তান থেকেই প্রতিবছর পনেরো-কুড়ি হাজার টুকরো কাপড় কাফেলারা সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। হিন্দুস্তানের পণ্য বলতে দাস, সাদা কাপড়, চিনির মিঠায়, মিহি ও সাধারণ চিনি, ঔষুধ এবং মশলা। তিনি লিখেছেন এই সময়ে এমন অনেক বণিক ছিলেন যারা যারা তিনশো বা চারশো শতাংশ লাভ করেও খুশি নন'।[৫৩] আকবরের সময় বিশিষ্ট পণ্ডিত আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০২) লিখেছেন কাবুলের মোট ১১টি ভাষার মধ্যে হিন্দি ছিল অন্যতম একটি ভাষা।[৫৪]

হিন্দি ভাষাতে কাবুলের বহু মানুষ কথা বলতেন, কাবুলে হিন্দি ভাষার প্রচলন হয়েছিল কারণ কাবুল এবং কান্দাহার ছিল ভারতবর্ষের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ প্রবেশদ্বার। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই উভয় দেশের সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে। ইতিহাসের অধিকাংশ শাসক দিল্লি থেকে কাবুল এবং কান্দাহারকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। দিল্লি ছিল এমন একটি প্রবেশদ্বার যেখান থেকে এই দুটি প্রদেশের মধ্যে অনায়াসেই যোগাযোগ স্থাপন করা যেত।

মোঘল সম্রাট বাবর কাবুলের গুরুত্বের কথা তার আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন একাধিক বার। এছাড়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাবুলের অবস্থানের কথাও তিনি 'বাবরনামা'তে উল্লেখ করেছেন।[৫৫] তিনি কাশগড়, বালখ্, সমরখন্দ, বুখার ও অন্যান্য স্থানের বাণিজ্যিক গুরুত্বের কথা বলেছেন। মধ্যএশিয়ার এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে প্রায়শই ব্যবসা-বাণিজ্যের রমরমা লক্ষ করা গিয়েছিল। সাধারণত মধ্যএশিয়ার বণিকরা কাবুল থেকে বিভিন্ন প্রকারের পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করতেন এমনকী উত্তর ভারত, গুজরাট ইত্যাদি স্থানেও পণ্যদ্রব্যের খোঁজে যাতায়াত করতেন।[৫৬] ফলে কাবুলের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগের পর্ব এমনকী বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং, বাবরের কাবুল জয় ছিল হিন্দুস্থানের সঙ্গে যোগসূত্র ও সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা থেকেই।

সিন্ধুনদ থেকে কাবুল পর্যন্ত যতগুলি পথ ছিল তার মধ্যে খাইবার গিরিপথ ছিল অন্য পথগুলির চেয়ে অনেকটাই আলাদা। আবুল ফজলের মতে কাবুল থেকে ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্য মোট সাতটি রাস্তা ছিল। এদের মধ্যে 'খাইবার' পথটি ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক, কারণ এই পথ দিয়ে দু'চাকা বাহিত গাড়ি চলতে পারত, ফলে সড়কপথের মান ছিল অন্য সড়কপথগুলির থেকে উন্নত। এছাড়াও অপর একটি পথ মুঘল আমলে বেশ জনপ্রিয় ছিল, যার মধ্যে দিয়ে কাবুলে ব্যবসায়ীরা পৌঁছতে পারতেন, যেটা লাহরের উপর দিয়ে খাইবার হয়ে এশিয়াতে গিয়ে মিশেছে।[৫৭] আবুল ফজল যর্থাথই বলেছেন যে কাবুল এবং কান্দাহার ছিল ভারতবর্ষে পৌঁছানোর সবচেয়ে সহজ ও যৌথ পথ। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে কাবুল ছিল মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। ফলে বেশিরভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য মূলত কাবুলের উপর

দিয়েই হত।[৫৮] সারা বছরে প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার ব্যবসায়ী কাবুলে যাতায়াত করতেন। টেভার্নেট (Tevernier) বলেন ভালো রাস্তাঘাট এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হয়েছিল। ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ ব্যবস্থার বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৫৯] পরে কাবুলের সঙ্গে পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের সঙ্গেও যোগাযোগের পরিধি প্রসারিত হয়।

মধ্যযুগের ইতিহাসে মোঘল আমলে কাবুলের গুরুত্ব শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নয়, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, আমদানি-রপ্তানিজাত দ্রব্যের অবাধ যাতায়াতের কারণে কাবুল ছিল সবচেয়ে বড় কেন্দ্রবিন্দু।[৬০] কাবুল থেকে ভারতে আমদানিজাত দ্রব্যগুলির মধ্যে ছিল ঘোড়া, ফল, শাল, মুলতানি কাপড়, রঙ, আমন্ড, পেস্তা বাদাম, আখরোটের মতো শুষ্ক ফল।[৬১] এছাড়া সড়ক পথ দিয়ে আপেল, ন্যাসপাতি, ডালিম, দানা বিহীন ফল জালালাবাদ থেকে ভারতে নিয়ে আসা হত। কাবুল ছিল কিসমিস এবং সুরমা উৎপাদনকারী দেশ।[৬২] ফলে এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য এবং ফল-মূল নিয়মিত কাবুল থেকে ভারতবর্ষে আমদানি করা হত।[৬৩] রপ্তানিজাত দ্রব্যের মধ্যে কাপড়, সুতিবস্ত্র, চিনি এবং সুতির তৈরি জিনিসপত্র, যা ভারতবর্ষ থেকে কাবুলে রপ্তানি করা হত, ফলে মুঘল যুগে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাবুলের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আগ্রাতে উৎপাদন হত নীল যা কাবুলের পথ ধরে মধ্য-এশিয়াতে নিয়মিত যাতায়াত করত।[৬৪] স্থলপথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবসায়ী শ্রেণির উত্থান লক্ষ করা গিয়েছিল এই সময়ে। এই সমস্ত বণিকদের মধ্যে আফগান বণিকরা ছিল অন্যতম। আফগান বণিকরা মধ্য-এশিয়া থেকে ঘোড়া কিনতেন। খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকে এই সমস্ত ঘোড়াকে নিয়ে তাঁদের নিজেদের দেশে প্রজনন ঘটাতে শুরু করেন। পরে তা ভারতবর্ষে বিক্রি করতেন। এই ঘোড়ার ব্যবসার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতেন যেমন- তলোয়ার, ধনুক, এবং তির ইত্যাদি। তবে অনেকেই মেষপালন বা যাযাবর জাতির মতো বিভিন্ন স্থানে ঘুড়ে বেড়াতেন। আনাতোলিয়ার গাজনভিরা ছিল মেষপালক বা যাযাবর গোষ্ঠীর অন্যতম। এই মেষ পালকরা মধ্য-এশিয়াতে ঘুড়ে বেড়াতেন, স্থল-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এরা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৬৫]

সপ্তদশ শতকে কাবুলের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় টেভার্নিয়ের লেখার মধ্যে।[৬৬] টেভার্নিয়ে লিখেছেন কান্দাহারে ভারতীয় বণিকরাও বসবাস করতেন। যাঁরা হিন্দু বণিক সম্প্রদায়, এই হিন্দু বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ যাঁরা শহরে বসবাস করে ব্যবসা-বাণিজ্য, দালালি, এবং ব্যাঙ্কিংয়ের মতো পেশায় নিযুক্ত ছিলেন।[৬৭] গ্রামের দিকে যাঁরা বসবাস করতেন তারা মুদ্রা বিনিময়ের সঙ্গে একাধিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল।[৬৮] কাবুলের পক্ষ থেকে এঁদেরকে যত্ন সহকারে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল। বিনিময়ে প্রদেশগুলি থেকে নিয়মিত রাজস্ব রাজধানীতে প্রেরণ করতেন তারা। মোহনলাল বলেছেন প্রায় দু'হাজার হিন্দু কাবুলে তাদের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বসবাস করতেন।[৬৯] ইরফান হাবিব তাঁর- "Atlas of the Mughol Emperior"-এ কাবুলের ভৌগোলিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[৭০]

১৫২৬ থেকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে মুঘল ও আফগান শক্তির পারস্পরিক আধিপত্য এবং সংঘর্ষের ইতিহাস বোঝায়। কারণ মুঘলরা ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ হানতে গিয়ে আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। যদিও এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মোঘলদের ভারতবর্ষ জয়ের স্বপ্ন সার্থক হয়। এমনকী মুঘল শক্তির প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল আফগান শক্তিকে বিনিষ্ট করেই, যার ধারা আকবরের সময় পর্যন্ত বহমান ছিল। আফগান অভিবাসনের অন্যতম প্রধান চরিত্র ছিল শেরশাহ, তিনি শেষবারের (১৫৪০-১৫৪৫) দিল্লির মসনদ দখলে এনেছিলেন। মধ্যযুগের ইতিহাসে 'শূরবংশ' ছিল আফগান শক্তির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। শের শাহের রাজত্বকালে সুদূর বাংলা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে আফগানরা ছিল স্বৈরাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে, যদিও এই বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেই সহমত পোষণ করে না। আফগানরা আফগানিস্তানের বাসিন্দা হলেও দীর্ঘদিন ধরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লাঘমান এবং মুলতানের পাশাপাশি বসবাস করতেন। তুর্কি শাসনকালে তাঁরা অনেকেই বলবানের অধীনে কাজ করতেন যদিও এঁদের আগমনের প্রাথমিক পর্বে আক্রমণকারী হিসাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে

আফগানরা নিজেদের বীরত্ব এবং কর্ম দক্ষতায় ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে তাঁরা বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকারী হয়েছিলেন। ১৭৪৭ সালে নাদির শাহের হত্যার পরে আহমেদ শাহ আবদালি (১৭২২-৭২) নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করে। ভারত অভিযান করে পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং মুলতানকে একত্রিত করে সমৃদ্ধ করে তোলেন। ১৭৭৩ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিব্বত থেকে সুদূর আরব সাগর পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।[৭১]

কাজেই মোঘল যুগে এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাবুলের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাবুলকে কেন্দ্র করেই ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের যোগাযোগের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ফলে আফগান শাসক, অভিজাত এবং বণিকরা ভারতবর্ষে অভিবাসিত হতে দ্বিধাবোধ করেননি। কারণ ভারতে সেই সময়ে আফগানদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কাজেই মধ্যযুগে মুঘল পর্বে আফগান অভিবাসনের ধারাকে কিছুতেই উপেক্ষা করার উপায় নেই।

১.৩.৪. মধ্যযুগে বাঙলায় আফগান অভিবাসনের প্রসার ও প্রেক্ষিত

মধ্যযুগে বাংলায় আফগান আগমনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে উঠে আসে ভারতবর্ষে আফগানদের আগমনের প্রেক্ষিত। আফগানরদের ভারতবর্ষে আগমনের পিছনে যে সমস্ত কারণ ছিল, বাংলাতে অভিবাসনের ক্ষেত্রে এর বিচ্ছিন্ন কোনও কারণ ছিল না। তবে সুদূর আফগানিস্তান থেকে সুলতানি আমলে বাংলাতে পা রেখেছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি, যদিও বখতিয়ার খলজি সরাসরি বংশগতভাবে আফগান ছিলেন না, তবুও তিনি আফগানিস্তান থেকে যেহেতু বাংলাতে এসেছিলেন, তাই তাকেই প্রথম আফগান অভিবাসিত শাসক হিসাবে ব্যক্ত করা যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে বিশেষত মোঘল যুগে আফগান শাসকদের বাংলাতে অভিবাসনের বিস্তর ইতিহাস পাওয়া যায়। তবে একথা সত্য আফগান শাসকদের অনেক পূর্ব থেকেই সাধারণ আফগানরা বাংলাতে এসেছিলেন। যাঁরা সুলতানি আমল থেকে মোঘল পরবর্তী সময় পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে বিভিন্ন ধরনের জীবিকার খোঁজে বাংলাতে এসেছিলেন।

মধ্যযুগের বাংলায় আফগানদের অভিবাসন এবং অভিযোজনের ইতিহাসের মধ্যেই উঠে আসে আফগান শাসনের দীর্ঘ অধ্যায়ের কথা। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের গৌড় বিজয়ের সময় থেকে ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কররানির পতনের সময় পর্যন্ত সময়কালকে আফগান শাসনের সময়কাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আফগানরা এই দীর্ঘ ৩৭ বছরে বাংলাতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে শুধুমাত্র এই সময়সীমার মধ্যেই যে আফগানরা বাংলাতে এসেছিলেন তা নয়।[৭২] তাঁদের বাংলাতে আগমনের ইতিহাস বহু পূর্বে থেকেই ছিল। কারণ আফগানদের বাংলা বিজয়ের অনেক আগে মুসলিম বিজয় বাহিনীর সঙ্গে এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বাংলায় আফগানদের উপস্থিতির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৯৫ সালে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের রচিত ‘মনসা বিজয়’-এ। তিনি সপ্তগ্রামের মুসলিম জনগোষ্ঠীর কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন সৈয়দ, মোল্লা, কাজী, মখদুম, মোঙ্গল (মোঘল) এবং পাঠানদের মতো জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির কথা।[৭৩]

তবে আফগানদের বাংলা বিজয়ের আগে থেকেই বাংলার সঙ্গে তাদের পরিচয়ের ইতিহাস বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়ের শুরু থেকেই মুসলিম আক্রমণকারীদের সৈন্যবাহিনীতে আফগান সেনাদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত। উত্তর ভারতে তাঁদের আগমনের সঙ্গে পূর্ব ভারতেও তাদের আগমন ঘটেছিল, কারণ পূর্ব ভারতের উর্বর আবহাওয়া তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল। ১৪৯৩ সাল থেকে ১৫১৯ পর্যন্ত আলাউদ্দিন হুসেইন শাহের সময়ে বাংলায় আফগান উপস্থিতি লক্ষ করার মতো। বাংলা বিজয়ের পূর্বে আফগানরা বাংলাতে অভিবাসিত হওয়ার মূল কারণ ছিল স্থায়ী বসবাসের গড়ে তোলা এবং প্রশাসক ও সরকারি চাকুরে হিসাবে সম্মানজনক অবস্থানে নিজেদের অধিষ্ঠিত করা।[৭৪] তবে বাংলাতে আফগান অভিবাসনের অভিমুখ লক্ষ করা গিয়েছিল ১৫৩৮ সালে শূরদের বিজয়ের মধ্যে দিয়ে। এই সময়পর্বে আফগানরা শাসকের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হন। ১৫৩৮ সাল থেকে ১৫৫৩ সাল পর্যন্ত শেরশাহ শূর, ১৫৫৩ সাল থেকে ১৫৬৪ সাল পর্যন্ত শামস আল দীন মহম্মদ এবং ১৫৬৪ থেকে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত কররানি, এই তিন আফগান শাসকের সময়কালে আফগানরা ব্যাপকভাবে বাংলাতে অভিবাসিত হয়েছিলেন। এই তিনজন আফগান

শাসকের সময়ে আফগানরা ব্যাপকভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৭৫] পরবর্তীকালে আফগান শাসকরা যখন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরে গেল তখন সাধারণ আফগানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল নিজেদের মধ্যে ঐকের অভাবে।

১.৪. আধুনিক যুগে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের প্রসার ও আফগান বাস্তুচ্যুতি

ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের সূত্রপাত অতীতের ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এই দুইয়ের সমন্বয়ে সম্পাদিত হয়েছিল। তবে আধুনিক সময়পর্ব থেকে একেবারে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে অনেকগুলি নতুন নতুন সমীকরণ লক্ষ করা যায়, যা দু'দেশের সম্পর্কের উপরে গভীর প্রভাব ফেলে। ঔপনিবেশিক আমলে আফগানিস্তানের উপরে ব্রিটিশদের আধিপত্যবাদী নীতির ফলে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের ধারা অন্যরকম ছিল। এই সময় একের পর এক ব্রিটিশ আগ্রাসন আফগানিস্তানের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে, ফলস্বরূপ ব্রিটিশদের সঙ্গে আফগানিস্তানের পরপর তিনটি যুদ্ধ সম্পাদিত হয়। ইতিহাসে যা 'ইঙ্গ-আফগান' যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ আফগানিস্তানের প্রাদেশিক বিষয়ে ব্রিটিশরা হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং শুরু হয় জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার নীতি। পরবর্তীকালে আফগানদের তাদের মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হলে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারত এবং আফগান সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচিত হতে থাকে। এই সময় থেকে অন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা রকমের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। ফলে অর্থনৈতিক যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের পরিসর খুলে যেতে থাকে। যদিও আফগানিস্তান দীর্ঘ সময় জুড়ে তাদের নিজেদের দেশের অন্তর্দেশীয় সমস্যা এবং বৈদেশিক অভিঘাতে জর্জরিত থাকার ফলে সব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবে

আফগানিস্তানকে পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভারত সর্বোতভাবে সাহায্য করেছিল। এর ফলে ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক যোগাযোগ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নতুনভাবে গড়ে উঠতে থেকে। যোগাযোগের এই ধারার মধ্যে দিয়ে সাধারণ আফগানরা ব্যবসা- বাণিজ্য এবং জীবিকা নির্বাহের কারণে অভিবাসিত হতে শুরু করেন। তাই ১৯৭৯ সালে রাশিয়ার আগ্রাসন এবং ২০০১ সালে তালিবান শক্তির উদ্ভবের সময়ে ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসনের ধারা উত্তরোত্তর ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আফগান অভিবাসিত নাগরিকদের মধ্যে আফগান কাবুলিওয়ালারা ছিল অন্যতম একটা বৃহৎ অংশ। যাঁরা ঔপনিবেশিক আমলের শুরু থেকেই ভারবর্ষে অভিবাসিত হয়েছেন। ভারত তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, তবে নাগরিকত্বের সমস্যা তাদের জীবনকে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

১.৪.১. ঔপনিবেশিক আমলে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্ক ও আফগান বাস্তুচ্যুতি

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ ১৮১৫ সালে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ানের পতনের পরে রাশিয়া যখন ক্রমশই মধ্য-এশিয়াতে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনযোগ দিচ্ছে এবং একে একে সমরখন্দ, বোখরা, তাসখন্দ প্রভৃতি স্থান জয় করে আফগানিস্তানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই রাশিয়ার এই অগ্রসরতা ইংরেজদের মনের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিল। কারণ ইংরেজরা অনুধাবন করতে থাকেন রাশিয়া যদি কোনও ভাবে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে পারে তাহলে অতি সহজেই আফগানিস্তান থেকে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করা সহজ হবে। তাই ব্রিটিশদের প্রধান লক্ষ ছিল আফগানিস্তানকে যতটা পরিমান রুশ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। এমত অবস্থায় ব্রিটিশরা চেয়েছিল আফগানিস্তানকে যতটা সম্ভব দুর্বল করে রাখা যায় যাতে করে আফগানিস্তান ব্রিটিশ কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকারের এই কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আফগানিস্তান এবং ব্রিটিশ ভারতকে কাছাকাছি এনে দেয়। এছাড়াও ১৭৯৩ থকে ১৭৯৯ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবল শক্তিধর একটি শক্তি ছিল। এই পেক্ষাপটে আফগানিস্তান নিরবিচ্ছিন্নভাবে বৈদেশিক সমস্যাতে আচ্ছন্ন ছিল। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-শিখ চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজরা

আফগানিস্তানের খুব কাছাকাছি চলে আসে।[৭৬] এর ফলে ইঙ্গ-আফগান সম্পর্কের উন্নতি সাধন হয়। ঠিক এই সময় ব্রিটিশরা শাহ সুজাকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে যায়। কাজেই খুব সহজে অনুমান করা যায় ঔপনিবেশিক শাসনকালে দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের বুনন কতটা দৃঢ় হয়। তবে ১৮০৯ থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের মূল লক্ষ ছিল কোনও ভাবেই যেন বিদেশি শক্তি ভারতের কাছাকাছি না চলে আসে। তাই দুটি নীতির উপরে নির্ভর করে ব্রিটিশরা তাদের কর্তৃত্বকে কায়েম রাখার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন।

১. হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে কোনও শক্তি যাতে আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। এবং অপরটি ছিল-
২. আফগানিস্তান এবং হিন্দুকুশ অঞ্চল জয় করে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।[৭৭]

এমত অবস্থায় ১৮২৬-৬৩ সালে আফগানিস্তানের আমির দোস্ত মহাম্মদ (১৭৯৩-১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ) দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনায় ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষত উত্তরে রুশ আক্রমণ এবং দক্ষিণে নিজ ভাইয়ের বিদ্রোহ এবং সর্বপরি পূর্বে রণজিৎ সিংহ ও পশ্চিমের পারসিক আক্রমণের ভয়ে আমির দোস্ত মহম্মদ ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হয়েছিলেন। এই অবস্থায় বড়লাট অকল্যান্ড আফগানিস্তানে ব্রিটিশ প্রভাব বৃদ্ধি এবং রুশ বিরোধিতার দ্বৈত লক্ষ নিয়ে আমির দোস্ত মহাম্মদ-এর কাছে বার্নেস নামের একজন দূত প্রেরণ করে আফগানিস্তানের সঙ্গে মিত্রতার প্রস্তাব দেন। এই মিত্রতার প্রস্তাব সার্থক না হলে দোস্ত মোহাম্মদ রাশিয়ার দিকে ঝুকে পড়েন এবং রুশ দূত ভিক্টোচিভকে আফগানিস্তানে আমন্ত্রণ জানালে আতঙ্কিত হয়ে লর্ড অকল্যান্ড দোস্ত মোহাম্মদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে ১৮০৯ সালে শাহ সুজাকে সিংহাসনে বসান। এর ফলে শাহ সুজা, রঞ্জিত সিং এবং ইংরেজদের মধ্যে এক 'ত্রিশক্তি চুক্তি' স্থাপন হয়েছিল।[৭৮] এই মিলিত বাহিনী আফগানিস্তানে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন (১৮৩৯-৪২)। ফলে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল, যুদ্ধে দোস্ত মোহাম্মাদ পরাজয় স্বীকার করেন এবং মিত্র বাহিনী শাহ সুজাকে (১৭৮৫-১৮৪২) কাবুলের সিংহাসনে বসিয়ে দোস্ত মহম্মদকে কলকাতাতে নির্বাসিত করা হয়।[৭৯] প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের

ফলে আফগানিস্তানের উপর ব্রিটিশ সরকারের প্রভুত্ব প্রকারান্তরে বৃদ্ধি পায় এবং ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।

তবে স্বাধীনতা প্রিয় আফগানরা শাহ সুজার রাজত্বকে মেনে নিতে চায়নি। কারণ প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের শর্ত অনুযায়ী আফগানিস্তানে যে সমস্ত ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ছিল তাদের আচরণ আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ১৮৪১ সালে দোস্ত মোহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর নেতৃত্বে শাহ সুজাকে উচ্ছেদ করে বার্নেসকে হত্যা করলে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সেনাদল কাবুল ত্যাগ করেন এবং দোস্ত মোহম্মদ পুনরায় সিংহাসনে বসেন। ঐতিহাসিক রবার্টস বলেছেন যে- "রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল বিপর্যয় এবং নৈতিক দিক দিয়ে ছিল পুরোপুরি ভ্রান্ত"।[৮০]

১৮৬৪ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের বড়লাট লর্ড লরেন্স, লর্ড মিয়ো, এবং নথব্রুক তিন জনেই আফগানিস্তান নিয়ে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৭৩ সালে রাশিয়া 'খিবা' দখল করে আফগানিস্তানের কাছাকাছি চলে আসে যখন ইংল্যান্ডে রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় ছিলেন। ১৮৭৬-৮০ সালে লর্ড লিটন ক্ষমতায় এসে আফগান আমির শের আলির কাছে মিত্রতার প্রস্তাব পাঠান। ব্রিটিশদের এই মিত্রতার পিছনে যদিও আলাদা যুক্তি ছিল, তাঁরা চেয়েছিল আফগানিস্তানের বিদেশ নীতিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। কিন্তু শের আলি (১৮২৫-১৮৭৯) খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন, ফলে তিনি পালটা রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। লর্ড লিটন এই খবরে ক্ষিপ্ত হয়ে দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান (১৮৭৮-১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ) যুদ্ধের সূত্রপাত করেন। যুদ্ধে শের আলির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের মনোনীত ইয়াকুব খাঁ'কে (১৮৪৯-১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) সিংহাসনে বসান এবং তাঁর সঙ্গে ১৮৭৯ সালে গন্ডামাকের সন্ধি স্বাক্ষর করেন।[৮১]

তবে এই সন্ধির ফলশ্রুতি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৮০ সালে লর্ড রিপন আব্দুর রহমানকে (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ) আমির পদে অভিষিক্ত করে কাবুলের মধ্যে থেকে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট তুলে নেন এবং চুক্তি হয় আফগানিস্তান একমাত্র ব্রিটিশ ছাড়া অন্য

কোনও দেশের সঙ্গে পররাষ্ট্র সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে না। ব্রিটিশ ভারতে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের যে ইতিহাস উঠে আসে তা একাধারে যেমন ব্রিটিশ আগ্রাসনের ইতিহাস, তেমনই অনেকাংশে রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে নিজেদের ভারত সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার প্রচেষ্টা। এই সময় থেকে ব্রিটিশদের সেনাবাহিনীতে বহু ভারতীয় সেনাদের নিযুক্ত থাকার কথা জানা যায়, যাঁরা ব্রিটিশদের হয়ে আফগানিস্তানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। সমসাময়িক সময়ে অনেক আফগান নাগরিক ইংরেজদের সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন। কারণ আফগান আমিরগণের কাবুলের সিংহাসনে উপনীত হওয়া নির্ভর করত ব্রিটিশদের দাক্ষিণ্যের উপরে। ফলে স্বাভাবতই ব্রিটিশ ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে এই দীর্ঘ ইতিহাসের সূত্র ধরে ভারতে আফগান অভিবাসনের প্রেক্ষিত লক্ষ করা যাচ্ছিল, যা পরবর্তীকালে আরও পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে। ১৯১৯ সালের এর গোড়ার দিকে আফগান সিংহাসনে বসেছিলেন আমানুল্লা খাঁ। তাঁর মূল দাবি ছিল আফগানিস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতা। শেষপর্যন্ত কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব দিকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের বাঁধিয়ে দেওয়া ১৯১৯ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে আফগানরা জয়লাভ করে এবং শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন। এই সময় আফগানরা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়।

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে আফগান বাস্তুচ্যুতির পিছনে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সৃষ্ট বেশ কতকগুলি সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে কাজ করেছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'ডুরান্ড লাইনের' স্থাপন এবং 'পাখতুনিস্তান' গঠন সম্পর্কিত সমস্যা। এই দুই ঘটনার পূর্বে যদিও আফগান যাযাবররা ভারতবর্ষে প্রবেশ করতেন। তবে 'ডুরান্ড লাইনের' স্থাপনের পর থেকে আফগানরা পাকাপাকিভাবে তাঁদের নিজেদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ওয়াখান থেকে পারস্য সীমানা পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণ সীমানা (ডুরান্ড সীমানা) নির্ধারিত করে। এর ফলে আফগানিস্তানের পাশতুন অধ্যুষিত ৪০,০০০ বর্গমাইল ভূমি হারায়।[৮২] কাজেই লক্ষ লক্ষ আফগান নিজেদের

মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমনকী এই ‘ডুরান্ড রেখার’ কারণে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই উপজাতি, এমনকী একই গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, যা আফগানরা মেনে নিতে পারেননি। ডুরান্ড রেখার যে অংশ অবিভক্ত ভারতের (বর্তমানে পাকিস্থান) দিকে পড়েছিল, সেই অংশের পাঠানরা বিদ্রোহ করলে ইংরেজরা তা শক্ত হাতে দমন করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে ‘অস্থায়ী সীমারেখা নির্ধারণ’ করার ফলে আফগানদের একটা বিরাট অংশ ভারতের দিকে অগ্রসর হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। যাঁরা অভিবাসনের মধ্যে দিয়ে বাধ্য হয়ে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করে। এঁরাই পরবর্তীকালে আফগান অভিবাসী সম্প্রদায় হিসাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বসববাস করতে শুরু করেছিলেন।[৮৩]

ঔপনিবেশিক আমলে আফগান বাস্তুচ্যুতির প্রেক্ষাপটের পিছনে ‘পাখতুনিস্থান’ সমস্যা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। কারণ এই সীমারেখার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রশ্নে ভারত প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। ১৯০১ সালে ব্রিটিশ সরকার পাশতুন অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গঠন করেছিল। তবে ব্রিটিশরা যখন মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন প্রবর্তন করেন, তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এই নীতি কার্যকরী হয়নি।[৮৪] এই সময়ে সীমান্ত গান্ধির নেতৃত্বে ‘খুদাই-ই-খিদমতগার’ দল আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৩৫ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসনে স্বীকৃতি আদায় করেন। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধি এবং জহরলাল নেহেরু যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে স্বায়ত্বশাসন দিতে চাইলে আফগানরা তা প্রত্যাখ্যন করেন।[৮৫] কাজেই রাজনৈতিক ভাবে আফগানরা ভারতবর্ষ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেল। তবে ঔপনিবেশিক সময়পর্ব থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তান অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে রয়ে গিয়েছিল। এমনকী সীমান্ত সমস্যার সমকালীন সময়েও আফগানদের ভারতবর্ষে আগমনের ক্ষেত্রে তেমন কোনও বাঁধা ছিল না। ফলে ভারত এবং আফগানিস্তান দুটি দেশের মধ্যে যোগাযোগের ইতিহাস আরও সম্প্রসারিত হতে শুরু করে।

সারণি: ১.১. ১৯২৩ সালে আফগান সরকার কর্তৃক ভারতে জেনারেল নিয়োগের তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	নামের তালিকা	নিয়োগ ক্ষেত্র
১.	মালিক গুলদিন খান	বাংলা এবং আসাম
২.	মালিক সিকানদার খান	সিন্ধ সহ হায়দ্রাবাদ
৩.	মিয়ান খান কাবুলি	----
৪.	মালিক মেহেরবান খান	কলকাতা
৫.	মালিক গোর খান	সুলেমান খেলা-N.W.F.P
৬.	মালিক নবাব খান	দেরা ইসমাইল খান
৭.	মালিক লাল খান	কোন নির্দিষ্ট এলাকার দায়িত্ব ছিল না।
৮.	জুমা শাহ	----
৯.	আকবর খান	----
১০.	মালিক লাল গুল	----
১১.	গুলাম আজম/ আজম খান	----
১২.	গোলাম সামদানি/ গুলাম ঘাউস	----

সূত্র: IB File No-45/1923

১.৪.২. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আফগান যোগসূত্র

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে আফগানদের অংশগ্রহণ দুটি দেশের নিবিড় যোগাযোগের চিত্র বহন করে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গান্ধিবাদী নেতা খান আব্দুল গফফর খানের নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খান আব্দুল গফফর খানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পাঠানরা উপজাতিদের সমস্যা, জাতীয়তাবাদী ভাবধারা এবং সমাজ সংস্কার ও স্বাধীন পাখতুনিস্তান গঠনের মতো ইত্যাদি বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে সীমান্তের পাঠানদের নিয়ে তিনি খোদা-ই-খিদমদগর (১৯২৯) বা ‘ঈশ্বরের সেবক’ নামের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন।[৮৬] এই দলের শাখা ও তাঁদের ভাবধারা সীমান্ত অঞ্চলে

সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দলের সদস্যরা সবাই লাল কুর্তা পরিধান করতেন। তাই এই বাহিনীকে 'লাল কোর্তা' নামেও সমধিক প্রচলিত হয়ে ওঠে। খান আব্দুল গফফর খান (১৮৯০-১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং তার ভ্রাতা ডঃ জব্বার খান (১৮৮৩-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ) দু'জনের নেতৃত্বে সীমান্তে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সীমান্তের সর্বত্র অঞ্চলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সরকারি নির্দেশ অমান্য, সভাসমিতি স্থাপনের মাধ্যমে তাঁরা আন্দোলন চালাতে থাকেন। খান আব্দুল গফফর খান এই সময়ে গান্ধির নিকটে আসেন এবং তার একনিষ্ঠ সেবকে পরিণত হন। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধির অহিংসার আদর্শ তাকে মুগ্ধ করে। তিনিও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন অহিংসার পথ। এই সময় থেকেই 'খোদায়-ই-খিদমদ্গার' প্রতিষ্ঠানের শাখা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষ তথা কলকাতায় এই শাখার অস্তিত্ব আজও রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান আফগানদের সেবা প্রদান কর্মসূচি এবং বিভিন্ন রকমের সমস্যাতে পাশে থাকার চেষ্টা করেন।

এই সংগঠনের মাধ্যমে পাঠানরা একসময় তাদের সংগ্রামী মনোভাব প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সহযোগে নিজেদের দাবিদাবা নিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগামে মহাত্মা গান্ধির আদর্শ গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। সীমান্ত গান্ধি মহাত্মা গান্ধির আদর্শে এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, গান্ধি-আরউন চুক্তির সমর্থন প্রস্তাবে ভাষণ দিতে গিয়ে সভামঞ্চে তিনি বলেছিলেন "তিনি সৈনিক মাত্র, সেনাপতি যদি প্রশ্ন করেন, যে তিনি কি জানেন, তবে তিনি বলবেন, তিনি শুধু জানেন হুকুম তামিল করতে। সমস্ত পাঠান জাতি মহাত্মা গান্ধিকে বিশ্বাস করেন"। অবিভক্ত ভারতবর্ষে ইংরেজরা যখন বারংবার আফগানিস্তানকে আক্রমণ করেছে। ১৯৮৯ শিখ সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ইংরেজরা তাদের আধিপত্য বিস্তারে প্রাণপন চেষ্টা করেছেন। ১৮৯৪ সালে আফগান যুদ্ধের পর ইংরেজরা সুলেমান পর্বতমালার উপর দিয়ে আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ ভারতে 'ডুরান্ড লাইন' সৃষ্টি করেছিলেন।[৮৭] বহু চেষ্টায় তারা সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরবর্তী ৫টি জেলায় তাঁদের শাসন ব্যবস্থা চালু করতে সক্ষম হলেও পশ্চিমে অবস্থিত উপজাতীয় অঞ্চলে শুধু নামমাত্র

আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছিল। ১৮৫৮ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত ইংরেজরা চল্লিশ বারের বেশি আফগানিস্তানে অভিযান চালিয়েছিলেন। এইভাবে একটা লম্বা সময় ধরে ইংরেজরা আফগান পাঠানদের উপরে নির্বিকার অত্যাচার চালাতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আইন-প্রণয়ন বলবত করতে থাকেন। এই সব আইনের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত আইন ছিল 'সীমান্ত অপরাধ আইন' (Forntier Crime Regulation) এই আইন বলে যে কোনও ব্যক্তিকে বিনা বিচারে নির্বাসন দেওয়া যেত।[৮৮]

১৯০৯ সালে যখন মার্লে মিন্টো সংস্কার আইন পাশ হল এবং একই সঙ্গে ১৯১৯ সালে যখন মন্টেগু চেমস ফোর্ড শাসন সংস্কার ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হল, তখনও সীমান্ত প্রদেশ ছিল এই আইনের বাইরে। ফলে সীমান্তের কেউ কোনও সংস্কার দাবি করলে তা ছিল আইন বিরুদ্ধ। কারণ তখন ভারতের অখণ্ড ভূমির জন্যে যে আইন ছিল, সীমান্তের ক্ষেত্রে তা ছিল অন্য আইনের আওতাভুক্ত।[৮৯] ফলে সীমান্তের ওপারে পাঠানদের উপরে চলত আক্রমণ। ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য অংশ সে সময় স্বাধীন হলেও পাঠানরা সেই সময়ে স্বাধীনতা পাননি। ফলে তাদের মধ্যে স্বাধীনতার স্বাদ ছিল চাতকের মতো। তাই যেদিন সর্বভারতীয় স্বাধীনতার ডাক এলো সেই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন এবং সীমান্তের অগণিত মানুষ। যাঁর কথাতে সেদিন এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি হলেন খান আব্দুল গফফর খান, যিনি 'ফকর-ই-পাঠান' এবং 'গান্ধি-এ-সরহদ' বা 'সীমান্ত গান্ধি' নামে একাধিক অভিবাসনে ভূষিত হয়েছিলেন।[৯০]

এরপর গফফর খান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের স্বধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করলেন এবং ক্রমশই গান্ধির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। গান্ধির আদর্শ তাকে আরও বলীয়ান করে তুললেন। এই সময় তিনি সর্বভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখা শুরু করলেন। এরপর ১৯২০ সালে ডিসেম্বরে নাগপুর অধিবেশনে যোগ দেন।[৯১] এই অধিবেশনে গান্ধির বক্তব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যা তার মানসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কারণ গান্ধি যখন নাগপুর অধিবেশনে জিন্না এবং মদন মোহন মালব্যের বিরুদ্ধে গিয়ে অহিংস পদ্ধতিতে সংগ্রাম করতে হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। তখন গান্ধির এই চিন্তা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং এই ঘটনার পর থেকেই গান্ধিজির অহিংসা অসহযোগের কর্মসূচিকে

সম্পূর্ণরূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাখতুন জাতিকে তাদের বঞ্চিত স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারে। ফলে তিনি খিলাফাত আন্দোলন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যান্য কর্মসূচিগুলিতেও অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। ১৯২৬ সালে নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা যখন প্রকটতর আকার ধারণ করল তাঁর ভাবনা চিন্তাতে সবসময় ছিল সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় যখন শ্রদ্ধেয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একজন মুসলমান আততায়ীর হাতে নিহত হলেন, গান্ধিজি বলেছিলেন মুসলমানদের মধ্যে তরবারি অত্যধিক প্রকট হয়ে উঠেছে। ইসলামের মূল মন্ত্র হল শান্তি, সেই অর্থ রক্ষা করতে হলে তরবারি কোষবদ্ধ করতে হবে।[৯২] সাম্প্রদায়িকতার এই উন্মুক্ততা গফফরকে একবিন্দু স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি বলেছিলেন ইসলাম হল আসল, ইয়াকিন ও মহব্বত-সাদারন, ধর্মাচরণ ও প্রেম তার মধ্যে হিংসার কোনও স্থান নেই। তিনি অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতো হিন্দু-মুসলমান সকলকে ব্রিটিশদের বিভেদের সৃষ্টির ফাঁদে পা না দিতে নিষিদ্ধ করেছিলেন।[৯৩] যদিও পরবর্তী সময়ে আফগানরা সীমান্ত গান্ধির এই আদর্শ থেকে সরে এসেছিলেন। তবে তিনি ছিলেন অটল। আব্দুল গফফর খান স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন। এর ফলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে খোদা-ই-খিদমদ্গারের শাখা ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের পাঠানরা বর্তমানে এই শাখার দ্বারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের আফগানদের একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

ঔপনিবেশিক আমলে শুধু যে আফগানরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে বিশেষত কাবুলে বৈপ্লবিক কার্যধারা সম্পন্ন হতে শুরু করেছিল। ভারতীয় মুসলমানরা আফগানিস্তানের স্বাধীনতার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। এই বিষয়ে উল্লেখোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৩৮ সালে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সময়ে ওয়াহাবি নেতা নারিসুদ্দিন প্রায় এক হাজার ওয়াহাবি অনুচর নিয়ে আফগানিস্তানের আমির দোস্ত মহম্মাদের সাহায্যার্থে কাবুল অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। এদের মধ্যে প্রায় ৩০০ জনকে পাঠায় গজনী রক্ষা করতে, কিন্তু তারা পরাজিত হয়। এই ওয়াহাবিদের সম্পর্কে হান্টার বলেছিলেন 'বিধর্মী

ইংরেজের বিরুদ্ধে আঘাত হানার সুযোগ পেলেই তারা আনন্দিত হন'।[৯৪] এর পরে পরাজিত অবস্থায় নাসিরুদ্দিন সহ বাকি অনুচররা শেষে আফগানিস্তানের অন্যতম একটি স্বাধীন উপজাতি একালা 'সিতানা' (Sitana) নামের একটি সুবিখ্যাত ঘাঁটিতে পৌঁছায়।[৯৫] আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে ওয়াহাবি ঘাঁটির অবস্থান থেকেই অনুমান করা যেতে পারে কীভাবে দুটি দেশের মধ্যে যোগাযোগের রাস্তা প্রশস্ত হচ্ছিল।

কাবুলকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশদের বিপক্ষে ভারতীয়রা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপ্লবী সংগঠনগুলি তাদের বিদ্রোহ জারি রাখার জন্য এবং সংগঠনের কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্যে কাবুলকে ব্যবহার করেছিল। যেমন ভারতের কম্যুনিস্ট মতালম্বীরা তাঁরা যেমন ব্রিটিশ আগ্রাসনের জন্য আফগানিস্তানকে ব্যবহার করেছিলেন, তেমনই বরকতুল্লাহ, ওবাদুল্লাহ, মহেন্দ্রপ্রতাপ, আবদুল রব পাশোয়ারি, ত্রিশূল আচার্য্যর মতো নেতারা আফগানিস্তানে অবস্থান করেছিলেন।[৯৬] আবার ১৯২১-২২ সালে কাবুলে জাতীয় কংগ্রেসের শাখা স্থাপন করেছিলেন যার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও জওহরাল নেহেরু। নেহেরু মিউজিয়ামে সংরক্ষিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির চিঠি-পত্র থেকে জানা যায় কাবুল কংগ্রেসের গুরুত্বের কথা।[৯৭] এছাড়া নেতাজি সুভাষচন্দ্র কাবুলে আগমনের কথাও জানা যায়। কাজেই ভারত আফগানিস্তানের মধ্যে যোগাযোগের ইতিহাস ঔপনিবেশিক সময়পর্ব পেরিয়ে এসেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

১.৪.৩. স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দু'দেশের আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রসার

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারত-আফগানিস্তান দুটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। বিশেষত ১৯৪৭ সালের পরে ভারতবর্ষের রাজনীতি তথা সমাজনীতিতে অনেকগুলি পরিবর্তন সাধিত হয়, যার প্রভাব এসে পড়ে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের উপরে। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে ভারত বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি থেকে

মুক্তিলাভ করতে পারলেও, আফগানিস্তান এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে আফগানিস্তানকে নির্ভর করতে হয়েছিল অন্যান্য দেশের উপরে। ঠিক এমনই এক প্রেক্ষাপটে ভারত বারবার সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছে আফগানিস্তানের দিকে। আফগানিস্তানের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে সবল করে তোলার পিছনে ভারতের অংশগ্রহণ প্রশ্নাতীত। এর ফলে ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দুটি দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেকগুলি পর্যায় লক্ষ করা গেলেও একের পর এক পররাষ্ট্র আক্রমণ এবং গৃহযুদ্ধের আবহে আফগানিস্তান যখন বিদ্ধস্ত; তখন ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক ছিল অটুট। এই সময়ে মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির মেলবন্ধন ও যোগাযোগের একমাত্র পথ ছিল আফগানিস্তান। পরবর্তীকালে যা ভারতবর্ষের সঙ্গেও সংযুক্ত হয়েছিল।[৯৮] আফগানিস্তান দেশটি ছিল স্থলবেষ্টিত এবং পার্বত্য এলাকা। জীবিকার জন্য কৃষিকাজের উপরে নির্ভরশীল ছিল, কিছুটা পশুপালন জীবিকা নির্বাহ করতেন। এছাড়াও আফগান অর্থনীতির অন্য দিকটি ছিল বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা না থাকার কারণে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলির সঙ্গে আফগানিস্তান বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। অর্থনৈতিক এই অগ্রশীলতার এই তাড়না থেকেই দুটি দেশ ক্রমশ কাছাকাছি আসতে শুরু করে।

আফগানিস্তানের স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানের প্রতিবাদ করার সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত করে, এরপরেই আফগানিস্তানের রাজা জাহির শাহ ১০ জুলাই ১৯৫৮ সালে ভারত সফরে এসে তিনি আরও এক বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন। যাতে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটে।[৯৯] ভারত ও আফগানিস্তানের এই বাণিজ্যিক বিনিময় পাকিস্তানের মধ্য দিয়েই সম্পাদিত হতে থাকে। ফলে পরিবহণ ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।[১০০] তবুও ১৯৬১ সালে সেপ্টেম্বরে ভারতবর্ষে রপ্তানিজাত আঙুরের মতো পণ্যগুলি ১০০% বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে ১৯৬০-৬২ সালের মধ্যে দুটি দেশের মধ্যে অনেকগুলি বাণিজ্যিক চুক্তি স্থাপন হয়েছিল।[১০১] প্রধানমন্ত্রী নেহেরু স্বীকার করেছেন, যে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সহনশীলতার জন্য কেন্দ্রীয় শক্তির সাহায্যের দরকার ছিল।[১০২] এর ফলে আধুনিক

সময়ে আফগানিস্তানের অর্থনীতির উন্নয়নের সর্বপ্রথম গুরত্বপূর্ণ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছিল। যার নাম ‘হেলম্যান্ড ভ্যালি’ অথরিটি (১৯৫২) যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস ভ্যালির অনুকরণে স্থাপিত হয়েছিল।[১০৩] ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে জুলফিকার আলি ভুট্টোর অধীনে থাকা পাকিস্তান ও আফগান সীমান্ত বন্ধ হয়ে গেলে আফগানিস্তানের সঙ্গে অন্যান্য দেশ বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ানের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। একই সঙ্গে ১৯৭০ সালে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গেও সম্পর্ক দৃঢ় হয়। ফলে বেশিরভাগ পণ্য ভারত থেকে আমদানি রপ্তানি হতে থাকে। তবে ১৯৭১ সালের পর থকে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি হতে থাকে দুটি দেশের মধ্যে। কারণ সেই সময় আর্ন্তজাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বদল ঘটতে থাকে এবং পাকিস্থানের মধ্যে দিয়ে পরিবহণ বা স্থলপথের দ্বারা ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান ঘটতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দীরা গান্ধি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন ‘আফগানিস্তানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে দু’দেশের অর্থনৈতিক সহযোগীতা চাই। কিন্তু যোগাযোগের সরাসরি মাধ্যম না থাকায় বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছিল তিনি আরও বলেন আফগানিস্তানের পণ্যদ্রব্যগুলির উপভোগ করতে পারছে না, এমন কোনও পরিবার যেন ভারতে না থাকে’।[১০৪]

আফগান বিদেশ মন্ত্রী দোস্ত মহম্মদ ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্ক দৃঢ় করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তার মূল লক্ষ ছিল ভারত আফগানিস্তানের মধ্য বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে তোলা। ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে ভারত এসে তিনি দুটি দেশের মধ্যে যাতে বাণিজ্যিক ও কারিগরিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিষ্ঠিত রূপ পায় সে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর কথা তিনি বলেছিলেন। এছাড়া আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল ওয়াকিল বৈঠকে উপস্থিত থেকে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষরিত করেন।[১০৫] যাঁর দ্বারা ভারতের সঙ্গে কৃষি, পণ্য সহায়তা, এবং টেলিকমিউনিকেশন সহযোগিতার প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছিলেন।[১০৬] এরপর ১৯৬৫ সালে ফেব্রুয়ারিতে আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মহম্মদ ইউসুফ ভারত সফরে এসে ভারতবর্ষের সঙ্গে ‘সংস্কৃতি চুক্তি’র’ (১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ) আনুষ্ঠানিক বিনিময় করেন। ১৯৬৫ সালের আগস্টে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপনের কথা বলেন।

ফলে উভয় দেশের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক সম্পর্ক নতুন ভাবে স্থাপন হতে শুরু হয়।

ভারত-আফগানিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করে তুলতে ভারত সরকার আফগান ছাত্রদের পড়শুনোর ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন। কাজেই আফগান ছাত্রদের ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করেছিলেন। যেমন ভারতীয় বনদপ্তর, ডাকবিভাগ এবং টেলিগ্রামের মতো বিভাগ গুলিতে। এছাড়াও ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স-এর সঙ্গে টেলিকমিউনিকেশন পাঠক্রমগুলিতেও। এছাড়া জনসেবা মূলক কাজের মধ্যে আফগান শিশু ও শরণার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ভাতা প্রদান করেছিলেন। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরালাল নেহেরুর সঙ্গে তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধি আফগান সরকারের আমন্ত্রণে কাবুলে যান। আফগানিস্তান সরকার নেহেরুকে গাজী স্টেডিয়ামে সম্মান প্রদান করেন। দাউদ খান তার বক্তব্যে নেহেরুর প্রশংসা করেন এবং বলেন- “I am very happy to welcome on behalf of the Government and People of Afganisthan a distinguished and outstanding Personality like the Prime Minister”, প্রত্যুত্তরে নেহেরু বলেন “Good friend and Neighbor”।[১০৭] ১৯৫৯ সালের ১৭ ই সেপ্টেম্বরে সফর শেষে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীরা দুটি দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং পারস্পারিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। এর মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহমত প্রকাশ করেন।[১০৮]

১৯৬৭ সালে আফগানিস্তানের রাজা দিল্লি সফরে আসেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। ইন্দিরা গান্ধি তাঁর সাক্ষাৎ ভাষণে বলেছিলেন কাবুলের শিশুদের হাসপাতালের স্থাপন দুটি দেশের মধ্যে ‘চিরস্থায়ী প্রতীকি বন্ধুত্বের সাক্ষর বহন করবে’। পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানে ভারত দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন যেমন আফগানিস্তানের উচ্চশিক্ষায় বৃত্তিপ্রদান, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। ICCR এবং ITEC মতো বৃত্তি প্রদানের মধ্যে দিয়ে আফগানিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সর্বপরি দুটি দেশের মধ্যে ছাত্ররা যাতে অবাধ যাতায়াত করতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। আফগানিস্তানের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে সহায়তা দান করার জন্য ভারত সরকার স্বাধীনতা

পরবর্তীকালে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বৈদেশিক আক্রমণে ভেঙে যাওয়া আফগান পার্লামেন্টকে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারত সরকার আর্থিক সহযোগিতা দান করেছিলেন। আফগানিস্তানের সড়কপথ নির্মাণের জন্যেও ভারত সরকার তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি কাবুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন দুটি দেশের যোগাযোগ সেই প্রাচীন কাল থেকেই। এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে দু'দেশকেই একসঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।[১০৯] পরবর্তীকালে মনমোহন সিং আফগানিস্তান সফরে এসে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে দৃঢ় করার সপক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন আফগানিস্তানের অর্থনীতিতে চাষবাস এবং মানব সম্পদের মতো বিষয়গুলির উন্নয়নে জোর দিতে হবে।[১১০]

এইভাবে ভারতের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এবং সরকারিভাবে সহযোগিতা দুটি দেশের যোগাযোগকে সুনিশ্চিত করেছিল। যে কোনও দুটি দেশের যোগাযোগ তখনই বৃদ্ধি পেতে পারে যখন দুটি দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হয়। দুটি দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের অন্যতম স্মারক হল উভয় দেশের সংসদ, গণমাধ্যম, নারী, ক্রীড়া ইত্যাদি বিষয়গুলির মধ্যে সাদৃশ্য ফুটে ওঠা। ভারত সরকার আফগানিস্তানে নারীর উন্নয়ন, শিক্ষা এবং দারিদ্র তার মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিলে দুই দেশের মধ্যে মানবিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া পর্যটন ব্যবসাকে সহজ করার জন্য দু'দেশের মধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য বিশেষত আঙুর, তরমুজ, ডালিম, এবং পোস্তোর মতো পণ্যদ্রব্য ভারতের বাজারে নিয়ে আসা হত আফগানিস্তান থেকে ফলে দুটি দেশের বাণিজ্যিক বিনিময় উভয় দেশকে অনেকটা কাছাকাছি নিয়ে আসে।[১১১]

২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সরকার আক্রমণ করলে ভারতের যৌথ বাহিনী এবং গোয়েন্দাবিভাগ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করেছিল। তালিবানদের উৎখাত হওয়ার পরে নতুন করে আফগানিস্তানের গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে ভারত মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। একই সঙ্গে আফগানিস্তানের পুনঃগঠন এবং পুনর্নির্মাণের জন্য সহযোগীতা গ্রহণ করতে থাকেন। এর আগে ভারত বায়ুসেনা, পাওয়ার প্লান্ট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ২০০১ সালে আফগানিস্তানকে সহযোগীতা

করে নজির সৃষ্টি করেছিল। তার পূর্ণ নবীকরণ রূপে পাওয়া যায় যখন ভারত সরকার পুনরায় অর্থনৈতিক এবং মানবিকভাবে সাহায্য প্রদান করেছিল।[১১২] ভারত সরকার আফগানিস্তানের বিদ্যুৎ, তেল সরবরাহ প্রাকৃতিক গ্যাসের লাইনের সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী ২০০৯ সালে সড়কপথ নির্মাণ করেছিলেন। এর মূল লক্ষ ছিল ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা। এর ফলে ২০০৬ সালে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে ব্যবসায়িক উন্নয়নে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করা হয়। এর ফলে ২০০৭ সালে আফগানিস্তান সার্কের (SAARC) সদস্য পদ লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করে।[১১৩] কলম্বোতে সার্ক সম্মেলনে ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করেছিল আফগানিস্তানকে। ২০০৪ সালে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হামিদ কাজরাই নয়া দিল্লিতে আসেন এবং দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হতে থাকে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ২০১১ সালে আফগানিস্তানকে পুনঃগঠনের প্রায় ২ মিলিয়ান মার্কিন ডলার প্রদান করেছিলেন।[১১৪]

ভারত আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের পূর্ণ চিত্র ফুটে ওঠে ২০০৫ সালে। আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্য ২০০৩ সালে ৬ মার্চ একটা চুক্তি সাক্ষরিত হয় দিল্লিতে Preserential trade Agrement (PTA) এই চুক্তির ফলে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের সচলতা বৃদ্ধি পায়।[১১৫] এই চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যেই ছিল-

১. বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের জন্য সুসংহত এবং সংগঠিতভাবে দুটি দেশের মধ্যে উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
২. বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যে শর্তাবলী প্রযোজ্য তা হবে অত্যন্ত সহজতর, যাতে দুটি দেশের বাণিজ্যিক অগ্রসরতার জন্য কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়।
৩. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির প্রসঙ্গে দুটি দেশের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কখনই বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না। এইভাবে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক যোগাযোগের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক মজবুত হবে।

ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে শক্তিশালী ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে। দিল্লি এবং কাবুলের মধ্যে যোগাযোগ শুধুমাত্র দুটি সরকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক যোগাযোগের সচেনতা ছিল। ২০১৫ সালে এপ্রিল মাসে এক আনুষ্ঠানিক সফরে আফগান প্রেসিডেন্ট গনি ও শ্রী প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিল্প, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয় এবং আপদকালীন অবস্থায় দুর্যোগ মোকাবিলার জন্যে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।[১১৬] সাম্প্রতিক সময়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যত্নশীল। তিনি বলেছেন-“ভারত আফগানিস্তানের সম্পর্ক সেই প্রাচীন কাল থেকে। মহাভারতের মধ্য আমরা গান্ধারীর কথা উল্লেখের মধ্যে দিয়ে তা জানতে পারি। গান্ধারী ছিলেন গান্ধার রাজ্যের রাজকন্যা।[১১৭] বর্তমানে কাবুলিওয়ালারা দুটি দেশের মধ্যে সেই সম্পর্ক ধরে রেখেছেন। কবিগুরুর রচিত ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে আমরা সেই চিত্র দেখতে পাই।

১.২. সারণি: ভারত-আফগানিস্তান আমদানি-রপ্তানিজাত পণ্যদ্রব্য

রপ্তানি, আমদানি ভারত ও আফগানিস্তান	
ভারত থেকে যা যা পেত আফগানিস্তান	**আফগানিস্তান থেকে যা যা পেত ভারত**
পোশাক-পরিচ্ছদ	আখরোট
জীবনদদায়ী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধ	কাজুবাদাম
চিকিৎসার সরঞ্জাম	অঞ্জির
কম্পিউটার	অ্যাপ্রিকট
সিমেন্ট	সবুজ ও কালো রঙের কিশমিশ
চিনি	সুগন্ধী হিং
কৃত্রিম ফাইবার	ডুমুর

সূত্র- কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান এবং আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ আগষ্ট ২০২১

১.৪.৪. স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে আফগান বাস্তুচ্যুতি ও নাগরিকত্ব

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কাল থেকে সমকালীন সময়ে আফগান বাস্তুচ্যুতি মানুষের নাগরিকত্ব প্রদানে ভারত সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ২০১১ -র

জনগণনা থেকে জানা যায় ভারতে প্রায় ৫০ লক্ষ অভিবাসী মানুষের বসবাস ছিল। এদের মধ্যে ৯৭ শতাংশ এসেছেন নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভুটান, শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তান থেকে।[১১৮] যদিও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসনের চিত্র সেভাবে ধরা পড়েনি 'সাওর' বিপ্লবের আগে পর্যন্ত। তবে 'সাওর' বিপ্লবের পর থেকে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন সমীকরণের উৎপত্তি হতে থাকে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে আফগান অভিবাসনের তরঙ্গকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত যখন সোভিয়েত-আফগান দ্বন্দ্বের সময়কাল, দ্বিতীয়ত ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যখন আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত, তৃতীয়ত ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত যখন আফগানিস্তানে তালিবান শাসনে বিধ্বস্ত এবং চতুর্থত ২০০১ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আফগানিস্তানের অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা।[১১৯] এই চারটি বৃহৎ সমস্যার কারণে আফগানদের বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে। যার ফলস্বরূপ আফগানরা সারা পৃথিবীতে অভিবাসনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আফগান অভিবাসনের এই কালপর্বে অনেকেই ভারতবর্ষকে বেছে নিয়েছিলেন বাসস্থান, অন্নসংস্থান ও সর্বোপরি জীবিকা নির্বাহের কারণে।

ভারতে আফগান অভিবাসনের মূল পর্যায় শুরু হয়েছিল ১৯৭৯ সালে যখন সোভিয়েত আগ্রাসন হানা দিয়েছিল আফগানিস্তানের উপরে। এই সময়ে বেশিরভাগ আফগান জনগোষ্ঠী তাদের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান এবং ইরানে অভিবাসিত হয়েছিলেন। আসলে ভৌগোলিক দিক দিয়ে এই দুটি দেশ ছিল আফগানিস্তানের একেবারে সীমান্তবর্তী, সুতরাং স্বাভাবিকভাবে সর্বাধিক আফগান বাস্তুচ্যুত মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল এই দুটি দেশ।[১২০] ইরান এবং পাকিস্তানে সর্বাধিক আফগানরা অভিবাসিত হলেও, আফগানদের বেশ কিছু অংশ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ১৯৮০-র দশকে অর্থাৎ ১৯৭৮-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ভারতে আফগানদের অভিবাসনের পিছনে অন্যতম প্রেরণা ছিল ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের ঐতিহ্য।

১৯7৮ সালে অভিবাসিত হয়ে যাঁরা ভারতে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন মূলত আফগান পাশতুন জনগোষ্ঠীর মানুষ।[১২১]

১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তান যখন গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত তালিবান সরকার যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এই সময়ে ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসনের একটা নতুন ধারা লক্ষ করা যায়। সাম্প্রতিক কালে UNHCR -এর তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসনের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল আফগান হিন্দু এবং শিখ জনগোষ্ঠীর মানুষ, যাঁরা মূলত আফগানিস্তান থেকে সংকটময় পরিস্থিতিতে পালিয়ে এসেছিলেন। এদের মূল ভীতি ছিল মুজাহিদীন এবং তালিবান শাসনের আগ্রাসন। এঁরা ভারতকে আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কারণ এই সমস্ত আফগান হিন্দু ও শিখ জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ভারতকে বরাবরই পৈত্রিক আবাসভূমি বলে মনে করতেন এবং দাবি করেন তাদের পূর্বপুরুষরা উনিশ শতকের প্রথম দিকে রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। প্রথমে আফগান অধিকৃত পাঞ্জাবে এবং তারপরে আফগান ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। কাজেই এই ধারণার উপরে নির্ভর করে পূর্বের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে তাঁরা ভারতবর্ষে অভিবাসিত হয়েছিলেন।[১২২]

তালিবান পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আফগান বাস্তুচ্যুতি মানুষের অভিবাসন লক্ষ করা যায়। ভারত সরকার এই সমস্ত আফগান অভিবাসিত নাগরিকদের ভারতে বসবাসের ক্ষেত্রে নানান রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, ফলে সময়কালীন সময়ে ভারতের বেশ কিছু বড় বড় শহর-গুলিতে আফগান অভিবাসিত মানুষের বসবাস গড়ে উঠেছে। দিল্লি থেকে কলকাতা, মুম্বাই থেকে শিলং প্রভৃতি স্থানে আফগান অভিবাসিত নাগরিকদের এখনও দেখা মেলে। বিশেষত দিল্লিতে বেশ কিছু মহল্লায় আফগাদের আনাগোনা বহুলভাবে পরিলক্ষিত হয়। এমনকী কলকাতাতে এই সমস্ত আফগান অভিবাসিত নাগরিকদের দেখা মেলে।

সারণি: ১.৩. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আফগান শরণার্থীদের পরিসংখ্যান (১৯৭৯-১৯৯০)

সাল	পাকিস্তান	ইরান	ভারত
১৯৭৯	৪০২,০০	১০০,০০	
১৯৮০	১,৪২৮,০০০	৩০০,০০০	
১৯৮১	২,৩৭৫,০০০	১,৫০০,০০০	২,৭০০
১৯৮২	২,৮৮৭,০০০	১,৫০০,০০০	৩,৪০০
১৯৮৩	২,৮৭৩০০০	১,৭০০,০০০	৫,৩০০
১৯৮৪	২,৫০০,০০০	১,৮০০,০০০	৫,৯০০
১৯৮৫	২,৭৩০,০০০	১,৮৮০,০০০	৫,৭০০
১৯৮৬	২,৮৭৮,০০০	২,১৯০,০০০	৫,৫০০
১৯৮৭	৩,১৫৬,০০০	২,৩৫০.০০০	৫,২০০
১৯৮৮	৩,২৫৫,০০০	২,৩৫০,০০০	৪,৯০০
১৯৮৯	৩,২৭২,০০০	২,৩৫০,০০০	৮,৫০০
১৯৯০	৩,২৫৩,০০০	৩,০৬১,০০০	১১,৯০০

Source: UNHCR, Geneva, Switzerland, June1999

১.৫. পর্যবেক্ষণ

ভারত এবং আফগানিস্তান দুটি দেশের মধ্যে যোগাযোগের ইতিহাস আবহমান কাল জুড়ে বহমান রয়েছে। এই সম্পর্ক নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ মহাকব্যের যুগে গান্ধারীর ইতিহাস থেকে শুরু করে, ঋকবৈদিক ও হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্যিক এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতির মধ্যে দুটি দেশের যোগাযোগেই ইতিহাস স্পষ্ট ফুটে ওঠে। যে যোগাযোগের ধারা কুষাণ যুগে গান্ধার সংস্কৃতি এবং আফগানিস্তানে বৌদ্ধধর্মের প্রসারতার সঙ্গে যেন মিলিয়ে দিয়েছিল। তবে মধ্যযুগের ইতিহাসে দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অভিবাসনের ইঙ্গিত স্পষ্ট ফুটে ওঠে। সুলতানি আমল থেকে মোঘল যুগ পর্যন্ত আফগানদের ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে অভিবাসনের বিষয়টি প্রাধান্য পেলেও আধিপত্যবাদের বিষয়টি ছিল সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। কাজেই এই আধিপত্যবাদের মধ্যে দিয়ে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, ভারতের খাস জমি দখলের চেষ্টা এমনকী সামরিক যোদ্ধা হিসাবে অভিজাতদের দরবারে তাঁদের আগমন ঘটেছিল। একইভাবে ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে বর্তমান

সময় পর্যন্ত আফগানিস্তানে একাধিক সংকট, পররাষ্ট্র আক্রমণ, গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতির কারণে অগণিত আফগানদের ভারতে আগমন ঘটেছে। এই সমস্ত আফগান বাস্তুচ্যুতি মানুষের আশ্রয়স্থল হিসাবে ভারত সবসময় অগ্রণী ভুমিকা পালন করে চলেছে। কাজেই আফগান নাগরিকদের প্রতি ভারতের এই রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা আফগান অভিবাসী মানুষের মনে আসার সঞ্চার করেছে। ফলে কাবুলিওয়ালাদের মতো জনগোষ্ঠীরা যুগে যুগে বসতি স্থাপনের জন্য ভারতবর্ষকে বেছে নিতে দ্বিধা করেননি।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. মলয় কুমার দাস: *ভারত আফগানিস্তান সংস্কৃতির অনন্যের প্রেক্ষিতে অন্বয়ী ঐতিহ্যের পুনউত্তরাধিকার,* (কলকাতা, ইতিহাস অনুসন্ধান, খণ্ড-১৭), পৃ. ৭৬৯।

২. রমেশচন্দ্র চন্দ: *গাঁ শহর বিভূঁই দিল্লি ও কাবুল,* (কলকাতা, একুশ শতক ২০১০), পৃ. ২২৪।

৩. মহসীন মখমলবফ: *আফগানিস্তানের ট্রাজেডি,* (কলকাতা, প্রকাশক মন্থন, ২০০২) পৃ.পৃ. ৪৩-৪৪।

৪. Ramesh C. Dutt: *The Ramayana and Mahabharata*, (Great Brittan, J.M Dent & Sons Ltd. First Issue, 1910), পৃ. ১৫৩।

৫. *তদেব,* পৃ. ১৫৩।

৬. Vyasdev: *The Mahabharata*, (Hymns - 257, 326, 503, 691, 1110 and 1188).

৭. Mohan Lal: *Travel in The Punjab, Afganistan and Turkistan to Balk, Bokhara and Heart and a visit to Great Britain and Germany,* (Calcutta, K.P Bagchi & Company, Second Edition, 1977), পৃ. ৫০।

৮. Vyasdev: *প্রাগুক্ত,* Hymns - 257, 326, 503, 691, 1110 and 1188.

৯. Ramesh C. Dutt: *The Ramayana and Mahabharata*, পৃ. ১৫৩।

১০. রমেশচন্দ্র চন্দ: *গান্ধারীর দেশে,* (কলকাতা, সেরিবান, নভেম্বর ২০২১), পৃ. ৮৯।

১১. তদেব, পৃ. ৮৯।

১২. K.M Dhavalikar: *Indian- Iran contracts in pre History,* (Aligarh, The Aligarh Historian Society, Indian History Congress, 62th Conference), পৃ.পৃ. ১-১০।

১৩. রণবীর চক্রবর্তী: *ভারত ইতিহাসের আদি পর্ব,* (কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্লাকসোয়ান, প্রথম খন্ড, ২০০৭), পৃ. ৫৬।

১৪. Shereen Ratanagar: *Encounters The Westerly Trade of the Harappa Civilization*, (Delhi, Oxford University Press, 1981).

১৫. আর. এস শর্মার বক্তব্য, (ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৬২ তম অধিবেশন, প্যানেল বক্তব্য, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস, ৬২ তম অধিবেশন, ভোপাল, ২০০১)।

১৬. Upendra Nath Ghoshal: *Ancient Indian Culture in Afghanistan* (Calcutta, Greater India Society Bulletin No-5, 1928) পৃ. ৮।

১৭. মলয় কুমার দাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৭২।

১৮. Upendra Nath Ghoshal: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮।

১৯. রমেশচন্দ্র চন্দ্র: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৫৫।

২০. Shaista Wahab and Barry Youngerman: *A Brief History of Afganistan: Fact on File* (New York, An imprint of Infobase Publishing, 2010) পৃ. 88।

২১. রমেশচন্দ্র চন্দ্র : *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২৫।

২২. Dineshchandra Sircar: *Inscriptions of Asoka, Delhi, 1975, and Radhagabinda Basak*: Ashokan Inscription, Kolkata, 1925.

২৩. Upendra Nath Ghoshal: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২।

২৪. রণবীর চক্রবর্তী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৪৫।

২৫. *তদেব,* পৃ. ২৪৬।

২৬. *তদেব,* পৃ. ২৪৭।

২৭. রোমিলা থাপার: *ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১০০০ খ্রিস্টাব্দপূঃ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ,* (কলকাতা, ওরয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৬০)

২৮. H.Tsiang: *Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World*, (Translated by Samuel Beal, Vol. I), পৃ.পৃ. ২৮৬-২৯১।

২৯. A. Rashid: *Taliban Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*, (London, Yale University Press, 2002) পৃ. ৬৮।

৩০. রণবীর চক্রবর্তী: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫।

৩১. *তদেব*, পৃ. ২৮৬।

৩২. *তদেব*, পৃ. ২৭৯।

৩৩. রণবীর চক্রবর্তী: *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪), পৃ. ১৩৭।

৩৪. আব্বাস খান শেরওয়ানী: *তারিখ-ই-শেরশাহী*: মম্মহদ আলি চৌধুরী [অনুবাদ]: (ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ৫৬।

৩৫. Kalikaranjan Qanungo: *Sher Shah and his Times*, (Delhi, Orient Longmans Limited, 1965), পৃ. ১।

৩৬. আব্দুল সইদ: *বাংলায় আফগান শাসন ১৫৩৮-১৫৭৬*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১৬), পৃ.২৭।

৩৭. Abul Fazal: *Ain-E-Akbari, H.S Jarrett* [Ed.]: (Calcutta, Asiatic Society of Bengal, vol-II, 1891), পৃ. ৪১১।

৩৮. Muhammad Hayat Khan: *Afganisthan and its Inhabitants*, (Lahore, H. Priestly, 1874) পৃ.পৃ. ১৮২-১৯৭।

৩৯. Mountstuart Elphinstone: *An Account ot the kingdom of Cabul and its Dependencies in Persia, Tartary and India*, (London, Longmn Hurst Rees, Orme and Brown, Vol-II, 1815), পৃ.পৃ. ৩৪-৩৬।

৪০. Sheikh Bilal: *Pattern of Afghan Migration to India during Medieval Period*, (Aligarh, Indian History Congress, vol-7, Issue -2, February-2017), পৃ.পৃ. ১৪৩।

৪১. *তদেব*, পৃ.পৃ. ১৩৭-১৪৫।

৪২. কঙ্কর সিংহ: *ইসলামের ভারত অভিযান*, (কলকাতা, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশান, ২০১৩)।

৪৩. মুজিবর রহমান ও সাবির আলি [সম্পাদিত]: *মধ্যযুগে ভারত* (কলকাতা, বুকপোস্ট পাবলিকেশান, *প্রথম খণ্ড*, ২০১৩), পৃ.২০। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Satish Chandra: History of Medieval India, (New Delhi, Orient Blackswan, ২০০৭)।

৪৪. Niamatullah: Makhzan-i-Afghani(tr.) by Bernhard Dorn as '*The History of Afghan*', (London, Oriental Translation Committee, Part- I, 1829), পৃ. ৪০।

৪৫. Nimatullah: *Tarikh-i-khan Jehani Wa Makhzan-i-Afghani*, N.B Roy [tr.]: *History of the Afghans,* (Santiniketan, Santiniketan Press, December 1958), পৃ. ১৩।

৪৬. *তদেব,* পৃ. ১৩।

৪৭. Minhaj-us- Siraj: *Tabaqat-i-Nasari,* H.G Raverty *[tr.]: A General History of the Muhammadan Dynasties Including Hindustan*, (New Delhi, Orient Book Reprient Corporation, vol. II Reprient 1970), পৃ. ৮৫২।

৪৮. Abu'l Fazl: *Akbar Nama,* H. Beverage [tr.]: *The Akbarnama*, (Calcutta, The Asiatic Society, Vol. III, reprint 2000), পৃ. ৩৫৭। Abul Fazal: *Aini-Akbari*, Blochmann [tr.] (Calcutta, The Asiatic Society of Bengal, Vol. I, 1977), পৃ. ২৭০।

৪৯. *তদেব,* পৃ.পৃ. ২৭২।

৫০. Sheikh Bilal: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪৩।

৫১. *তদেব,* পৃ. ১৪৪।

৫২. A. S. Beveridge: *Babur-Nama*, *Memories of Babur*, (New Delhi, Oriental Books Reprint Corporation, vol. I, First Published 192), পৃ. ২২৩।

৫৩. Shaista Wahab and Barry Youngerman: *প্রাগুক্ত*।

৫৪. H. S. Jarrett (ed.): *Ain-i-Akbari*, (Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1891), পৃ.পৃ. ৩৯৯-৪০০।

৫৫. Beveridge: *প্রাগুক্ত*।

৫৬. আব্দুল সইদ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০।

৫৭. Abul Fazal: *প্রাগুক্ত* পৃ. ২০২।

৫৮. মুজিবর রহমান ও সাবির আলি (সম্পাদিত): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Satish Chandra: *প্রাগুক্ত*।

৫৯. Abul Fazal: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০২।

৬০. Henry Beveridge (ed.): *The Tuzuk-i-Jahangiri; or, Memoirs of Jahangir*, (University of Toronto Library), পৃ. ৫৫।

৬১. M. Elphinstone: *The History of India*, (London, John Murray, Vol-I, Fifth Edition, 1866).

৬২. M.Zafar Hasan (ed.): *Khulasatu-T-Tawarikh*, (Delhi, J. & Press, 1918), পৃ.৮৬।

৬৩. Henry Beveridge (ed.): *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৫।

৬৪. *তদেব*, পৃ. ৪০৭।

৬৫. Shaista Wahab and Barry Youngerman: *প্রাগুক্ত*।

৬৬. Surendranath Sen (ed.): *Indian Travels of Thevenot*, (New Delhi, National Archives of India, 1949), পৃ. ৮১।

৬৭. *তদেব, পৃ.* ৮৩।

৬৮. Elphinstone: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৯।

৬৯. Mohan Lal: *Travel in the Punjab, Afghanistan and Turkistan to Balkh Bokhara and Herat and visit to Great Britain and Germany*, (Calcutta, K.P Bagchi & Company, 1977), পৃ. ৪৪।

৭০. Irfan Habib: *An Atlas of the Mughal Emperor: Political and economic Maps*, (Delhi, Oxford University Press, 1986), পৃ.পৃ. ২-৩।

৭১. Ahmed Jan [tr.]: *Tarikh-i-Afganistan*, (Peshawar, Behari Lall, 1930), পৃ. ২৭।

৭২. আবদুস সাঈদ: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯।

৭৩. *তদেব*, পৃ. ১৯।

৭৪. *তদেব*, পৃ. ১৮৬।

৭৫. *তদেব*, পৃ. ২০।

৭৬. C.U Aitchison: *A Collection of Treaties-Engagements and Sanads Relating to India and the Neighboring Countries*, (Calcutta, Govt. Printing Press, Vol. VIII, 1909), পৃ. ৪৪।

৭৭. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া: *আফগানিস্তান অতীত ও বর্তমান*, (ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১২)।

৭৮. J. W. Kaye: *History of War in Afghanistan*, (London, W.M.H Allen & Co., Vol-II, 1874) পৃ.পৃ. ৩-৬।

৭৯. Vincent Smith: The *Oxford History of India from the Earliest Time to the end of 1911*, (London, Oxford University Press, 1919), পৃ. ৫৯১।

৮০. কেশবচন্দ্র আচার্য: *আফগানিস্তান বিবরণ,* (কলকাতা, ভারত মিহির যন্ত্র, ১২৯৮)।

৮১. D.C. Boulgar: *Central Asian Question: Essay on Afghanistan*, China and Central Asia, (London, Fisher Unwin, 1885), পৃ. ৬২।

৮২. রমেশচন্দ্র চন্দ্র: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫৭।

৮৩. তদেব, পৃ. ১৫৮।

৮৪. মোঃ ফজলুল হক: *আফগানিস্তানের ইতিহাস ১৭৪৭-১৯৭৮,* (রাজশাহী, পাপিয়া সুলতানা, মার্চ ২০১৭), পৃ. ১০০।

৮৫. *তদেব,* পৃ. ১০২।

৮৬. কেশবচন্দ্র আচার্য: *প্রাগুক্ত*।

৮৭. Arka Biswas, *Durand Line History Legality and Future*, (Vivekananda International Foundation, 2013).

৮৮. ঋষি দাস: *বাদশা খান,* (কলকাতা, অশোক প্রকাশনা, ১৯৫৯) পৃ.পৃ. ৮-৯।

৮৯. *তদেব,* পৃ. ১৩।

৯০. Mukulika Banerjee: *The Pathan Unarmed Opposition & Memory in the North West Frontier*, (United Kingdom, Oxford University Press, 2000)

৯১. Sana Haroon: *Frontier of Faith Islam in Indo-Afghan Borderland*, (United Kingdom, C. Hurst & co, 2007)

৯২. Olaf Caroe: *The Pathans with an epilogue on Russia*, (New York, St Martin's press, 1958), পৃ. ২৪৯.

৯৩. M.k Gandhi: *Non-Violence in Peace and War*, (Ahmedabad, Navajivan Publishing House, Vol.1), পৃ. ২৯৮।

৯৪. চিন্মোহন সেহানবীশ: *আফগানিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম,* (কলকাতা, আন্তর্জাতিক, পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি সংসদের মুখপত্র, ২২ শ বর্ষ, ১ম- ২য় সংখ্যা, ১৯৭১), পৃ. ১৮।

৯৫. Qeyamuddin Ahmed: *The Wahhabi Movement in India*, (Calcutta Farma KL, 1966), পৃ. ৮৬।

৯৬. তদেব, পৃ. ১৮।

৯৭. AICC File: *Afghanistan*, (Nehru Museum, 1929 No- F.D. 22)

৯৮. Mohammed Kakar: *Afghanistan: The soviet Invasion and the Afghan Response, 1979-1982,* (London, University of California Press, 1997), পৃ. ১।

৯৯. India-Afghanistan Trade Agreement Extended, (Published in Asian Recorder, Vol. IV, NO.31, July, 1956).

১০০. তদেব, পৃ. ২১৫৩।

১০১. তদেব, পৃ. ৪২১২।

১০২. V.P Dutta: *India's Foreign Policy since Independence*, (New Delhi, National Book Trust, 2007), পৃ.২।

১০৩. *Aspect of National Economy*, (Published in *Asian Recorder, Vol-1, No-74,* May, 1956), পৃ. ৮৫৩।

১০৪. *Selected Speech of Indira Gandhi*: January 1966 Aug, (India Ministry of Information and Broadcasting, Publication Division, 1971), পৃ. ৩৯০।

১০৫. Rahaman Rasid: *Kabul-New Bugbear in Indo-Pakistan ties*, (Kuala Lampur, New strait Times, 1988).

১০৬. *Annual Report 1985-86,* (India, Ministry of External Affairs), পৃ. ৫।

১০৭. Asia's changing History: *India's Relation with Afghanistan and Pakistan*, (Asian and African studies, Vol-22., Nov 2013) দেখুন বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, বিশেষত ভারত আফগানিস্তানের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে দুই দেশের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য প্রদানের ভাষণের কিছু অংশ। Not only in the past but the present as well"।

১০৮. *Sleeted Speech Indira Gandhi*: January 1966 August, (India Ministry of Information and Broadcasting, Publication Division, 1971), পৃ. ৩৯০।

১০৯. S. Joshi: *Let India help Afghanistan,* (Guardian Newspaper, December, 2009)

১১০. N. Dholabhai: *India accomplished Afghan rood mission strategic highway service Pakistan scare and Kabul embassy Blast*, (The Telegraph, July, 2018).

১১১. http://www.eoi.gov.in/Kabul

১১২. David M. Malone, C. Raja Mohan and Srinath Raghavan: *The Oxford Hand book of Indian foreign Policy*, (Oxford University Press, 2015).

১১৩. Indian Express: *FTA with India as hopes of Section removal loom* (April 2015), পৃ. ২০।

১১৪. Sumit Ganguly: *Indian's Role in Afghanistan*, (New Delhi, Published in CIDOB Policy Research Project, January, 2012).

১১৫. R. Sharma: *India's Relations with Afghanistan Raghav Sharma in Hand Book of Indian International Relation,* (U.K., Routledge, 2011)

১১৬. Shashank Joshi: *India's Af-Pak strategy*, (RUSI Journals, Feb-March, 2010), পৃ. ২৯।

১১৭. http://www.thehindu.com/news/resources/text-of-modis-speech-to-afghan parliament/article8029269.ece

১১৮. আনন্দবাজার পত্রিকা: *অভিবাসীদের অধিকার, ভারত সবার নীচে,* (১০ জানুয়ারি, ২০২১)

১১৯. Shaista Wahab and Barry Youngerman: *প্রাগুক্ত*, পৃ.পৃ. ১৬১-১৮৭।

১২০. Anne Sophie Bentz: *Afghan refugee in Indo-Afghan relation*, (Delhi, Cambridge Review of International Affairs, Routledge, Vol.26 2013), পৃ. ৩৭৯।

১২১. Anne-Sophie Bentz: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৯।

১২২. See, for instance, the explanation given by Manohar Singh, founding member of the Khalsa Diwan Welfare Society for Afghan Hindus and Sikhs in New Delhi, in ‘Afghan minority seeks home in India’, News Stories, UNHCR, 13 December 2007, http://www.unhcr.org/4761579f4.html.

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলকাতার অভিবাসিত, ডায়াস্পোরা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসাবে বাঙালি জীবনে আফগান কাবুলিওয়ালা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মতো কলকাতাতেও অভিবাসিত বিদেশি জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটতে থাকে। এই সমস্ত বিদেশি জনগোষ্ঠীর কলকাতাতে আগমনের পিছনে একাধিক কারণ পরিলক্ষিত হয়। তবে কলকাতায় আগমনের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল সম্ভবত ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। স্বাভাবতই এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে জীবন ধারণের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছিল অনেক সম্ভাবনাময়। কাজেই বিদেশি জনগোষ্ঠীর আগমনের প্রধান লক্ষ ছিল কলকাতা।

কলকাতাতে যেমন অ-বাঙালিরা দীর্ঘদিন ধরে বসতি স্থাপন করেছেন, তেমনই সারা পৃথিবী থেকে আসা অগণিত মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যাঁরা অনেকেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে কলকাতাতেই বসবাস করছেন। কলকাতাতে পর্তুগিজ এবং ব্রিটিশদের আগমনের যে প্রাস্তরিক পর্ব শুরু হয়েছিল, পরে তা একাধিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আর্মেনিয়ান জনগোষ্ঠী। আর্মেনিয়ানরা ছিল কলকাতার সবচেয়ে পুরনো অভিবাসিত জনগোষ্ঠী। সতেরশো শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপীয় জাতি হিসাবে আর্মেনিয়ানদের আগমন ঘটেছিল কলকাতাতে। এরপরে একে একে কলকাতার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয় জিউস, চিনা, ফরাসি, ফার্সি, গ্রিস, রাশিয়া, জার্মান এবং সর্বোপরি আফগানরা। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীগুলি প্রত্যেকেই কলকাতার অভিবাসিত বিদেশি জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত হয়। যাদের আগমনের সঙ্গে কলকাতার ভৌগোলিক মানচিত্রের পরিবর্তন সাধন থেকে শুরু করে কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিসরের মধ্যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

২.২. কলকাতার অভিবাসনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

কলকাতা শহর গড়ে ওঠার কাহিনি একদিনের নয়। এ কাহিনি বহু বছরের পুরানো ইতিহাস। এই শহর সৃষ্টি বা গোড়াপত্তনের ইতিহাস কোনও ব্যক্তির নয়। ইংরেজ বণিক জব চার্নক নামের সঙ্গে কলকাতার প্রতিষ্ঠার যে কাহিনি জড়িয়ে আছে তার ঐতিহাসিক সত্যতা এইটুকু যে ইংরেজরা কলকাতাকে বেছে নিয়েছিলেন তাদের কুঠি বানানোর কাজে। প্রাথমিক অবস্থাতে এই অঞ্চলটি ছিল গ্রাম। ফলে জনবসতি খুব একটা বেশি ছিল না। পশ্চিমে ভাগীরথী নদী, পূর্বে বিস্তীর্ণ লবণহ্রদ। এই অঞ্চলগুলিতে বহুদিন আগে থেকেই পর্তুগিজ, ডাচ ও ফরাসি বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জাঁকিয়ে বসেছিল। সপ্তদশ শতক থেকে তাঁদের মধ্যে রেশারেশির পর্ব শুরু হয়েছিল ইউরোপ থেকে। পরবর্তীকালে সেই আবহ এসে পড়েছিল কলকাতার উপকণ্ঠে।

১৬৯০ সালের আগস্টে কোম্পানির সৃষ্টি। ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক তৃতীয় বারের মতো ভাগীরথীর তীরে সুতানুটি গ্রামে নৌকা নোঙর করে এই জায়গাটিকে কোম্পানির কুঠি বানানোর উপযুক্ত মনে করেন এবং সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা গ্রাম নিয়ে শুরু এই শহরের গোড়াপত্তন।[১] প্রথম দিকে কোম্পানির চিঠিপত্রে সুতানুটি উল্লেখ পাওয়া গেলেও, পরে তা রূপান্তরিত হয় কলকাতায়। কালের নিয়মে কালক্রমে সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নাম ম্লান হয়ে গেলেও কলকাতা বাণিজ্য শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে।[২] কাজেই কলকাতা আদ্য-প্রান্ত ঔপনিবেশকেন্দ্রিক শহরে পরিণত হতে থাকে। ইংরেজ বণিকদের হাত ধরেই এই শহরের প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সমৃদ্ধি অর্জন করে। প্রাথমিক অবস্থায় এই অঞ্চল ছিল মূলত শেঠ এবং বাসকদের গ্রাম, পরবর্তীকালে পরিণত হয় প্রসাদ নগরী হিসাবে। ইংরেজদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যত বৃদ্ধি পেতে থাকল, কলকাতা শহরের নামও ছড়িয়ে পড়ল তত। কলকাতা শেষ পর্যন্ত পরিণতি পেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী হিসাবে এবং তার স্থান পেল লন্ডনের পরেই।

১৬৯০ সালে জব চার্নক এক ঘোষণা জারি করে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষকে কোম্পানির আবিষ্কারকৃত নতুন এলাকাতে সুতানুটি ও কলকাতাতে আসার

আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৩] যদিও তার অনেক আগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের গোড়া থেকে মনে হয় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলি, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলগুলি থেকে বাঙালি শেঠ-বসাক বণিক এবং অন্যান্য বণিকেরা, পূর্ব তীরস্থ সুতানুটি অঞ্চলে ক্রমে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলেন।[৪] ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে যখন ইংরেজরা ভারতের মাটিতে প্রথম পা রাখেন, তখন এখানে আর্মেনিয়ানদের বাণিজ্য সাফল্যের তুঙ্গে। ১৬১২ সালে সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে ইংরেজরা যখন ফারমান লাভ করে, তখন এই আর্মেনিয়ানরা ছিল ইংরেজদের অতি মূল্যবান এজেন্ট ও নির্ভরশীলতা সাহায্যকারী। আর্মেনিয়ানরা বাংলাতে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেছিলেন চুঁচুড়ায়। ১৬২৫ সালে ইংরেজদের অনেক আগেই ১৬৩০ সালে সুতানুটি ও গোবিন্দপুরে এসে উপস্থিত হয়।[৫] পর্তুগিজরা বাংলাতে এসেছিলেন তারও আগে। ১৫৩০ সালে গৌড়ের রাজত্বে ভারাটে সেনা হিসাবে। চার্নকের ডাকে সাড়া দিয়ে আর্মেনিয়ান, পর্তুগিজ, ইহুদি, হিন্দু-মুসলমান অন্যান্য স্থানীয় বাসিন্দারা কলকাতাতে আসতে থাকে। ফলে এদেশি বণিকদের বাণিজ্যকেন্দ্র হাট-বাজার-বন্দর থেকে ‘সুতানুটি কলিকাতা’ ইংরেজ বণিকদের প্রধান বাণিজ্য স্থান ও রাজধানীতে পরিণত হয়।[৬]

এর থেকে বোঝা যায় যে কলিকাতা শহর গড়ে ওঠার সুপ্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। এই শহরের গোড়াপত্তনের ইতিহাসের সঙ্গে বিদেশি বণিকদের গভীর যোগাযোগের ইতিহাস রয়েছে। এরই পাশাপাশি এটাও লক্ষণীয় যে কলকাতা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠার ফলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে কলকাতাতে অভিবাসন চলতে থাকে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে কলকাতা উপনিবেশ হিসাবে গড়ে ওঠার সঙ্গে ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিতা পেলে অভিবাসনের পক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয়। এ প্রসঙ্গে কেয়া দাশগুপ্ত *‘Maping the Space of Minorities’* প্রবন্ধে বলেছেন-

> “Calcutta has had a long history of immigration of communities, diverse in ethnic, linguistic and religious attributes. The multifarious function of a colonial government, it’s growing and diveses economy and socity have offered space and opportunities to a vast range of people from different corners of the subcontinent and the world beyond. Waves of immigration have followed”[৭]

সুতরাং ঔপনিবেশিক কালপর্ব থেকে শুরু ভারতবর্ষে অভিবাসনের যে ধারা লক্ষ করা যায়, সেই ধারা কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। এর ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে এই সব বিদেশি জনগোষ্ঠীর আগমন বেশ খানিকটা পরিবর্তন নিয়ে আসে। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থাতে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহারে বৈচিত্র্য আসতে শুরু করে। ফলস্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লেখক, ব্যবসায়ী, বণিক, স্কলার, পর্যটক সহ বহুবর্ণ পেশার মানুষের আগমন ঘটেছিল কলকাতায়। এমনকী দেশীয় রাজ্যগুলি থেকেও বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাভাষীর মানুষ কলকাতাতে আসতে শুরু করেছিলেন।

ভাষা, ধর্ম এবং জাতির ভিত্তিতে কলকাতা শহরের অভিবাসনের দিকে আলোকপাত করলে উনিশ শতকের কলকাতার এক বর্ণময় চিত্র উঠে আসে। কারণ এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ভাষাভাষী ও সম্প্রদায়ের মানুষ কলকাতাতে এসেছিলেন অভিবাসিত হয়ে। তবে কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে বুঝতে হলে দুটি বিষয়কে সামনে রেখে ব্যাখ্যা করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। এক্ষেত্রে একটি হল 'ধর্ম' এবং আরেকটি হল 'ভাষা' যদিও অনেক সময়ে ধর্ম ও ভাষার মানদণ্ড একই সঙ্গে সংযুক্ত না হতে পারে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাতে কলকাতার জনসংখ্যার একটি চিত্র পাওয়া যায়। যেখানে ১৭টি ভাষা ও ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮] সেন্সর রিপোর্ট অনুযায়ী সেই সময় কলকাতাতে জনসংখ্যা ২২,৯,৭২৪ জন। ইংরেজ, পর্তুগিজ, ফরাসি, চিনা, আর্মেনিয়ান, আরব, মগ প্রভৃতি বহির্দেশীয় মানুষের পাশাপাশি বাঙালি বাদে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, দক্ষিণ ভারতীয় এই তিনটি শ্রেণির অভিবাসনকারী মানুষের খোঁজ পাওয়া যায়। ১৯০১ সালে A.k Roy যে জনগণনার রিপোর্ট কলকাতার উপরে তৈরি করেন তাতে অবশ্য H. Beverly -এর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে করা কলকাতার সেন্সর রিপোর্টকেই কলকাতার ইতিহাস লেখার প্রথম প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেন। The first connected history of the rice and growth of Calcutta was written by Mr. H.Beverly, c.s.as a part of his census Report for 1876[৯]

কলকাতার ইতিহাসকে যদি আরও একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপীয়রা যেমন কলকাতাতে বসতি স্থাপন করার জন্যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তেমনই করে এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ কলকাতাতে এসেছিলেন বসতি স্থাপনের জন্য। আলোচনার সুবিধার্থে এই সমগ্র জনগোষ্ঠীকে যদি একই ছাদের তলায় নিয়ে এসে আলোচনা করা যায় তাহলে এঁদেরকে 'কলকাতার সংখ্যালঘু বিদেশি' জনগোষ্ঠী হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই নামকরণের মধ্যে দিয়ে কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর চিত্রটা কিছুটা পরিস্ফুট হয়। কলকাতার এই সমস্ত অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মানুষরা নিজেদের অস্তিত্বকে আঁকড়ে ধরে বছর পর বছর কলকাতাতে বসবাস করে চলেছে।[১০]

২.৩. কলকাতার অভিবাসিত বৈদেশিক জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শহর কলকাতা নির্মাণে বেশ কিছুটা ভূমিকা রয়েছে বিদেশিদের। ১৯৯০ সালে ২৪ আগস্ট জব চার্নক তৃতীয়বার জাহাজ ভিড়ানোর আগেও 'কলিকাতা' নামে গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর শাসনাধীন ভারতবর্ষে, কলিকাতা গ্রাম থেকে শহরে রূপান্তর ঐতিহাসিক ঘটনা। চার্নকের ঐতিহাসিক ভূমিকাও অনস্বীকার্য, তিনি সুতানুটিতে কোম্পানির স্থায়ী ভিত্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে বাড়িঘর তৈরি থেকে শুরু করে এই অঞ্চলের ভূস্বত্ব গ্রহণে আগ্রহী হন। মুখ্যত ব্যবসায়িক কারণে কলকাতায় বিদেশিরা আসেন ও বসবাস করেন। সম্ভবত ইংরেজদের আগেই পর্তুগিজ ও আর্মেনিয়ানদের এ অঞ্চলে আগমন শুরু হয়, পরে ইংরেজ শাসনধীন ভারতবর্ষে রাজধানী হিসাবে কলকাতার গৌরব ও সমৃদ্ধি লাভ করে। কলকাতার স্বরূপ বর্ণনায় তার ঔপনিবেশিক পরিচয় গ্রহণ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ইংরেজদের ভূমিকার কথা বিশেষ ভাবে বলতে হয়। ইংরেজ লেখকরা গত দুশো বছর ধরে সে কথা অনেক বলেছেন। ভারতীয় লেখকরাও এখন সে কথাই সবিস্তারে বলেছেন। কিন্তু তিনশো বছর আগে কলকাতাতে ইংরেজদের সঙ্গে আরও অনেক বিদেশি জাতি এসেছিলেন, তারাও কলকাতার ভালো-মন্দ চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

কলকাতার পর্তুগিজ জনগোষ্ঠী

কলকাতার অভিবাসিত বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে ইউরোপ থেকে সর্বপ্রথম বাংলাতে এসেছিলেন পর্তুগিজরা। এরাই প্রথম বাণিজ্যপোত পাঠায়। বাংলার সঙ্গে পর্তুগিজদের এই সম্পর্ক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে বহুবছর ধরে।[১১] কবিয়াল অ্যান্টেনি ফিরিঙ্গিকে এ প্রসঙ্গে স্মরণ করে পর্তুগিজের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। ইউরোপ থেকে যে সমস্ত জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে গ্রিকরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন স্থলপথে, এবং জলপথে প্রবেশ করেছিলেন পর্তুগিজরা। এই পর্তুগিজদের চলতি কথাতে আমরা ফিরিঙ্গি বলেই চিনি। পর্তুগিজ বণিক মার্টিম অ্যাকোনওম ডি মেলো জুসার্তের অবতরণ (১৫২৮) থেকে শুরু করে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করার কাহিনি পাওয়া যায় একাধিক ইতিহাস গ্রন্থে।

পর্তুগিজরা যখন বাংলায় আসেন তখন সপ্তগ্রাম আর চট্টগ্রাম ছিল এ অঞ্চলের দুটি প্রধান বন্দর। ভাগীরথীর মূল প্রবাহ তখন আদিগঙ্গা অথবা হিজলির খালপথে বইত না, এই প্রবাহ তখন আদিগঙ্গা সরস্বতীর পথে বইতো। তাই সপ্তগ্রাম বন্দরের তখন ছিল রমরমা অবস্থা, এটি বর্তমানে হুগলি জেলায় অবস্থিত।[১২] সপ্তগ্রামের পরেই ছিল বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে হুগলি ও ব্যান্ডেলের স্থান। এই হুগলি এবং ব্যান্ডেল বন্দরের প্রতিষ্ঠা হয় পর্তুগিজদের সময়ে। প্রথমে পর্তুগিজরা পশ্চিমবাংলাতে সপ্তগ্রাম, হুগলি এবং ব্যান্ডেলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে হুগলি শহর যে স্থানে অবস্থিত পূর্বে যেখানে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, দিনেমার, ফরাসি এবং প্রাশিয়ার অধিবাসীরা অবস্থান করেছিলেন। কয়েক মাইলের মধ্যে সাতটি ইউরোপীয় জাতি নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন।[১৩]

বাংলাদেশে পর্তুগিজ আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস যেমন চমদপ্রদক, তেমনই তাদের পতনের কাহিনিও বিস্ময়কর। ১৬৩২ সাল নাগাদ বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চ থেকে তাঁরা বিদায় গ্রহণ করেন। তবে তাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেলেও তারা মিশে আছে আমাদের মাটির সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে। বাংলাদেশে পর্তুগিজদের ইতিহাস বিলীন হয়ে গেলেও এখনও পশ্চিমবাংলার মাটিতে পর্তুগিজ জনবসতির চিহ্ন রয়ে গেছে। শুধুমাত্র কলকাতাতে যে তাঁদের বসতি রয়েছে তা নয়, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অবিভক্ত জেলায় এখনও পর্তুগিজ জনবসতি লক্ষ করা যায়। বাংলাতে এখন যে সমস্ত পর্তুগিজরা রয়েছেন তাদের

পূর্বসুরিদের ইতিহাসের কথা আমরা জানতে পারি। তিনশো বছর আগে মহিষদলের রানি জানকী মারাঠা আক্রমণ ঠেকাতে জনা বারো পর্তুগিজ গোলন্দাজদের গোয়া থেকে বাংলায় নিয়ে আসেন।[১৪] এই সমস্ত পর্তুগিজরা যুদ্ধ বিদ্যাতে পারদর্শী হওয়ার কারণে এঁদেরকে খুশি করতে তিনি পূর্ব- মেদিনীপুরের মিরপুর গ্রামে বসবাসের জন্য জায়গা করে দিয়েছিলেন। পূর্ব-মেদিনিপুরের গ্রাম বর্তমানে শুকলালপুর এবং বেতকুণ্ডু নামে দুটি গ্রামে বিভক্ত হয়ে গেছে, বর্তমানে এই দুই গ্রামে প্রায় ৪০০ জনের মতো পর্তুগিজ বসতি রয়েছে।[১৫]

সাম্প্রতিক বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দ্যা পর্তুগিজ সেটেলার ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল' শীর্ষক গবেষণা পত্রে গবেষক সাহানা জানার গবেষণা অনুযায়ী শুকলালপুর গ্রামে ৪২টি এবং বেতকুণ্ডুতে ৪৬টি পর্তুগিজ পরিবারের বসতি রয়েছে। এদের মধ্যে ৬০টি পরিবার ক্যাথলিক এবং ২৮টি পরিবার প্রোটেস্টান্ট এবং এদের প্রায় ৫২ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৮ শতাংশ নারী।[১৬] পর্তুগিজরা যখন বাংলায় আসেন, তখন সপ্তগ্রাম আর চট্টগ্রাম ছিল এ অঞ্চলের দুটি প্রধান বন্দর। এই সমস্ত পর্তুগিজদের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু ক্রিয়াকলাপ বিবাহ থেকে শুরু বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে বাঙালি আনার ছাপ রয়েছে, তবে ধর্মীর আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যীশু খ্রিস্টের ছাড়া এখনও লক্ষ করা যায়।[১৭] গবেষক সাহানা তাঁর গবেষণাতে দেখিয়েছেন যে, এই সমস্ত পর্তুগিজরা বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন, তবে তাদের দুঃখ রয়েছে পর্তুগিজ ভাষা না জানার জন্য।[১৮]

কলকাতার আর্মেনিয়ান জনগোষ্ঠী

কলকাতার সংখ্যালঘু বিদেশি জনগোষ্ঠী হিসাবে আর্মেনিয়ানরা ছিল অন্যতম। আর্মেনিয়ানরা নিজেদের বাসস্থান এবং জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ঠিক পর্তুগিজদের আগমনের পরেই। প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে। ভারতবর্ষের মশলা, মসলিন ও মনিমুক্তার খুব কদর ছিল ইউরোপের বাজারে।[১৯] এই সময়ে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত না হওয়াই কষ্ঠসহিষ্ণু আর্মানি বণিকরা স্থলপথে পারস্য, আফগানিস্তান ও তিব্বতের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সঙ্গে যোগাযোগ নির্মাণ করে ইউরোপে অক্ষয় রেখেছিল ভারতীয় পণ্যের বাজার। এইভাবে ধীরে ধীরে আর্মেনিয়ানরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন

প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের আগে আর্মানিরা বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁরা নিজেদের বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থাপন করতে উদ্যত হন। তবে নিশ্চিতভাবে জানা যায় না যে, ১৬৯০ এর পূর্বে তারা কলকাতাতে এসেছিলেন কিনা। তবে সাবর্ণ রায়চৌধুরীর কাছ থেকে ডীহি কলকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুরের জমিদারির স্বত্ব লাভ করার পরে তাঁরা ইংরেজদের উপনিবেশে আর্মানি বণিকরা চুঁচুড়া, চন্দন নগর, ও অন্যান্য কেন্দ্র থেকে কলকাতাতে আসতে শুরু করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে আর্মানিরা কলকাতাতে বাসস্থান নির্মাণ করতে নিরন্তন চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন।[২০] আমরা কবিগুরুর লেখা শিশুপাঠ্য সহজ পাঠের দ্বিতীয় ভাগে দেখতে পাই, যেখানে বর্ণিত আছে "আর্মানি গির্জার কাছে আপিস। যাওয়া মুশকিল হবে" অর্থাৎ এখানে উল্লেখিত যে আর্মানি গির্জার উপস্থিতি। যা দেখে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, কলকাতাতে আর্মানিদের অস্তিত্বের কথা।[২১]

ব্যবসায়িক গোষ্ঠী হিসাবে আর্মেনিয়ানদের কলকাতাতে আগমন ঘটেছিল সপ্তদশ ও আষ্টাদশ শতকে। এরা মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যার স্মৃতি এখনও কলকাতা বয়ে বেড়াচ্ছে। আর্মেনিয়ানরা কলকাতাতে আসার পরে বেশ কিছু জায়গার নাম দিয়েছিলেন, যা দেখে বোঝা যায় যে কলকাতার সঙ্গে আর্মানিদের যোগাযোগ ছিল বহু দিনের। যেমন আর্মানিটোলা, আর্মানিপাড়া (বর্তমানে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট) আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, আর্মেনিয়ান ঘাট (গঙ্গা তীরবর্তী)।[২২] ইত্যাদি নিদর্শন আজও দেখা মেলে। জেমস লং সাহেবের হিসাব অনুযায়ী ১৮৫০ সালে কলকাতার আর্মানি পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪৯৯ জন এবং নারীর সংখ্যা ছিল ৩৯৩ জন। অর্থাৎ ৮৯২ জন আর্মানি এখানে বসবাস করতেন।[২৩]

কলকাতা শহরে আর্মেনিয়ানদের তৈরি স্থাপত্যের মধ্যে। আঠারো শতকের শেষদিকে বর্তমানে মির্জা গালিব স্ট্রিটের বুকে আর্মেনিয়ানদের কলেজটা এখনও চোখে পড়ে। এছাড়া ১৮২১ সালে আর্মেনিয়ান ফিলানথ্রোপিক অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা হয় কলকাতাতে। ছাত্রছাত্রী বলতে ৭৮ জন আর্মেনিয়ান। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আর্মেনিয়ান স্মৃতিকথা। বৈবাহিক রীতির ক্ষেত্রে ওরা আজও রক্ষণশীল। মূলত গুজরাটি এবং সিন্ধি পরিবারের মধ্যেই নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখেন

বিয়ের ক্ষেত্রে।[২৪] তবে কলকাতার যে সমস্ত আর্মেনিয়ান নিদর্শন রয়েছে তাঁর মধ্যে গ্রান্ড হোটেল, নিজাম প্যালেস স্টিফেন কোর্ট, হোটেল কেনিওয়ার্থ, কুইন্স ম্যানসন বাড়ি তৈরি করেছিলেন আর্মেনিয়ানরা। বর্তমানে আর্মেনিয়ানদের বেশ কয়েকটি পরিবার রয়েছে পার্ক সার্কাসের কাছে অবস্থিত 'স্যার ক্যাথি পল চ্যাটার হো ফর দ্যা এল্ডারলি' নামে এক বৃদ্ধাশ্রমে। এখানে পুরনো দিনের নিয়ম অনুযায়ী এখনও খ্রিস্টমাস পালন করা হয়।[২৫]

কলকাতার জিউস সম্প্রদায়

ইংরেজদের আগমনের প্রায় একশো বছর পরে কলকাতাতে আগমন ঘটেছিল জিউসদের। জিউসদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করা, এরাও আর্মেনিয়ানদের মতো অভিবাসিত হয়ে এসেছিলেন। জিউস সম্প্রদায় সারা পৃথিবীতে অভিবাসিত হয়ে ছড়িয়ে আছে, ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠী রূপে এঁরা কলকাতায় বসবাস করছেন দীর্ঘদিন ধরে। কলকাতায় আগমনের শুরুর দিকে এঁদের যোগাযোগ ছিল মূলত কলকাতা শহরের বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে। এই সময়ে কলকাতার সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।[২৬] সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া জিউসদের মধ্যে কলকাতার দিকে যাঁরা এসেছিলেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন বাগদাদের জিউস সম্প্রদায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে কলকাতাতে পাকাপাকিভাবে আসতে শুরু করেছিলেন কলকাতার জিউসরা। শ্যালম অ্যারেন কো-হেন ছিলেন কলকাতাতে আগন্তুক জিউসদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি। তিনি সিরিয়ার আলেপ্পা প্রদেশ থেকে বোম্বাই, সুরাট, কোচিন ও মাদ্রাজ হয়ে কলকাতাতে পৌঁছেছিলেন ১৭৯৮ সালে। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘকাল ধরে কলকাতাতে জিউস অভিবাসন ঘটেছে কলকাতাতে। জিউসরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মণি মুক্তার ব্যবসাতে নিজেদের লিপ্ত করেছিলেন পরে ধীরে ধীরে সিল্ক, মসলিন, এবং নীল রপ্তানির বাণিজ্যেও তারা সাফল্য লাভ করেছিলেন।[২৭] এই রপ্তানি বাণিজ্য মূলত বাগদাদের সঙ্গেই স্থাপন করতেন। এর পরে একে একে কলকাতার সমস্ত জিউসরা নিজেদেরকে একত্রিত হয়ে স্ব-গঠিত সংঘ স্থাপন করেছিলেন, যার মাধ্যমে তাঁরা নিজেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করতেন। এই সমস্ত জিউসরা সংঘের মাধ্যমে নানা ধরনের পুস্তক রচনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্য সিনেগন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করে গিয়েছেন। সৌমিত্র দাস The Telegraph, on

December 2006 এ লিখেছেন উনিশের দশকে এই সমস্ত জিউস জনগোষ্ঠীর মানুষ ইউরোপীয় আদব-কায়দা থেকে বেরিয়ে আসেননি। বর্তমানে আর্মেনিয়ান স্ট্রিট এবং বউবাজার এলাকাতে দেখা মেলে তবে ধীরে ধীরে এরা পার্ক স্ট্রিটের দিকে বসতি স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।[২৮]

কলকাতাতে যে সমস্ত জিউস সম্প্রদায়ের বসতি ছিল তারা ছিল রাষ্ট্রবিহীন এক ছিন্নমূল জাতির মতো। ফলে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহে এবং ধর্ম পালন ছিল তাদের নিকট এক কঠিন সংগ্রাম। ১৭৯৯ সালে কলকাতাতে জিউসদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ জন। ১৮২৮ সালে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০০ এর মতো তবে ১৮৬০-এর দশকে মহানগরীতে তাদের সংখ্যা ছিল ৬০০-এর মতো ধর্মাচারণ ও প্রার্থনার জন্য কলকাতাতে তারা সিনেগন গড়ে তোলেন ১৮২৩ সালে।[২৯] জিউসদের মধ্যে বেঞ্জামিন আব্রাহাম সলোমান এই সিনেগন গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন। বর্তমানে কলকাতাতে জনা চল্লিশের মতো জিউস সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে বেশিরভাগ জিউস পরিবার বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ১৯০১ থেকে ১৯৬১ জনগণনা অনুযায়ী এদের একটা বড় অংশ ধীরে ধীরে কলুটোলা, বড় বাজার, বউ বাজার এবং অনেকেই ফিনিক বাজারের মতো মধ্য কলকাতার শহরগুলিতে নিজেদের বাসস্থান সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।[৩০]

কলকাতার চিনা সম্প্রদায়

চিনারা সর্বপ্রথম কলকাতাতে বাসস্থান নির্বাচন করেছিলেন কলকাতার আধুনা বজবজ অঞ্চল থেকে ছয় মাইল দূরে আছিপুর নামক স্থানে।[৩১] এটি ছিল ভারতের সর্বপ্রথম চিনা উপনিবেশ। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর রাজত্বকালে Yong-Ta-Chao নামে এক চিনা অভিবাসী প্রথম কলকাতাতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনিই প্রথম হুগলির কাছাকাছি ক’টি স্থানে চিনা উপনিবেশ বা চাইনিজ ডায়াস্পোরা পত্তন ঘটিয়েছিলেন। তবে এই সমস্ত চিনারা ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে কলকাতাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কলকাতার ৪৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত টেরিটিবাজার অঞ্চলে তাঁরা বসবাস শুরু করেন। এছাড়া ৫৩ নং ওয়ার্ডের এলিয়ট রোড এবং ৫৮, ৫৯, ও ৬৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ট্যাংরা, তপসিয়া ও ধাবা অঞ্চলে এদের বিস্তারিত বসবাস ছিল। এই সমস্ত বসতি এলাকা

'চিনা পাড়া' ও 'চায়না টাউন', নামে পরিচিত।[৩২] সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র কলকাতাতেই চায়না পাড়াগুলির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। কলকাতার চায়না পাড়াকে দেখলে মনে হবে এটি চিনের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখানে চিনা স্কুল, চিনা ভষায় লেখা ফেস্টুন, চিনা খাবারের সমাহার লক্ষ করা যায়।[৩৩]

চিনাদের কথা বলতে গেলেই সর্বপ্রথম বলতে হয় কলকাতার চিনা জনসংখ্যার কথা। ১৭৮৮ সালের একটা সমীক্ষা থেকে জানা যায় শহর কলকাতার বুকে সেই সময়ে চিনাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। ১৮১১ সালে কলকাতাতে চিনা নাগরিকদের সংখ্যা ছিল ৪১৪ জনের মতো। ১৮৩৭ সালে এই সংখ্যা ৩৬২-তে নেমে আসে। এইভাবে একটা সময় পর্যন্ত কলকাতা শহরে চিনা নাগরিকদের সংখ্যা ওঠানামা করতে থাকে। তবে ১৯৪৯ সালে চিনে গৃহযুদ্ধ দেখা দিলে বহু চিনা কলকাতার দিকে ফিরে আসে। ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে ৫৭১০ জন এবং ১৯৬১ সালে জনগণনা অনুযায়ী চিনা জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৮৮১৪ জনের মতো এবং ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই শহরে চিনারা ছিলেন দ্বাদশ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম।[৩৪] অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রগুলিতেও তাঁরা ছিলেন সাবলীল। এঁরা বিভিন্ন রকমের ছোটো ছোটো শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। এর মধ্যে ট্যানারি শিল্প ছিল অন্যতম। এছাড়া কাঠের কাজ, দাঁতের ডাক্তারির মতো চিকিৎসাতে তাঁদের অবাধ আনাগোনা ছিল। পরবর্তী সময়ে লন্ড্রি, জুতো তৈরির মতো কাজের সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। ধর্মাচারণের জন্য নিজেরাই মন্দির স্থাপন করেছিলেন, শিক্ষার জন্যে স্কুল স্থাপন করেছিলেন।

তবে কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতার বুকে চিনারা নিজেদের অবস্থাকে অনেকটা উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের পরেও তাঁরা এই মহানগরীর সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাঁরা নিজেদের পরিচয় নির্মাণ করেছে। নিজেদের সংস্কৃতির শিকড়কে অপর দেশের আঙিনায় এসেও পালন করে যাচ্ছেন বহাল তবিয়তে। এখনও কলকাতার কিছু কিছু অঞ্চলে তাদের তৈরি দোকানপাট, পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির দেখা মেলে।[৩৫] তবে বর্তমানে তাদের সংখ্যা অবশ্যম্ভাবীভাবে কমতে শুরু করেছে, বর্তমানে চিনা পাড়াগুলিতে তাদের আনাগোনা আর আগের মতো নেই।

কলকাতার পার্সি সম্প্রদায়

ভারতবর্ষের সঙ্গে পার্সি যোগাযোগ আজকের নয়, ভারতের সঙ্গে পার্সি সংস্কৃতির মেলবন্ধন কয়েকশো বছরের থেকেও পুরনো। পার্সিরা ছিলেন ইরানের 'জরাথুস্ট্র' সম্প্রদায়ের লোক। পারস্যের 'ফারর্স' প্রদেশ থেকে এরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন।[৩৬] তাই এঁদেরকে পার্শি বা ফার্শি সম্প্রদায়ের মানুষ হিসাবে গণ্য করা হইয়। এই সমস্ত ফার্সি সম্প্রদায়ের মানুষ কলকাতাতে এসেছিলেন ব্রিটিশ শাসনের কিছুকাল পূর্বে। কলকাতাতে তাঁদের আধিপত্য স্থাপনের একেবারে শুরুর দিকে আর্মানি বণিকদের সাহায্যকারী দল হিসাবেই তাঁদের আগমন ঘটে।[৩৭]

১৭৬৭ সালে ফার্সিরা কলকাতাতে তাঁদের বসতি স্থাপন শুরু করেছিলেন। এই সমস্ত ফার্সিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন দাদাভাই বেহরানজি বানাজির। তিনি সুরাট থেকে এসেছিলেন। ইনি সর্বপ্রথম কলকাতাতে ইংরেজদের সহযোগিতা শুরু করেছিলেন। ব্রিটিশরা ফার্সিদের সহযোগীতার কারণেই এদেশে বাণিজ্যিক ঘাঁটি সুপ্রশস্ত ও মজবুত করেছিলেন। একইসঙ্গে তাঁরা নিজেরাও ১৮০৯ সালে কলকাতাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনার পথ প্রস্তুত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কলকাতাতে ফার্সিরা জলপথ ব্যবহার করেছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে।[৩৮] এই সময়ে চিনের সঙ্গে কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং একই সঙ্গে খিদিরপুর ডকের বিস্তৃতিসাধন হয়েছিল।

দীর্ঘকাল কলকাতায় বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজনে ঘরবাড়ি, ধর্মীয় উপাসনার জন্যে নানা রকমের উপাসনাস্থল নির্মাণ করেছিলেন। এই সমস্ত উপাসনা স্থলগুলি ছিল ফার্সিদের ধর্মীয় চর্চার প্রাণকেন্দ্র। কলকাতা মহানগরীতে ফার্সিরা নির্মাণ করেছিল পার্শী চার্চ, এজরা স্ট্রিটের উপরে 'আগুনমন্দির' ইত্যাদি। এছাড়া তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নির্মাণ করেছিলেন কাপড়ের কল, যতায়াত ব্যবস্থার জন্য জলপথের উন্নতি সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ, পাটের ব্যবসা, মদ তৈরির কারখানা ইত্যাদি। কলকাতার পার্সীরা এই সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেরদের উন্নতিসাধন করেছিলেন। আজও কলকাতাতে ফার্সি সম্প্রদায়ের বসবাস আছে সারা কলকাতা জুড়ে। ১৯৮৫ সালে কলকাতাতে তাদের সংখ্যা ছিল ১২২০ জনের মতো এবং ৪৪৮ টি পরিবার। বর্তমানে

এই মহানগরীতে রয়েছে ৭৫০ জনের মতো। এঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা ভাষা জানেন।[৩৯] কলকাতাতে তাঁদের শতকরা ৪০% ভাগই এখন চাকুরিজীবী, আর বাকি ৬০% যারা ছোটো খাটো স্ব-নির্ভর ব্যবসার সঙ্গে নিযুক্ত আছেন। আজও কলকাতার মহানগরীতে ফার্সিদের আভিজাত্যের ইতিহাস রয়ে গেছে।

কলকাতার আঙ্গলো-ইন্ডিয়ান

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে কলকাতা ছিল অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। ফলে সারা পৃথিবীর থেকে অগণিত ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর মানুষ কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়েছেন বিভিন্ন কারণে। এদের মধ্যে অনেকেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম এখানেই রয়ে গেছেন ফলে অনেকেই জন্মগতভাবে এই শহরের নাগরিক। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হল এমনই একটি জনগোষ্ঠীর মানুষ যাঁরা ব্রিটিশ আমল থেকেই কলকাতাতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। মূলত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তাদেরকেই বোঝায় যাঁদের বাবা বিদেশি (মূলত ব্রিটিশ) কিন্তু মায়েরা এদেশীয়। ঔপনিবেশিক আমলে যে সমস্ত ব্রিটিশ ভারতবর্ষে এসে বৈবাহিক সূত্র স্থাপিত করেছিলেন, তাঁদের ঔরসজাত সন্তানদের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৮৩৭ সালে কলকাতা পুলিশের তদানীন্তন সুপারিন্টেনডেন্ট ক্যাপ্টেন এফ.ডব্লু বার্চ, এ শহরের জনগণনা করেছিলেন তাতে দেখা যায় 'ইউরেশিয়ান' অথবা যাঁদের অপর নাম 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। কলকাতায় তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪৭৪৬ জনের মতো।[৪০]

এরপরে ১৯১১ থেকে ১৯৫১ সালের জনগণনাতে তাদের জনবসতির হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে ১৯৬১ সালের জনগণনাতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের আর কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। শুরুর দিকে এই সমস্ত অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা একত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবেই বসবাস করতেন একবালপুর, তালতলা, পার্কস্ট্রিট, পদ্মপুকুর, বউবাজার ইত্যাদি অঞ্চলে। পরে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার জন্যে বেহালা, টালিগঞ্জ, তিলজলা প্রভৃতি স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছেন। তবে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতাতে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সমস্ত অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন

হেনরি লুই ডিরোজিও। তিনি কলকাতাতে ১৯৮০ সালে স্থাপন করেছিলেন Anglo Indian Association।[৪১]

তবে বর্তমানে কলকাতাতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। তারা কোনও দিন সেইভাবে কলকাতাতকে আপন করে মেনে নিতে পারেননি অল্প কয়েকজন ছাড়া। কাজেই কলকাতার সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের যোগাযোগ খুবই সীমিত। তবে কলকাতার ইতিহাসের সঙ্গে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের নিবিড় যোগাযোগ এবং অস্তিত্বের কথা ইতিহাস বিদিত।

কলকাতার গ্রিস সম্প্রদায়

কলকাতার অভিবাসিত বিদেশি জনগোষ্ঠীর মধ্যে গ্রিকদের অবস্থান ছিল অন্যতম। গ্রিকরা সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে কলকাতাতে রয়েছে। “The Greek socity in Calcutta it may be noted is called ‘The Orthodox Brotherhood of Greek in Calcutta’ and comprises many wealthy and infuctional member of the mercantile community.[৪২] গ্রিকরা কলকাতাতে আসতে শুরু করেছিলেন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই। ফিলিপ পোলিসের অধিবাসী Alexious Argyree ১৭৭০ সালে কলকাতাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এই অরিগিরিকে হাজি বলা হত, কারণ তিনি জেরুজালেম দর্শন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত গল্প রয়েছে, যেখানে বলা হয় অরগিরি যখন জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এগোচ্ছিলেন ঠিক তখন সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন। এমত অবস্থায় তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, এই বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতি থেকে তিনি যদি রক্ষা পান তাহলে এখানে একটি গির্জা নির্মাণ করবেন।[৪৩]

কলকাতাতে সর্বপ্রথম গ্রিকদের অস্তিত্বের প্রমাণ বলতে গ্রিক চার্চের কথা এসে পড়ে। ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বকালে প্রথম গ্রিক চার্চের প্রতিষ্ঠা হয় যদিও এই চার্চ নির্মাণের পরিকল্পলনা ছিল অরিগিরির নিজের। বর্তমানে আমড়াতলা স্ট্রিটের কাছে যে চার্চ দেখতে পায় তার শিলান্যাস হয়েছিল ১৭৮০ সালে। ১৭৮১ সাল থেকে এই চার্চ প্রার্থনার জন্যে খুলে দেওয়া হয়। এখানেই এই সমস্ত গ্রিকরা প্রার্থনা করতে আসতেন।

পরবর্তীকালে ১৯২৪ সালে এই চার্চ উঠে আসে কালিঘাট কালী মন্দিরের কাছে, বর্তমানে যে গ্রিক চার্চটি আমরা দেখতে পাই। এছাড়া কলকাতার গ্রিকদের প্রাণপুরুষ আলেকজান্ডার অরিগিরির সমাধিস্থল রয়েছে কলকাতার ফুলবাগান অঞ্চলে।[৪৪]

বর্তমানে কলকাতা শহরে গ্রিক নাগরিকদের আর দেখা যায় না। তাঁরা অনেক বছর আগে কলকাতার পাট চুকিয়ে চলে গেছে তাঁদের দেশে। তবে যখন এরা কলকাতাতে ছিলেন, তখন তাঁদের মূল বাসস্থান ছিল কলকাতার পুরনো চিনা বাজার, এজরা স্ট্রিট, আমড়াতলা স্ট্রিট ইত্যাদি স্থানে। [৪৫]

কলকাতার জার্মানি ও রাশিয়ান জনগোষ্ঠী

কলকাতার বৈদেশিক অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জার্মানি এবং রাশিয়ান জনগোষ্ঠীর বিষয়ে খুব স্বল্প পরিসরে আমরা জানতে পারি। কলকাতাতে জার্মান উপস্থিতির পিছনে অন্যতম মূল কারণ ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত হওয়ার সূত্র ধরে তাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন পরে জার্মান এবং ব্রিটিশদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে জার্মানরা কলকাতাতে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেন। জার্মানরা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো ব্যবসা- বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতাতে আসেননি। তাঁরা মূলত ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ভাড়াটে সৈন্যের কাজ নিয়ে এখানে এসেছিলেন।[৪৬] কলকাতার জার্মানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চিত্রকর Johan Zoffany, যিনি ছিলেন জার্মান বংশোদ্ভূত। এছাড়া ১৯৭০-এর দশকে কলকাতার টেলিগ্রাফের এক্সপার্ট হিসাবে এসেছিলেন william Siemens একইসঙ্গে কলকাতা Zoo Gardens স্থাপন করেছিলেন Car Louse Schwendler নামক একজন জার্মান ব্যক্তি। এছাড়া জার্মানি হোমিওপ্যাথি ওষুদের জনক হ্যানিম্যান কলকাতাতে এসেছিলেন হোমিওপ্যাথি ওষুদের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে। এইভাবে জার্মানরা বিভিন্ন সময়ে একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা কলকাতাতে এসেছিলেন।

তবে রাশিয়ানদের উপস্থিতি নিয়ে কিছু জানা না গেলেও Gerasiam Lebedeff তিনি নিজে একজন গুরুত্বপূর্ণ রাশিয়ান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে কলকাতায় তৈরি

হয়েছিল ‘Bengali Theatre’ যেটি মধ্য-কলকাতায় অবস্থিত।[৪৭] কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একজন একক রাশিয়ান হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। Gersain Lebedeff এর উদ্যোগেই পরবর্তীকালে ইন্দো-রাশিয়ান সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সেতুবন্ধ তৈরি হয়েছিল।

কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালা জনগোষ্ঠী

কলকাতায় গোটা পৃথিবী থেকে আগত বিদেশি জনগোষ্ঠীর এক বিরাট বৈচিত্র্যের মধ্যে আফগান কাবুলিওয়ালারা ছিল অন্যতম। অনেকের ধারণা ‘কাবুলিওয়ালা’ মানেই কাবুলের বাসিন্দা, কিন্তু আদতে তা নয়। এরা আফগানিস্তানের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের ‘পাকতিয়া’ ও ‘পাকতিকা’ নামক দুটি প্রদেশের মানুষ।[৪৮] সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘দেশে বিদেশে’ গ্রন্থে কাবুলিওয়ালাদের বাসস্থান সম্বন্ধে খানিকটা রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি বলেছেন “কাবুলিরা কাবুলের লোক নয়, তারা সীমান্ত, খাইবার বড়োজোর চমন কান্দাহারের বাসিন্দা। খাস কাবুলি পারতপক্ষে কাবুল শহরের সীমানার বাইরে যায় না। যে দু-দশ জন যায় তারা সদাগর। তাদেরও পাল্লা ওই পেশওয়ার অবধি”।[৪৯] বর্তমানে কলকাতাতে যে সমস্ত কাবুলিওয়ালাদের বসবাস রয়েছে তাঁদের অনেকেই যাঁরা কখনই কাবুলে যাননি, এঁদের বেশ কয়েক প্রজন্ম কলকাতাতে রয়ে গেছে। সুদীর্ঘ পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষে থাকার দরুণ, পরবর্তী প্রজন্মের একটা বৃহৎ অংশ এখানেই রয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালাদের ভারতবর্ষে অভিগমনের যে পর্ব শুরু হয়েছিল, উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে সেই একই ধারা অব্যাহত ছিল বরং ঔপনিবেশিক পর্বে আফগান জনজাতির একটা বিরাট অংশ কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের একাধিক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। যাঁরা বর্তমানে ‘কাবুলিওয়ালা’ হিসাবেই পরিচিত। বর্তমানে সারা কলকাতাতে প্রায় ছয় হাজারের বেশি কাবুলিওয়ালা বসবাস রয়েছে। তবে আশির দশক থেকে এই সমস্ত কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছিল। এই সময় থেকেই কলকাতাতে কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করে। কারণ কাবুলিওয়ালারা অনেকেই দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন। তবে যাঁরা এখানে থেকে

গিয়েছিলেন, তাঁরা কলকাতার নিউ মার্কেট, বড়বাজার, ধর্মতলা, কাশীপুর, ডায়মণ্ড হারবার, বারুইপুরের মতো পশ্চিমবঙ্গের একাধিক স্থানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। দেখতে রুক্ষ চেহারা, তীক্ষ্ণ চোখে, কুর্তা-পাজামা পরিহিত, মাথায় পাগড়ি ঠিক যেমনটি আমরা রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পের 'রহমত' নামের কাবুলিওয়ালার মধ্যে দেখতে পেয়েছি।[৫০]

মনে করা হয় আফগান কাবুলিওয়লারা ১৮৯২ সালের পর বা তারও আগে থেকেই তাঁরা কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। এদের কলকাতাতে আগমনের মূল কারণ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা নির্বাহের তাগিদ। এই সমস্ত কাবুলিদের কথা আমরা সর্বপ্রথম জানতে পারি কবিগুরুর লেখা কাবুলিওয়ালা নামক ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে।[৫১] তবে পরবর্তীকালে একাধিক লেখাপত্র থেকে 'কাবুলিওয়ালাদের' সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। কাবুলিওয়ালাদের কলকাতাতে জীবন-যাপন ও জীবনশৈলীর উপরে আলোকপাত করলেই বোঝা যায়, এরাও দীর্ঘদিন ধরে কলকাতাতে সংখ্যালঘু বিদেশি জনগোষ্ঠী হিসাবে রয়ে গেছেন। কাজেই বর্তমানে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে এই সমস্ত কাবুলিওয়াদের অবাধ বিচরণ রয়েছে।

আফগানিস্তান দেশটিতে বিভিন্ন জাতিগত বা সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস আছে, আমরা অবশ্য তাঁদের সকলকে 'পাঠান' বা 'কাবুলিওয়ালা' ধরে নিই। আসলে 'কাবুলিওয়ালারা' সেই অর্থে 'পাঠান' হয় না। পাঠান বা পাসতুনরা হিন্দুকুশের একেবারে দক্ষিণে থাকে, এরা আফগানিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষ। এরা পাসতু ভাষায় কথা বলে। আবার উত্তর আফগানিস্তান এবং কাবুলের লোকেরা অনেকেই 'তাজিক' (আফগানিস্তানের ধর্মীয় গোষ্ঠী) সম্প্রদায়ের মানুষ। এরা সকলেই ইরান থেকে উদ্ভূত, হয়তো বা আর্যদেরও পরে এসেছিলেন। এঁদের উচ্চতা পাঠানদের মতো অত বেশি নয়, তবে চেহারা বেশ সুন্দর। এঁদের ভাষা হল 'দরি' আফগানিস্তানে যা 'ফার্সি' ভাষা নামে পরিচিত। আফগান শাসক আহমদ শাহ মাসুদ ছিলেন এদের মধ্যে একজন। মধ্য আফগানিস্তানে এরা বসবাস করে। এছাড়া আরও এক গোষ্ঠী হল 'হাজারা' গোষ্ঠী, যাঁরা

চেঙ্গিস খানের সঙ্গে এসেছিল, বামিয়ান অঞ্চলটাই ছিল এদের আসল গড়। এরা আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে হতদরিদ্র। স্বাভাবিক ভাবেই আফগানিস্তানে এঁরা একটু কোনঠাসা অবস্থাতেই রয়েছেন। এছাড়াও মুরিগতানি, তুর্কেতানি, কিরখিজ, বালুচি, এবং কোচি এবং বহু উপজাতির মানুষের বসবাস রয়েছে আফগানিস্তানে। এই সমস্ত জনগোষ্ঠী ছাড়াও আফগানিস্তানে একাধিক উপজাতির সংমিশ্রণেই আফগান জাতির গঠন হয়েছে। কাজেই আফগান মানেই যে 'পাঠান' বা 'কাবুলিওয়ালা' তা নয়। সুতরাং কলকাতায় যে সমস্ত কাবুলিওয়ালার বসবাস রয়েছে তাঁরা অনেকেই আফগানিস্তানের বিভিন্ন উপজাতি এবং সম্প্রদায়ের মানুষ।

শুরুর দিকে কাবুলিওয়ালারা আফগানিস্তানের নির্ধাতিত কয়েকটি প্রদেশ থেকে ভারতে এলেও পরবর্তীকালে বিশেষত উত্তর ঔপনিবেশিক সময়কালের পর থেকে আফগানিস্তানের একাধিক প্রদেশ থেকে কলকাতাতে আসতে থাকেন। এই সমস্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে জালালাবাদ, কান্দাহার, মাজারে শরীফ, গজনী, পাকতিয়া প্রদেশ ছিল উল্লেখযোগ্য। আগমনের পরে জীবিকা নির্বাহের জন্য বেশ কতকগুলি পেশা বেছে নিয়েছিলেন যেমন কাজু, কিসমিস, আখরোট, হিং, সুরমা ইত্যাদি। এই দ্রব্যগুলি তাঁরা বিক্রি করতেন শহর তথা মফস্সলের পথে ঘাটে। তবে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের আসল ব্যবসা ছিল মহাজনী কারবার। সুদের ব্যবসাতে তাঁরা টাকা খাটাতেন, মানুষের ঋণ দিতেন, বিনিময়ে যে লভ্যাংশ পেতেন, সেই লাভ্যাংশ থেকে নিজেদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ থেকে স্বদেশে পরিবারের জন্য নিয়মিত অর্থ পাঠাতেন। কারণ আফগানরা তাঁদের পরিবারের স্ত্রী পরিজনদের ভারতবর্ষে নিয়ে আসতেন না, কারণ এটাই ছিল আফগান সরকারের নিয়ম।[৫২]

এছাড়া ইরানীয় মুসলিম ও আরবীয় মুসলিমদের কলকাতাতে দেখা গিয়েছিলে। **১৯৬১** সালের জনগণণা অনুসারে মাত্র ৪২ জনের মতো ইরানীয় ও আরবের মুসলমান জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বর্তমানে কলকাতার বুকে এঁদের অস্তিত্ব খুবই কম। চিনা বা তিব্বতি মুসলমান যাঁরা রয়েছেন তাদের সংখ্যাও খুব নগণ্য।

সারণি: ২.১. ১৮৩৭ সালে কলকাতার বিভিন্ন অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	জনগোষ্ঠী	সর্বমোট জনসংখ্যা	শতাংশ অনুসারে জনসংখ্যা	ক্রমিক সংখ্যা	জনগোষ্ঠী	সর্বমোট জনসংখ্যা	শতাংশ অনুসারে জনসংখ্যা
১.	ইংরেজ	৩,১৩৮	১.৬১	১০.	পশ্চিমী হিন্দু	১৭,৩৩৩	৮.৮৭
২.	ইস্ট-ইন্ডিয়ান (ইউরেশিয়ান)	৪,৭৪৬	২.৪৩	১১.	বাঙালি হিন্দু	১,২৩,৩১৮	৬৩.১৪
৩.	পর্তুগিজ	৩,১৮১	১.৬৩	১২.	মুঘল	৫২৭	০.২৭
৪.	ফরাসি	১৬০	০.০৮	১৩.	পার্সি	৪০	০.০২
৫.	চিনা	৩৬২	০.১৯	১৪.	আরব	৩৫১	০.১৮
৬.	আর্মেনিয়ান	৬৩৬	০.৩৩	১৫.	মুঘল (বার্মি)	৬৮৩	০.৩৫
৭.	জিউস (Muhammadans)	৩৬০	০.১৮	১৬.	মাদ্রাজি (দক্ষিণ ভারতীয়)	৫৫	০.০৩
৮.	পশ্চিমী দেশ	১৬,৬৭৭	৮.৫৪	১৭.	ভারতীয় খ্রিস্টান	১০৪	০.০৫
৯.	Muhammadans: বাঙালি	৪,৫৬৭	২.৩৪	১৮.	অচিহ্নিতকরণ জনগোষ্ঠী	১৯,০৮৪	৯.৭৭

Source: Compiled from the Calcutta Police Census, 1837 (See Note 11 for details). * The figure for Total Population has been derived by adding the figures for all communities. Assuming this to be the total population, the percentage shares of the respective communities have been computed.

২.৪. অভিবাসনের ধারণা ও প্রকারভেদ

পৃথিবীর ইতিহাসে উদ্বাস্তু সমস্যা শুধুমাত্র দেশভাগের পরিপূরক নয়। এঁরা বাইরেও নানা সময়ে নানান পরিস্থিতির কারণে মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে নিজ বাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। একইভাবে দেশ বিভাজনের পরেও বর্ডার স্থাপনের পর তৈরি হয়েছে রিফিউজি স্রোত, এই স্রোতের অনুকূল ও প্রতিকূলতায় হারিয়ে গেছে কত মানুষের ঘর। সভ্যতার সেই আদিকাল থেকেই বাসভূমির সন্ধানে মানুষ এক দেশ থকে অন্য দেশে পাড়ি দিয়েছেন। এই পাড়ি দেওয়া মানুষেরা কখনও নিঃসঙ্গ আবার কখনও যুথবদ্ধ। মানুষ গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে আরও দূরের কোনও শহরে, এমনকী রাজ্য থেকে দেশের গণ্ডি পেরিয়েও মানুষ আস্তানা গড়েছে নতুন কোনও ঠিকানায়। বাস্তু হারিয়ে ফেলা এই সমস্ত মানুষদের একাধিক ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

অভিবাসনকে যদি একত্র ভাবে একই ছাদের তলাতে নিয়ে এসে আলোচনা করা যায় তাহলে অনিবার্যভাবে কতকগুলি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে ধরা পড়ে যায়, যেমন উদ্বাস্তু শব্দটি আটপৌরে, এর অর্থ হল ভিটেছাড়া। এই ভিটেছাড়া বা বাস্তুহারা মানুষ যখন কোনও কারণে তাঁরা নিজের চেনা গণ্ডির বাইরে চলে যায় বা অভিগমন করেন তখন বুঝতেই হয় তিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে বিপন্ন এবং এই বিপন্নতার হাত ধরেই তাঁকে হতে হয় 'ছিন্নমূল'। আর এই ছিন্নমূল মানুষ দেশকাল ও পাত্রের কাছে এক নতুন অভিধায় ভূষিত হয়, যাকে আমরা বলি 'উদ্বাস্তু' বা 'রিফিউজি'।[৫৩] এই রিফিউজি শব্দদুটিকে যদি ভাঙা হয়, তাহলে তাঁর আবার দুটি প্রতিশব্দ দাঁড়ায় যথা ১. শরণার্থী এবং ২. উদ্বাস্তু, শরণার্থী মানেই তিনি/তারা অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যিনি আবার তাঁর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন অর্থাৎ আশ্রয় বা নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছেন। আর উদ্বাস্তু তিনিই, যিনি গৃহহীন। 'বাস্তু' শব্দের অর্থ ভিটে আর 'উৎ' শব্দের অর্থ উৎখাত, অর্থাৎ যাকে তাঁর নিজের ভিটে থেকে সরিয়ে বা উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে।[৫৪] কাজেই অভিবাসন সংক্রান্ত এমন একাধিক উপসর্গ জুড়ে অভিবাসনের ধারণা পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

ভারতবর্ষে আগত উদ্বাস্তুদের সরকারিকরণের ক্ষেত্রে ১৯৪৬ সালের 'Foreignera Act' এবং ১৯৫৫ সালের 'Citizenship Act' -এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি আইনের উপরে ভিত্তি করেই ভারতে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন এবং ১৯৬৭ সালের শরণার্থী সংক্রান্ত প্রোটকলে ভারত স্বাক্ষর করেননি।[৫৫] কাজেই ভারতের নিদিষ্ট শরণার্থী আইনের অভাবের ফলে সরকার বিভিন্ন শরণার্থী প্রবাহের ক্ষেত্রে নিজের মতো করে সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিলেন। কারণ ভারতের শরণার্থীদের মূলত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে পরিচালিত হয়। এঁর জন্য নিদিষ্ট সংহতিবদ্ধ কোনও মডেল নেই। তবে ভারত শরণার্থী সংক্রান্ত প্রোটকলে স্বাক্ষর না করলেও স্বাধীনতার পর বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে এসেছেন। উল্লেখ্য যে দেশ ভাগের সময়ে রাষ্টপুঞ্জ তৈরি হলেও শরণার্থী কনভেনশন ছিল না। অথচ সীমান্তের ওপার থেকে আসা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আশ্রয় পাওয়া বে-নজির। এছাড়াও অতীতে ভারতের মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বনাম

'স্টেট অফ অরুনাচল প্রদেশ' মামলায় (১৯৯৬) সালে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছিলেন যে, ভারতে পৃথক শরণার্থী আইন না থাকলেও সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ২১ নম্বর ধারায় উল্লেখিত বেঁচে থাকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার আছে। অর্থাৎ ১৯৫১ ও ১৯৬৭ সালের শরণার্থী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নিয়মাবলীতে ভারতের প্রত্যক্ষ সায় না থাকলেও নয়াদিল্লি অতীতে অমানবিক হননি।[৫৬]

ভারতবর্ষে যত মানুষ অভিবাসনের মধ্যে এসেছেন এবং বসতি স্থাপন করেছেন তাঁদের সংখ্যা অগণিত। কালের প্রবাহে এখানে দীর্ঘদিন থাকার সূত্রে খাতায় কলমে নাগরিকত্ব না পেলেও, অনেকেই রয়ে গেছেন আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে। এই সমস্ত মানুষের বসবাস ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এই অভিবাসিত বিদেশি নাগরিকদের যোগাযোগের ইতিহাস বহুদিনের। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু আগমন ও অভিবাসনের প্রসঙ্গে আলোচনা করলেই দেশভাগের কথা উঠে আসে। তবে শুধুই যে দেশভাগের কারণে মানুষ দেশান্তরিত হয়ে ভারতে এসেছিল তা নয়, একাধিক কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ দেশান্তরিত হয়ে কলকাতা মহানগরে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতি ও পক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ দেশান্তরিত হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই বিষয়ের উপরে আলোকপাত না করলে অভিবাসনের আসল স্বরূপ উপলব্ধ হয়ে ওঠে না। তবে গবেষণার প্রয়োজনে বিশেষত বর্তমান সন্দর্ভের স্বার্থে অভিগমনের ধরনগুলি সামনে রেখে অভিবাসনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলোচনা করা হয়েছে।

অভিবাসনের যেমন একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনই রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়। তাত্ত্বিকেরা অভিবাসনের এই পর্যায় ও প্রকারভেদগুলির মাধ্যমে অভিবাসনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাত্ত্বিকদের মতে কোনও জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষ যখন নিজেদের স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্র ছেড়ে অন্যস্থানে চলে যান, যতক্ষণ পর্যন্ত না অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কোনও শক্তির প্রয়োগ হচ্ছে তাকে 'স্বেচ্ছায় অভিগমন' (Voluntary Migration) বলা হয়। একইভাবে যখন মানুষ এক প্রকার বাধ্য হয়ে নিজের চেনা জগতের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয় তাঁকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুতি (Forced Migration) বলে ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে অভিগমনকারীর নিজস্ব ক্ষেত্রের অভ্যন্তরীণ চাপের কারণ কাজ করতে পারে,

সেই চাপ নানা রকমের হতে পারে। কখনও রাজনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক এবং সর্বোপরি সাংস্কৃতিক চাপ হতে পারে।[৫৭] অভিবাসনের পিছনে এই দুটি প্রধান কারণ ছাড়াও আরও একাধিক কারণের জন্য মানুষ দেশান্তরিত বা স্থানান্তরিত হতে পারে, যেমন জীবিকার সংকট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো কবলে পড়লে। কোনও জনগোষ্ঠীর মানুষ যদি জীবিকার সংকটের কারণে নিজস্ব জগতের গণ্ডি পেরিয়ে অচেনা ও অজানা অঞ্চলের দিকে পাড়ি দিতে বাধ্য হন তাকে 'সংকটজনিত অভিগমন' (crisis Migration) বলা যেতে পারে। এই সংকট জনিত কারণে আবার যখন কোনও ব্যক্তি দেশের সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশে চলে যান তখন তাঁরা হয়ে ওঠেন 'সংকটজনিত উদ্বাস্তু' (Crisis-Induced Refugees)।[৫৮] এইভাবে অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি তাত্ত্বিকেরা বিভক্ত করেছেন, যা প্রত্যেকটির সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

২.৪.১. অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর ধারণায় কলকাতার কাবুলিওয়ালা

আফগানিস্তানের আর্থ-সামজিক ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতা তাঁদের যে দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে অভিবাসিত এই বিপুল জনগোষ্ঠীর যে অংশটি ভারতবর্ষের দিকে প্রবেশ করে কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের অভিগমনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ১৮৯২ সালে তৎকালীন আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে ঐতিহাসিক 'ডুরান্ড লাইন' স্থাপন। তবে ঔপনিবেশিক পরবর্তী সময়ে আফগানদের ভারতবর্ষে আগমনের প্রেক্ষাপট ছিল খানিকটা আলাদা। এই সময় আফগানিস্তানে একের পর এক বহির্দেশীয় শক্তির আক্রমণ, সরকারের পতন, গৃহযুদ্ধ পরিকাঠামোগত সমস্যা, পরিবেশগত সমস্যা, অস্থায়ী অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল আফগান অভিবাসনের মূল কারণ। উনিশ শতকে আশির দশকের পর থেকে আফগান অভিবাসিত মানুষেরা তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব আফগানরা এসেছিলেন তাঁদেরকে অভিবাসনের দুই-তিনটি বৈশিষ্টের মধ্যে রেখে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত- যে সমস্ত আফগান কাবুলিওয়ালারা অন্তঃদেশীয় সমস্যার কারণে দেশান্তরিত হয়েছিলেন তাঁদেরকে 'সংকট জনিত অভিবাসনের' (Crisis Migration) পর্যায়ভুক্ত করা যায়। যেমন

কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গে বসবাসরত আফগান কাবুলিওয়ালারা অনেকেই নিজেদের দেশের ভূ-রাজনৈতিক সমস্যা, পেশাগত জীবনের অনিশ্চয়তা এবং বৈদেশিক শক্তির দ্বারা নিপীড়িত হয়ে অনেকেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আফগান অভিবাসনের এই পর্বকে সংকটজনিত অভিবাসনের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ এই পর্যায়ে আফগানরা শুধুমাত্র নিজেদের জীবনের সংকট থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে বাধ্য হয়ে দেশান্তরিত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আফগান কাবুলিওয়ালাদের ভারতে অভিগমনের প্রবণতাকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে অনেকেই স্বেচ্ছায় দেশান্তরিত হয়েছেন, যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিকল্প পেশার টান এবং নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদ, এখানে বাইরের কোনও শক্তি বা প্রভাব কাজ করেনি। কাজেই আফগান অভিবাসনের এই পর্যায়কে 'স্বেচ্ছায় অভিবাসন' বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং আফগান কাবুলিওয়ালাদের কলকাতায় আগমনের পিছনে সংকটজনিত এবং স্বেচ্ছাজনিত দুটি বৈশিষ্ট্য সমানভাবে কাজ করেছিল। আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্প থেকে বর্তমানে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবন-যাপন এবং দেশান্তরিত হওয়ার উপরে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে অভিবাসনের এই দুটি বৈশিষ্ট্য পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। তবে অভিবাসনের তৃতীয় কারণটি খানিকটা ভিন্ন। এক্ষেত্রে কাবুলিওয়ালাদের কলকাতাতে অভিবাসনের পিছনে 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুতি' (Force Migration) বিশেষভাবে কাজ করেছিল।[৫৯] অর্থাৎ তাঁরা পরিস্থিতির চাপে পড়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৭৮-৯২ সালে আফগানিস্তানে মুজাহিদিনদের ক্ষমতা দখল এবং পরবর্তী সময়ে তালিবান শক্তির হাতে আফগানিস্তানের ক্ষমতার রাশ চলে গেলে আফগানদের দেশ ছাড়ার হিড়িক পড়ে যায়। আফগানিস্তানে অ-গণতান্ত্রিক সরকারের অধিষ্ঠান সাধারণ আফগানরা মেনে না নিলে তাঁদের উপরে আক্রমণ নেমে আসে। ফলে আফগানরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো ভারতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুতির স্বীকার হয়ে অভিবাসিত হতে শুরু করেন। কাজেই ভারত তথা কলকাতাতে যত সংখ্যক আফগান জনগোষ্ঠীদের দেখতে পাওয়া যায় তাঁরা সকলেই হয় সংকটজনিত কারণে অভিবাসিত হয়েছেন নতুবা স্বেচ্ছায় বা বলপূর্বক কারণে দেশান্তরিত হয়েছেন।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে আফগান অভিবাসনের পিছনে যতগুলি কারণ ছিল 'সংকটজনিত' কারণে বাস্তুত্যাগের বিষয়টি ছিল কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনের মুখ্য

কারণ। সংকটজনিত কারণে মানুষ অকস্মাৎ বা ধীরে ধীরে প্রকৃতির নিয়মে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করতে থাকেন। এই ধরনের অভিগমনের পিছনে মূল লক্ষই থাকে জীবনের গুণগত মানের পরিবর্তন ও সংকট থেকে সাময়িক মুক্তি। অথবা কখনও কখনও ইচ্ছাকৃত চিরিদিনের মতো নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে অন্যস্থানে চলে যাওয়া। সংকটজনিত কারণে বাস্তুত্যাগীরা যখন নিজেদের গণ্ডি অতিক্রম করে অন্যদেশে আশ্রয় নেন, আন্তর্জাতিক পরিভাষায় তাঁদেরকে বলা হয় 'উদ্বাস্তু বা শরণার্থী' (Asylum seekers)।[৬০] তবে সংকটজনিত কারণে বাস্তুত্যাগ যেহেতু খুব ধীরে ধীরে ঘটে সেহেতু স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে দিয়ে ঘটে। কিছুটা সর্বসাকুল্যে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাবুলিওয়ালা গল্পের রহমত নামের যে আফগান চরিত্রকে আমরা দেখতে পাই, যিনি একজন সাধারণ কাজু-কিসমিস বিক্রেতা। জীবিকা নির্বাহের কারণে এদেশে এসেছিলেন। এই-টুকুই তাঁর পরিচয়। তবে রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে কলকাতাতে যে সমস্ত কাবুলিদের কথা আমরা বিভিন্ন সূত্র এবং ক্ষেত্র সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে একটা অংশের 'সংকটজনিত' কারণে যে বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসকে যে প্রকারভেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হোক না কেন তাঁরা যে 'অভিবাসনের' মাধ্যমে কলকাতায় এসেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রহমতের মতো অনেক কাবুলিওয়ালারা কলকাতাতে রয়েছেন, যাঁরা প্রতি বছর শরৎকালের দিকে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসেন। সারা বছর ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে মূলধন উপার্জন করেন সেগুলো সংগ্রহ করে এবং মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্বদেশে ফিরে যান।[৬১] কাবুলিওয়ালাদের কলকাতায় যাতায়াতের এই পর্ব সারাবছর লেগেই থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহজ সরলতার মধ্যে দিয়ে বাঙালি জীবনে কাবুলিওয়ালাদের উপস্থাপন করলেও, কলকাতার ইতিহাসে কাবুলিওয়ালারা যে 'অভিবাসিত' জনগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের চোখে কলকাতার বিদেশি জনগোষ্ঠী হিসাবে আর্মেনিয়ান, জিউস, চিনা এবং ফরাসিরা যেভাবে 'অভিবাসিত' জনগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত সে একই দৃষ্টিতে কলকাতার কাবুলিদেরকের অভিবাসিত নাগরিকের অভিধা থেকে ব্রাত্য রাখা যায় না। কারণ একটি

অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অভিবাসনের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার প্রয়োজন কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে প্রতিটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে। পরিসংখ্যানের দিক থেকে দেখতে গেলে ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ভারত প্রায় ৫৯,০০০ আফগান শরণার্থী মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন।[৬২]

কলকাতায় আফগান অভিবাসনের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনার সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনের প্রেক্ষিতের উপরে আলোকপাত করার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে এবং রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালে।[৬৩] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩১ বছর তখন গল্পটি প্রকাশিত হয়। যে সময় কলকাতা মহানগরী ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিল। ব্রিটিশরা তখন পূর্ণ উদ্যোমে কলকাতায় নিজেদের আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বণিক গোষ্ঠী তখন কলকাতা দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন। সমসাময়িক এই সময়ে আফগানরা কলকাতাতে অভিবাসিত হয়েছেন। ঐতিহাসিক 'ডুরান্ড লাইন' স্থাপনের ফলে অনেকের ধারণা বহু আফগান নিজেদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হতে বাধ্য হয়েছে।[৬৪] ফলে এই সময় থেকে কলকাতাতে আফগান অভিবাসনের ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরেও ভারত সরকার অফিশিয়াল বিবৃতিতে জানিয়েছেন আফগান অভিবাসিত মানুষ যদি এই সংকটকালে ভারতে আসতে চান তাঁদের সহযোগিতা করা হবে। এইভাবে সাধারণ আফগানরা জীবন জীবিকার চাহিদা, পেশার টান, চিকিৎসা, পড়াশুনা ইত্যদি কারণে ভারতবর্ষকে বেছে নিয়েছেন।

ভারতে আফগান অভিবাসিত মানুষের আগমনের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করতে গেলে আরও একটি বিষয়ের উপরে আলোকপাত করতে হয়। যেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতে শুধুই যে আফগান মুসলিমরা অভিবাসিত হয়েছেন তাই নয়। আশিষ বসু তাঁর 'The Afghan Refugee in India' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন ভারতের দিল্লি, ফরিদাবাদ সহ তাঁর আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে আফগান হিন্দু এবং শিখ ধর্মালম্বীর মানুষেরা অভিবাসিত হয়েছেন।[৬৫] UNCHR -এর দিল্লি অধিবেশনে (২০০৪) থেকে জানা যায় আফগানিস্তানে কয়েক প্রজন্ম ধরে শিখ জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এদের মধ্যে ২৫% শতাংশ বেশ

উন্নত ব্যবসায়ী। কিন্তু আফগানিস্তানের ধর্মীয় মৌলবাদের শিকার হয়ে ১৯৯২ সালে শিখদের উপরে আঘাত আসার কারণে তাঁরা আফগানিস্তান ছাড়তে বাধ্য হন। কাজেই আফগানিস্তানের শিখ এবং অল্প কিছু সংখ্যক হিন্দুরা 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুতি'র শিকার হয়ে ভারতবর্ষে অভিবাসিত হতে বাধ্য হয়েছেন।[৬৬] তবে এই সমস্ত আফগান শিখ ও হিন্দুরা দিল্লিতে বসতি স্থাপন করলেও কলকাতার দিকে তাঁরা আসেননি।

২.৫. ডায়াস্পোরার সংজ্ঞা ও সংক্ষিপ্ত ধারণা

সাম্প্রতিক সময়ে 'ডায়াস্পোরা' শব্দটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র এবং গবেষণাতে এই শব্দটিকে নিয়ে আলোচনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে। বিশেষত উত্তর-ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের গবেষণাতে 'ডায়াস্পোরা' একেবারে নতুনরূপে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। 'ডায়াস্পোরা' শব্দটি একদিকে যেমন তাঁর নিজেস্ব চরিত্র রয়েছে, অন্যদিকে তেমনই আরও কতকগুলি প্রতিশব্দকে পিছনে ফেলে একবিংশ শতকে নিজের অবস্থানকে আরও শক্তপোক্ত করে তুলেছে। একেবারে শুরুতেই 'প্রবাসী' শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বিদেশে বসবাসকারী মানুষদের সংজ্ঞায়িত করা যেত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'অভিবাসী' বা 'Immigrant' শব্দটির ব্যবহারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অভিবাসী শব্দটির মধ্যে দিয়ে বিদেশে বসবসকারী নাগরিকদের খুব সহজে সংজ্ঞায়িত করা যেত। তবে এই ধরনের অভিবাসনের মধ্যেও যন্ত্রণার ছাপ ছিল। যেন বাধ্য হয়ে মানুষ অন্যস্থানে গমন করেছেন। তাই 'অভিবাসন' বা 'Immigrant' শব্দটির মধ্যে দিয়ে সেভাবে ধরা পড়ছিল না পাকাপাকি ভাবে অন্য দেশে বসবাস করার বিষয়টি। তাই উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকেরা এই সমস্ত অভিবাসী মানুষদের নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে উদ্যোগী হলেন এবং নাম দিলেন 'ডায়াস্পোরা'। এই ডায়াস্পোরার সংজ্ঞা সর্বপ্রথম সংজ্ঞায়িত করেছিলেন একজন আর্মেনিয়ান তাত্ত্বিক এবং অধ্যাপক Kheching Toloyan।[৬৭]

প্রারম্ভিক পর্বে কোনও একটি জনগোষ্ঠীর মানুষ তাঁর জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বাধ্য হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিচ্ছেন, সেই সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষদের 'ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠী' বলা হত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 'ডায়াস্পোরার' অর্থ অনেকটা

প্রসারিত হতে শুরু করে। তখন থেকে কোনও জনগোষ্ঠীর মানুষ যখন স্বেচ্ছায় নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইতে চলে যাচ্ছেন তখন তাঁদেরকে ডায়াস্পোরা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডায়াস্পোরার অর্থ পরিবর্তন ও প্রসারিত হচ্ছে। ঐতিহাসিক জুডিথ ব্রাউন তাঁর লেখা 'Global South Asian Diaspora' গ্রন্থে ডায়াস্পোরার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। এই সংজ্ঞাটির মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন ডায়াস্পোরার অর্থ কীভাবে প্রসারিত হচ্ছে। তিনি লিখেছেন "ডায়াস্পোরা শব্দটিকে ব্যবহার করা হবে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে, যাঁরা তাঁদের আদি বাসভূমি ছেড়ে চলে গেছে বহুদিন আগে, হয়তো স্থায়ীভাবেই, কিন্তু নিজেদের পুরনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে বহন করে চলেছে। যাঁরা ছেড়ে আসা দেশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেন এবং সেই দেশের ঐতিহ্যকে নিজেদের সত্তা বলে মনে করেন।"[৬৮] সুতরাং ঐতিহাসিক জুডিথ ব্রাউনের মতানুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার ডায়াস্পোরার ক্ষেত্রে যে শুধুমাত্র বিতাড়নের মাধ্যমেই হয়েছে সে কথা বলা চলে না। উত্তর-ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিকেরা 'ডায়াস্পোরাস' শব্দটিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্ত অভিবাসিত মানুষেদের এক ছাদের নীচে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন।

ডায়াস্পোরা শব্দটি Dia মানে দূরে Speiren এর অর্থ ছড়িয়ে পড়া। ইজরাইল থেকে নির্বাসিত ইহুদিদের সর্বপ্রথম ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠী হিসাবে আখ্যায়িত করা হত। তখন মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে 'ডায়াস্পোরা' বলে আখ্যায়িত করা হত না। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নানা কারণে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের বোঝাতে 'ডায়াস্পোরা' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। তবে বর্তমানে সম্প্রসারিত অর্থে কেবল বহিষ্কৃতরা নয়, জীবিকার জন্যে স্বেচ্ছায় দেশান্তরিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে বসতি গড়েছেন এমন লোকেদের ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক বিনিয়লাল 'বহিষ্কৃতদের' বলেছেন 'Diaspora of Labour' এবং স্বেচ্ছায় দেশত্যাগীদের বলেছেন 'Diaspora of Longing' এক্ষেত্রে যদি আরও একটু ব্যাপকভাবে ভাবা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, জন্মস্থান ছেড়ে পৃথিবীর অন্যস্থানে ছড়িয়ে আছেন, সেইসব মানুষেরা যাঁরা যুদ্ধ এবং রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে উদ্বাস্তু, ক্রীতদাস বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হয়ে রয়ে গেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, পেশার কারণে

যাঁরা আজও প্রবাসী। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষদের তাঁদের জীবন ও অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে 'ডায়াস্পোরার' মতো তাত্ত্বিক ধারণার উদ্ভবের ফলে।[৬৯]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে Globalization বা বিশ্বায়নের সহযোগী রূপে 'অভিবাসী' বা 'Immigrant' শব্দটি চালু হয়। ডায়াস্পোরার তাত্ত্বিক অধ্যাপক Dr. Kheching Tololyan তাঁর 'Rethinking Diaspora (S): Statesless Power in the Transnational Movement' প্রবন্ধে ডায়াস্পোরার উৎস সন্ধানে দেখান, Encyclopedia Britinnica তে ১৯১০-১১ সংস্করণে ডায়াস্পোরা শব্দটির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৫৮ সালে নবীন সংস্করণে শব্দটি এসেছে একটি কেলাসিত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের বিশেষ ধর্ম ব্যাখ্যার প্রয়োজনে।......When heated, sheds or Scatters Flakes from its surface, and thus its name from the greek verb 'Diaspeirein to 'Scatter' ক্রমশ আরও কিছুটা পরে 'ডায়াস্পোরা' শব্দটি সমাজবিজ্ঞানের অঙ্গ হয়।[৭০] প্রাথামিকভাবে প্রাচীনকালে গ্রিক, ইহুদি এবং পরবর্তীকালে আর্মেনিয়ানদের ডায়াস্পোরা শব্দটি প্রযুক্ত হত। এরপরে প্রসঙ্গত ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে প্রাশ্চাত্য গবেষকরা নিজেদের জন্মস্থান ছেড়ে অন্যস্থানে বা অন্যদেশে বসবাসকারী ভিন্ন ভূখণ্ডে শিকড় নামানো সকল মানুষের সম্পর্কেই এই অভিধা প্রয়োগ করতে শুরু করেন। এর ফলে ডায়াস্পোরা ধারণার মধ্য দিয়েই সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের একটি স্বীকৃতি মেলে।

ডায়াস্পোরার আর একটি তাত্ত্বিকের কথা জানা যায়, যিনি জন্মসূত্রে ইহুদি ধর্মাবলম্বী। তিনি ডায়াস্পোরাকে একটু অন্যভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি হলেন Robin Cohen তাঁর 'Classical Diaspora' যাকে আবার 'Victims Diaspora' নামেও আখ্যায়িত করেছেন কোহেন। এই ডায়াস্পোরার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যন্ত্রণার ইতিহাস ও বিতাড়নের ইতিহাস, যা আফ্রিকান ডায়াস্পোরা এবং আর্মেনিয়ান ডায়াস্পোরার সঙ্গে তুলনা করা চলে।[৭১] তবে ১৯৮০ দশকের পরবর্তী সময়ে ডায়াস্পোরা অর্থ সম্প্রসারিত হচ্ছে। রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত, ধর্মীয় সংখ্যালঘুত্বের তকমায় দেশ ছাড়তে বাধ্য হওয়া এবং এরই সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নিতান্ত ব্যক্তিগত ও পেশাগত কারণে ভিনদেশে পদার্পণ করা জনগোষ্ঠীদের ডায়াস্পোরার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

২.৫.১. ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর ধারণায় কলকাতার কাবুলিওয়ালা

ডায়াস্পোরার ধারণা প্রদানের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকেরা যে সমস্ত অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন, সেখান থেকে পরিষ্কার উঠে আসে। ইচ্ছাকৃত হোক আর সংকটজনিত কারণেই হোক অথবা বলপূর্বক কারণে কোনও জনগোষ্ঠীর মানুষ দেশান্তরিত হয়ে অন্যদেশে যখন আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন তাঁদেরকে 'ডায়াস্পোরা' জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্তি করা হয়। কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যেও ডায়াস্পোরার এই পূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কাজেই কলকাতার আফগানরা যে ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একটা সময় পর্যন্ত কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকেরা দ্বিধা বিভক্ত ছিলেন কারণ তখনও পর্যন্ত ডায়াস্পোরার ধারণা এতটা প্রসারিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা[৭২] গল্পের 'রহমত' চরিত্রটি যে ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত, তা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে স্পষ্ট হতে থাকে। তাই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ডায়াস্পোরা কথাটি এতটাই প্রসারিত হয়েছিল যে জিউস এবং আর্মেনিয়ানদের মতো কলকাতার কাবুলিদের একইভাবে 'ডায়াস্পোরা' জনগোষ্ঠী হিসাবে আখ্যায়িত করা হলে ভুল হয় না। জিউস ও আর্মেনিয়ানদের ক্ষেত্রে বিতাড়নের বা যন্ত্রণার দ্বারা দেশান্তরিত হওয়ার অতীত ইতিহাস থাকার কারণে তাঁদেরকে 'Classical Diaspora' বা 'Victims Diaspora' -র অন্তর্ভুক্ত করা হলেও আফগান কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রে উক্ত দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে 'Diaspora of Labour', Diaspora of Longing' এবং 'Deterritorialization of Identities' মতো ধারণাগুলি ভীষণভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়ে।

Robin Cohen তাঁর 'Global Diaspora' এবং Dr Kheching Tololyan এর তত্ত্ব অনুযায়ী ষাটের দশকের শেষ থেকে যে সমস্ত মানুষ নিজেদের জন্মস্থান ছেড়ে ব্যক্তিগত ও পেশাগত কারণে ভিনদেশে বসবাস করতে উদ্যত হয়েছে, তাঁরা খানিকটা 'স্বেচ্ছাকৃত' বা 'ইচ্ছাকৃত' ভাবে অন্যদেশে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক্ষেত্রে আফগান কাবুলিদের কলকাতাতে অভিবাসনের ধরনের মধ্যে Robin Cohen এবং kheching Tololyan চিন্তাভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। কারণ কাবুলিওয়ালারা যেমন স্বেচ্ছায় জীবিকার তাগিদে দেশ ছেড়েছেন, তেমনই অনেকেই বাধ্য হয়েই

দেশান্তরিত হয়েছেন। ভারতে আফগান ডায়াস্পোরার চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলির উপরে আলোকপাত করলে দেখা যাবে। আফগানিস্তান দেশটি দীর্ঘ সময় জুড়েই রয়েছে নানা ধরনের ভূ-রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে গেছে। একদিকে যেমন যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণে বহু মানুষ দেশান্তর হয়েছেন, তেমনই জীবিকার প্রয়োজনে বহু মানুষ দেশত্যাগ করেছেন। অভিবাসিত এই আফগান জনগোষ্ঠীর ভারতবর্ষে আগমণের ইতিহাস বেশ পুরনো। তবে ঔপনিবেশিক পরবর্তী সময়কাল থেকে যে সমস্ত আফগান কলকাতাতে এসেছেন ডায়াস্পোরার তাত্ত্বিকদের মতামতের উপরে ভিত্তি করে বলা যেতে পারে তাঁরা শুধুমাত্র অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়, একইভাবে ‘ডায়াস্পোরা’ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাই একুশ শতকের ডায়াস্পোরার রূপ ও রূপান্তরকে জানতে হলে ব্যক্তির দিকে যাওয়াই যথেষ্ট নয়, কারণ ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের মধ্যে ধরা পড়ে ইতিহাস।

জুডিথ ব্রাউন ডায়াস্পোরার যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন সেখানে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন “ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা আশ্রিত দেশে নিজেদের সংস্কৃতিকে লালন- পালন করে গেছেন স্বাচ্ছন্দ্যে, আবার নিজেদের দেশের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে গেছেন নিয়মিত”। কাজেই জুডিথের এই তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে কলকাতার আফগান ডায়াস্পোরাকে যদি ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে দেখা যায় আফগান কাবুলিওয়ালারা কলকাতাতে বছরের পর বসবাস করার পরেও নিজদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং একইসঙ্গে নিজেদের দেশের সঙ্গে অনেকেই যোগাযোগ রেখে গেছে নিয়মিত। জুডিথ ব্রাউনের এই তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথে ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের রহমত নামের কাবুলিওয়ালাকে যদি মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়। তাহলে দেখা যাবে রহমতের মধ্যে ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আর এক্ষেত্রে শুধু রহমত একা নন, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে কলকাতাতে যে হাজার হাজার কাবুলিওয়ালার বসবাস রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রেও একই সাদৃশ্যতা লক্ষ করা যায়।

ডায়াস্পোরার একাধিক তাত্ত্বিকগণ যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যন্ত্রণার ইতিহাস এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবন-যাপন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকে পর্যবেক্ষণ করলে এই একই চিত্র টের পাওয়া যায়। কারণ কলকাতাতে অভিবাসিত হওয়ার পর

থেকেই তাঁদের জীবনে রয়ে গেছে একাধিক সংকট। বাসস্থান থেকে নাগরিকত্ব, জীবন-জীবিকা থেকে পেশাগত পরিচয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিত্যনৈমিত্তিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তাঁদের দিন কাটাতে হচ্ছে। একইসঙ্গে এমন অনেক কাবুলিওয়ালা আছেন যাঁরা ইচ্ছে করলেই দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারছেন না। কারণ দেশে ফেরার জন্যে তাঁদের অনেকের কাছেই নেই উপযুক্ত প্রমাণপত্র, কলকাতাতে দীর্ঘদিন বসবাস করার সুবাদে তাঁদের পরিবারের পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া কাগজপত্র দিয়ে কিছুতেই প্রমাণ করতে পারছেন না তাঁরা আফগানিস্তানের বাসিন্দা। কাজেই আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করতে না পারার পিছনে রয়েছে একাধিক প্রতিবন্ধকতা। এমনকি প্রজন্মের পর প্রজন্ম কলকাতাতে বসবাস করলেও তাঁদের সকলের মধ্যে কিছু চেনা যন্ত্রণার ছবি প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে।

ডায়াস্পোরার তাত্ত্বিকেরা মনে করেন ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংকট এবং চেনা যন্ত্রণার ছবি খুবই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে এমন অনেক জনগোষ্ঠী রয়েছে যাঁরা দেশে ফেরার সুযোগ পেলেও, যন্ত্রণা এবং সংকটকে উপেক্ষা করেই রয়ে গেছে আশ্রিত দেশে। তঁদের নিজেদের দেশটিতে নতুন করে ফিরে যেতে তাঁরা খুব একটা আগ্রহী হন না। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রেও এই একই ভাবধারা লক্ষ করা যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন, জীবিকা নির্বাহ এবং জীবন ধারণের কারণে কলকাতাতে অভিবাসিত হলেও, পরবর্তীকালে আর আফগানিস্তানে ফিরে যেতে চাননি। কলকাতায় পাকাপাকিভাবে নিজেদের বাসস্থান গড়ে নিয়েছেন। কাজেই ডায়াস্পোরার পরিবর্তিত এবং প্রসারিত রূপের মধ্যে নিয়ে এসে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ইতিহাসকে তুলে ধরলে ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠী হিসাবে কাবুলিওয়ালাদের সামগ্রিক চিত্র উঠে আসে।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে প্রথমদিকে ডায়াস্পোরা একাডেমিক পরিসরে উঠে এসে উত্তর-ঔপনিবেশিক চর্চার কেন্দ্রীভূত হলেও এর উৎস বহু প্রাচীন। এর সূচনা যীশু খ্রিষ্টের জন্মের পূর্বে। তবে সময়ের সঙ্গে মানুষের জীবন, চৈতন্যের যেমন আমূল বদল ঘটেছে, তেমন করেই পরিবর্তিত হয়েছে ডায়াস্পোরাও। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশে বসবাসকারী অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রাচীনকালে ‘ইহুদি’ বা ‘আফ্রিকান’ ডায়াস্পোরার সঙ্গে একত্রে এনে বিচার করলে ভুল হবে। আভিধানিক অর্থে ডায়াস্পোরা গ্রিক অর্থে ব্যবহৃত হলেও তাঁর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাপক। সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে

সুযোগ মিললেও পুরনো দেশে অভিবাসন নিতে অনাগ্রহী বহু ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর মানুষ। কারণ আশ্রিত দেশে তাঁরা নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছেন, প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়েও তা উপেক্ষা করে ভালো আছেন আশ্রিত দেশে। কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশের মধ্যেও এই একই মনোভাব দেখা গেছে। বর্তমানে এঁদের মধ্যে একটা অংশ আর নিজেদের দেশে ফিরে যেতে চান না। কারণ কলকাতাকেই তাঁরা নিজেদের বাসস্থান হিসাবে মেনে নিয়েছেন। তাই কয়েক প্রজন্ম এখানেই রয়ে গেছেন। সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিক (Cultural Theorist) Mr. Stuart Hall যদিও মনে করেন আধুনিক ডায়াস্পোরাকে পুনর্নির্মানের বা সংকলনের প্রয়োজন আছে। "The Diaspora experience as I intend it here is defined not by essence or purity, but by the recognition of a conception of Identity which lives with and through, not despite, difference, by hybridity. Diaspora identity are those which are constantly producing and reproducing themselves a new, through transformation and difference"[৭৩]

২.৬. প্রান্তিকতার সংজ্ঞা ও ধারণা

উত্তর-ঔপনিবেশিক ইতিহাস চর্চাতে প্রান্তিক, নিম্নবর্গ, অন্তেবাসী ইত্যাদি শব্দগুলি বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিশেষত সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সাম্প্রতিককালে অবাধ বিচরণ করছে। তবে এই শব্দগুলোর অন্তর্গত নৈকট্য পাশাপাশি অবস্থান করলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকটাই ভিন্নার্থক। আসলে সমাজ ব্যবস্থার চিরাচরিত নিয়মে যে 'প্রান্তিক', সচরাচর সেই 'নিম্নবর্গ' হয়ে থাকে। কিন্তু অর্থযোগে 'প্রান্তিক' আর 'নিম্নবর্গ' একেবারে সমার্থক শব্দ নয়। যেমন ১৯৮৫ সালে 'সাবা-আলর্টান স্টাডিজ' নামক বিদ্যাশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি আধুনিক পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার হয়নি।[৭৪] আবার 'অন্তেবাসী' শব্দটির আদি অর্থ ছিল 'গুরুগৃহেবাসী শিষ্য'। তবে 'প্রান্তিক' শব্দটির ব্যবহারের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার একেবারে প্রান্তে যাঁরা বসবাস করেন, যাঁদের অবস্থান কোনও ভাবেই সমাজের কেন্দ্রে নয়, তাঁদেরকে বোঝায়। অর্থাৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে প্রায় সমস্ত কিছু থেকে যাঁরা খানিকটা পিছিয়ে পড়া। আসলে প্রান্তিকতা এমন একটি ধারণা, যাঁর পরিধি বিস্তর এবং খানিকটা মানসিক এবং খানিকটা উপলব্ধ নয়।

'প্রান্তিক' এমন একটি ধারণা, যে ধারণার উপর ভিত্তি করে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'প্রান্তিকতাকে' (Marginility) ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রান্তিকতার কবলে আক্রান্ত। কাজেই সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিকেরা প্রান্তিকতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য কয়েকটি মাপকাঠিকে জনমানসে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতানুযায়ী সমাজের কোনও স্তরের মানুষ যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সমাজের অন্য স্তরের মানুষদের থেকে খানিকটা পিছিয়ে পড়া অন্তর্ধান জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন তখন তাঁদেরকে 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠী' (Marginal Community) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। আবার একইভাবে কোনও জনগোষ্ঠীর মানুষ যখন নিজের জন্মস্থান বা বাসস্থান ছেড়ে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয় তখন সেই আশ্রিত অঞ্চলে তিনি 'প্রান্তিক' হয়ে পড়তে পারেন। কারণ নতুন জায়গাতে বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তাঁদেরকে যেতে হয়। বিশেষত পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে নিদিষ্ট কতকগুলি সমস্যা তাঁদেরকে প্রান্তিকতার মধ্যে ফেলে দেয়। এছাড়া আরও হাজার হাজার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রান্তিকতাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সুতরাং প্রান্তিকতা হল এমন একটি বহুমাত্রিক বিষয় যাকে একটি দুটি তত্ত্বের মধ্যে নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করা কঠিন।

সাধারণ মানুষের প্রান্তিক অবস্থাতে উত্তীর্ণ হওয়ার পিছনে কতকগুলি সাধারণ কারণ কাজ করে। যেমন- Exclusion, Globalization, Displacement, Diastar-Natural and Unnatirual ইত্যাদি। মানুষ চরম সংকটের মধ্যে পড়ে যুগে যুগে প্রান্তিকতার দিকে ধাবমান হয়েছেন। যার অন্যতম উদাহরণ ১৯৪৭ সালে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা অসংখ্য মানুষের আগমন। যাঁরা এই সময়ে বাড়ি ঘর, নিজস্ব বাসস্থান ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন রিফিউজি ক্যাম্পগুলিতে। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর লেখা 'প্রান্তিক মানব' গ্রন্থটি থেকে আমরা তাঁদের অবস্থার কথা জানতে পারি। গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন বাসস্থান হারিয়ে নতুন দেশে আসার পরে মানুষ কীভাবে 'প্রান্তিকতার' মধ্যে পতিত হচ্ছেন।[৭৫] প্রসঙ্গত তিনি যদিও শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গের মানুষদের কথা লিখেছেন যাঁরা দেশভাগের কবলে পড়ে এপার বাংলাতে এসেছিলেন। তবুও প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর ভাবনার সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়, কোনও বিদেশি জনগোষ্ঠীর মানুষ

পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে যখন অন্য কোনও দেশে আশ্রয় নিচ্ছেন, আশ্রিত দেশে সেই সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষ আর্থ-সামাজিক দিক থেকে 'প্রান্তিক' অবস্থার মধ্যে পতিত হচ্ছেন। কাজেই প্রান্তিকের ধারণার উপর ভিত্তি করে কলকাতার বিদেশি জনগোষ্ঠী হিসাবে আফগান কাবুলিওয়ালারাও যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই বর্তমান সন্দর্ভে কলকাতার 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠী' হিসাবে আফগান কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের উপরে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.৬.১. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ধারণায় কলকাতার কাবুলিওয়ালা

নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রান্তিক মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে সচল রাখতে সমাজের প্রান্তিক স্তরের মানুষের ভূমিকা অপরিহার্য। কাজেই 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠী'র মানুষদের অবদানকে অস্বীকার করলে সমাজ এগিয়ে যায় না, বরং পিছিয়ে যায় অনেকটা। সভ্যতার গঠন এবং সুষ্ঠ সমাজব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে সমাজের প্রান্তিক স্তর ও অন্ত্যজ স্তরের মানুষের সহযোগিতা সবসময় কাম্য। ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে প্রান্তিকতা এমন একটি ধারণা, যাকে কোনও নিদিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, কারণ এর প্রসার ও ব্যাপ্তি বিরাট। কাজেই বিশ্বসাহিত্য থেকে ইতিহাসের পাতায় পাতায় প্রান্তিক মানুষের কথা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে যুগে যুগে। যেমন সমাজ কৌলিন্যে নিম্নবৃত্ত মানুষের জীবনের কথা বারেবারে ধরা পড়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার মধ্যে। তাঁর রচিত উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, গান প্রভৃতি স্তরে উঠে আসে সমাজে বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক জনজীবনের কাহিনি। যেমন চাষি, খেতমজুর, রায়ত, ভৃত্য, মাঝি, তাঁতি, ফেরিওয়ালা, ভিখারিণী, কামার, কুমোর, ছুতোর প্রভৃতি বৃত্তিধারী মানুষের কথা, যাঁরা সকলেই সমাজের চোখে পেশাগত দিক থেকে প্রান্তিক স্তরের মানুষ।[৭৬] সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে এই সমস্ত মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও, সমাজের চোখে এরা অবহেলিত, নিপীড়িত, শোষিত এবং বঞ্চিত জনসম্প্রদায়ের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের লেখায় এই সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির কথা বারবার উঠে আসে। তিনি তাঁর কালজয়ী রচনা 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মধ্যে দিয়েই ঠিক এমনই এক বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চিত্রকে তুলে ধরেছেন।[৭৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' গল্প অবলম্বনে যে কাবুলিওয়ালাকে গল্পে দেখতে পাওয়া যায়, তিনি একজন সামান্য ক্ষুদ্র পেশার মানুষ ছিলেন। সুতরাং পেশাগত দিক থেকে তিনি যে ধরনের কাজের সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন, তা সমাজের প্রান্তবাসী মানুষের পেশার থেকে অভিন্ন ছিল না। কাজেই রবীন্দ্র-পরবর্তী সময়ে থেকে আজকের সময় পর্যন্ত কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পেশাগত জীবন থেকে উপলব্ধ হওয়া যায় তাঁরা যে 'প্রান্তিক' স্তরের অন্তর্ধান জনগোষ্ঠী। এছাড়া কলকাতার অন্যান্য যত বিদেশি জনগোষ্ঠীর বসবাস আছে তাঁদের নিরিখে পেশাগত দিক থেকে কাবুলিওয়ালারা যেমন 'প্রান্তিক' জনগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত, তেমনই সামাজিক মর্যাদার দিক থেকেও তাঁরা 'প্রান্তিক' তবে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের প্রান্তিকতা শুধুমাত্র পেশাগত জীবন এবং সামাজিক মর্যাদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। তাঁদের ব্রাত্য জীবনের একাধিক ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে 'প্রান্তিকতার' চিত্র প্রকাশিত হয়। তাত্ত্বিকেরা মনে করেন 'স্থানচ্যুত' (Displacement) শব্দটির সাথে 'প্রান্তিক' (Mirginility) শব্দের একটি গভীর যোগাযোগ রয়েছে। কারণ কোনও একটি বিশেষ স্থান থেকে 'স্থানচ্যুত' হয়ে যখন কোনও মানুষ বা জনগোষ্ঠী অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হন, নতুন স্থানে গিয়ে তিনি/তাঁরা একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হন।[৭৮] এই সংকট অনেক সময় তাঁদের প্রান্তিকতার কবলে ফেলতে বাধ্য করে। যেমনটি কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালারা আফগানিস্তান থেকে দেশান্তরিত হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, এমনকী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যেও তাঁরা একাধিকবার স্থানান্তরিত হতে থাকেন। এই নিত্য স্থানান্তর তাঁদের জীবনে সংকট ডেকে এনেছে প্রতিমুহূর্তে। ফলে বাধ্য হয়েছে প্রান্তিকতার মুখে পড়তে। কাজেই কাবুলিওয়ালাদের জীবনে প্রান্তিকতা কিভাবে তাঁদের আর্থ-সামাজিক জীবন থেকে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপরে আছড়ে পড়ে নিম্নে তা আলোচনার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে কাবুলিওয়ালারা কলকাতার অন্যান্য বিদেশি জনগোষ্ঠীর নিরিখে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে খানিকটা পিছিয়ে রয়েছে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকার কারণ তাঁদের পেশাগত জীবনের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব এবং পরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে না পারার ব্যর্থতা। কাজেই সামাজিক দিক থেকে অন্যান্যদের

থেকে কাবুলিওয়ালাদের মর্যাদা খানিকটা অনগ্রসর। তাঁদের এই সামাজিক অনগ্রসরতার পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। যেমন, কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে সমাজে নানা রকমের ভ্রান্ত ধারণা পূর্ব থেকেই রয়েছে, আধুনিক শিক্ষার দিক থেকে আফগান কাবুলিওয়ালারা শত যোজন পিছিয়ে ছিল এবং দীর্ঘদিন কলকাতাতে বসাবাস করার পরেও কাবুলিওয়ালারা নিজেদেরকে কলকাতার মধ্যে মেলে ধরতে পারেননি। নিজেদের সামাজিক জীবনকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করতে না পারার সমস্যা তাঁদের প্রান্তিক অবস্থার মধ্যে পড়তে বাধ্য করেছে। কলকাতার চিনা, আর্মেনিয়ান, জিউস, পার্সি, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীর মানুষরা নিজেদের ধর্মীয় উপাসনালয়, শিক্ষাকেন্দ্র, ক্লাব প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও, আফগানরা সামাজিক জীবনে তেমন কিছুই দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারেননি। তাই কলকাতার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষদের নিয়ে চর্চা ও চর্যার জায়গা প্রতিষ্ঠিত হলেও, কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে তেমন কোনও ইতিহাস গড়ে ওঠেনি, বরং যতটুকু পরিসরে আফগানদের কথা উঠে উঠেছে তা নিছক তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। অথচ সুদূর সেই প্রাচীন কাল মধ্যযুগের ইতিহাসে বাংলার সঙ্গে আফগান যোগাযোগের উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। সুতরাং কাবুলিওয়ালাদের 'প্রান্তিক' অবস্থার মধ্যে অবতীর্ণ হওয়ার পিছনে একদিকে যেমন তাঁদের নিজেদের দায় রয়েছে। অন্যদিকে তেমনই রাষ্ট্রীয় পরিকাঠাম অনেকাংশে দায়ী।

২.৭. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের আত্মপরিচয়ের সংকট

আত্মপরিচয়ের সংকট মানব জীবনের অন্যতম একটি কঠিন পর্যায়, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'Identity Crisis'। যখন কোনও বিপদগামী মানুষ বা গোষ্ঠী বিভিন্ন কারণে তাঁর বর্তমান পরিচয় সংকটের মধ্যে পড়ে বা প্রশ্ন চিহ্নের মধ্যে পড়ে, তখন বুঝতে হবে তিনি আত্মপরিচয়ের সংকটের মধ্যে পড়েছেন।[৭৯] আত্মপরিচয়ের এই সংকটের পিছনে নানা কারণ রয়েছে। মানুষ তাঁর জন্মপরিচয়, পারিবারিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থান, ভৌগোলিক অবস্থান এমনকী অর্থনৈতিক কারণ ও রাষ্ট্রীয় পরিচয়জনিত এমন অনেক অসংখ্য কারণে আত্মপরিচয়ের সংকটের মধ্যে পড়তে পারেন। এই সংকট মানুষ ইচ্ছে করলেই উপেক্ষা করতে পারেন না। কারণ এটি একটি আরোপিত সংকট, ফলে মানুষের নিজের হাতে কিছুই থাকে না, পুরোটাই নির্ভর করছেন যিনি বা যাঁরা আত্মপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁদের উপরে। উত্তর-ঔপনিবেশিক কালপর্ব থেকে শুরু করে একবিংশ

শতাব্দীতেও এই সমস্যা আরও বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। বিশেষত রাষ্ট্রবিপ্লব থেকে শুরু করে অভিবাসন, ডায়াস্পোরা, উদ্বাস্তু ইত্যাদি কারণে মানুষ যখন অন্যদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রান্তিক হয়ে পড়েছেন তখনই তাঁদের 'আত্মপরিচয়ের সংকট' তৈরি হচ্ছে। আর তখন থেকেই শুরু হয় পরিচয়হীনতার সংকট।

আত্মপরিচয়ের সংকট এবং পরিচয়হীনতার সমস্যা বর্তমানে সারা পৃথিবীতে অন্যতম প্রধান সমস্যা। কারণ অভিবাসনজনিত সমস্যার কারণে সারা পৃথিবীতে অসংখ্য জনগোষ্ঠীর মানুষ ঘর হারিয়ে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। তবে মানুষ যে শুধুই অভিবাসনজনিত কারণে আত্মপরিচয়ের সংকটের সম্মুখীন হচ্ছেন তা নয়। আরও একাধিক কারণে মানুষের জীবনে আত্মপরিচয়ের সংকট দেখা দিতে পারে। যেমন কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। কলকাতাতে বসবাসরত আফগান কাবুলিওয়ালাদের জীবনে আত্মপরিচয়ের সংকট ও সমস্যার পিছনে যে কারণগুলি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল গবেষণা সন্দর্ভের উক্ত অংশে সেই বিষয়ের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে।

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের আত্মপরিচয়ের সংকটের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ অভিবাসনজনিত সমস্যা। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই আরও একাধিক সমস্যার মধ্যে তাঁরা জড়িয়ে পড়ে। কাবুলিওয়ালাদের আত্মপরিচয়ের সংকটের প্রাথমিক পর্ব শুরু হয় ঔপনিবেশিক আমল থেকেই, পরবর্তীকালে যেটি আরও ত্বরান্বিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালাদের কলকাতাতে আগমন এবং বসবাসের ক্ষেত্রে তেমন কোনও সমস্যা ছিল না। আফগানরা সড়কপথে অথবা রেলপথে পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতেন। ফলে ভারতে প্রবেশ করার জন্য তেমন কোনও সরকারি নথিপত্রের প্রয়োজন হত না। স্বাভাবিকভাবে তাঁরা সঙ্গে করে তেমন কোনও নথিপত্র নিয়ে আসতেন না। তবে উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে ভারত সরকার বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট নথি প্রমাণের নির্দেশ জারি করলে অনেকেই দেশে ফিরে যান, অনেকেই আবার দেশে ফিরতে না পেরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে থেকে যান। পরবর্তীকালে তাঁরা ভারতের গোয়েন্দা দপ্তরের হাতে ধরা পরলে, অনেকের সাজা হয় এবং অনেকেই ভারতে বসবাসের কাজপত্র

নবিনীকরণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এর ফলে পরিচয়হীনতার দোলাচলের মধ্যে দিয়ে তাঁদেরকে কয়েক দশক চলে যায়।

তবে পরিচয়হীনতার আসল সংকট শুরু হয় বিংশ শতকের আশির দশকের পর থেকে। তখন থেকে বর্তমান সময়ে কলকাতার বুকে এমন অনেক কাবুলিওয়ালা রয়েছে যাঁরা পরচিয় জানতে চাইলে আফগান হিসাবেই নিজেদের পরিচয় দেন, কারণ এঁদের অনেকের আছে না আছে জন্ম সার্টিফিকেট, না আছে পাসপোর্ট, না আছে ভিসা, না আছে ভোটার কার্ড। ফলে একমাত্র পরিচয় এরা আফগান। কাজেই কোনওভাবেই প্রমাণ করার সুযোগ নেই যে তাঁরা ভারতের নাগরিক, আবার এটাও প্রমাণ করার সুযোগ নেই এরা আফগানিস্তানের নাগরিক। স্বাভাবিকভাবে এঁদের জীবনে নেমে এসেছে 'আত্মপরিচয়ের' সংকট। সাম্প্রতিককালে ভারতে নাগরিকত্ব আইন (NRC) চালুর প্রসঙ্গ আফগানদের ভারতে বসবাসের অধিকারকে প্রশ্ন চিহ্নের মাঝে দাঁড় করিয়েছে। নাগরিকত্ব হীনতার এই ভয়ে তারা অনেকেই আজ ভীত।

কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে সাধারণ মানসপটের এই ধারণা একেবারে শুরুর দিকে যেমন ছিল, পরবর্তী সময়ে সেই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। কারণ পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তান দেশটি যে সমস্ত ঘটনা এবং কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছে তাতে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। আফগানিস্তানের অন্তঃদেশীয় অবস্থার যত অবনতি হয়েছে, ততই সমস্যাতে পড়েছে আফগান অভবাসিত মানুষ, ততই তাঁরা পরিচয় হারিয়েছেন এবং আত্মপরিচয়ের সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। আফগানিস্তানে তালিবান শক্তির আগ্রাসনের পর থেকেই আফগান উপকথার ইতিহাস হারিয়ে যায়, তাঁদের গৌরব গাঁথা বিজয়ের ইতিহাস পদদলিত হয় এক লহমায়, সঙ্গে নির্মাণ হয় এক কলঙ্কিত অধ্যায়। যার শুরু সেই মুজাহিদিন পর্ব থেকেই। এই সময় থকেই কলকাতার সাধারণ মানুষ কাবুলিদেরকে একটু অন্যচোখে দেখতে শুরু করেন। এছাড়া কলকাতার কাবুলিরা অনেকেই মহাজনি কারবারের সঙ্গে যুক্ত, ফলে তাঁরা প্রায়শই একাধিক সমস্যাতে জড়িয়ে পড়েন, ফলে কাবুলিওয়ালা গল্পের রহমতের সঙ্গে অনেক বাঙালি বর্তমানে আমির খানদের মিলিয়ে ফেলেন আর এখান থেকেই শুরু হয় তাঁদের পরিচয়হীনতা এবং অস্তিত্বের সংকট।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে বেশ কতকগুলি বিরূপ ঘটনা কাবুলিওয়ালাদের আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে সংকট তৈরি করেছে। প্রথমত- বাঙালি লেখিকা সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কাবুলিওয়ালাকে ভালোবেসে আফগানিস্তানে পাড়ি দেওয়া এবং পরবর্তীকালে তালিবানদের হাতে তাঁর মৃত্যু, দ্বিতীয়ত- আফগানিস্তানে তালিবান শক্তি ক্ষমতাতে আসার পর থেকে কলকাতার সাধারণ মানুষ আফগান কাবুলিওয়ালাদেরকে একটু ভয়ের চোখে দেখতে শুরু করেন। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এঁদের নিয়ে একটা ভয়ের রেশ তৈরি হতে থাকে। সর্বোপরি ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের নায়ক রহমত বাঙালি পরিবারের ছোট্ট মেয়ে মিনির মধ্যে যেমন নিজের মেয়ের মুখ দেখতে পেয়েছিলেন, এতে একদিক দিয়ে যেমন তাঁর মানবিক দিকের প্রকাশ পেয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই একজন সাধারণ মানুষকে ঋণের দায়ে ছুরি দিয়ে আঘাত করার মতো ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহমতের জেলযাত্রা বাঙালি পাঠকের মনের মধ্যে চিরকাল রয়ে গেছে। কাজেই কাবুলিওয়ালাদের জীবনে একাধিক ঘটনা তাঁদেরকে কলকাতার সমাজ জীবনে ‘আত্মপরিচয়ের সংকটের’ মধ্যে ফেলতে বাধ্য করেছে।

২.৮. আত্মপরিচয়ের সন্ধানে আফগানিস্তানে বাঙালি নারী জীবন

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের আত্মপরিচয়ের সংকটের পাশাপাশি আফগানিস্তানেও বাঙালি নারী জীবনের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। যাঁদের কথা কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে আলোচনায় সমান প্রাসঙ্গিক। ভারতবর্ষ তথা কলকাতার নারীরা আফগান কাবুলিওয়ালাদের সাথে প্রণয় সম্পর্কে অবদ্ধ হয়ে দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানের জীবন বেছে নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। এই সব নারীদের মধ্যে অনেকেই বছরের পর বছর আফগানিস্তানে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন অতিবাহিত করছেন, আবার অনেকেই সম্মুখীন হয়েছেন বিভিন্ন ধরনের সমস্যায়। আসলে প্রাথমিক স্তরে আফগানিস্তানের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে তাঁরা এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এর ফলে এঁদের অনেকের জীবনে নেমে এসেছে দুর্দশা। উক্ত গবেষণা সন্দর্ভে এমন কয়েকজন নারীর উপরে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে যাঁরা আফগানিস্তানে জীবন অতিবাহিত করে চলেছেন। এঁরা আফগানিস্তানের মাটিতে নিজেদের

অস্থিরতার কথা প্রকাশের সঙ্গে নিজেদের 'আত্মপরিচয়ের সংকটের' কথা প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ভাবে।

আফগানিস্তানের বর্ণময় ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র অধ্যায়। এই ইতিহাসে একদিকে যেমন আফগানদের বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনই তাঁদের গরিমা বিলুপ্ত ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনাকে সামনে রেখে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই ভূ-পর্যটক রমানাথ বিশ্বাসের লেখা 'আফগানিস্থান' নামক গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে আফগানিস্তান সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য পেয়ে থাকি। যেখানে তিনি লিখেছেন আফগানিস্তানে বসবাসরত একজন বাঙালি রমণীর কথা, যিনি এই বাংলাদেশের কন্যা, যাঁরা নাম লক্ষ্মী।[৮০] লেখকের সঙ্গে লক্ষ্মীর আলাপ হয় আফগানিস্তানের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে, লেখক রমানাথ বলেছেন তিনি যখন আপনমনে বাঙলা ভাষায় কথা বলছিলেন তখন এই লক্ষ্মী নামের মেয়েটি তাঁর কাছে এসে পরিচয় জানতে চান। এই লক্ষ্মী ছিলেন বাংলা দেশের হিন্দু পরিবারের মেয়ে। মেওয়া বিক্রি করবার জন্যে একজন পাঠান প্রায়শই বাংলাদেশে যেতেন, সেখানেই একজন ভদ্রলোক লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর বিয়ের বন্দোবস্ত করেন। লেখক এই সমস্ত কথা জানতে পারেন লক্ষ্মীর স্বামীর সঙ্গে কথা বলার পরে, লক্ষ্মীর স্বামী তাকে আরও জানান, আঠারো বছর পূর্বে তিনি লক্ষ্মীকে কলকাতায় বিয়ে করেছিলেন। লক্ষ্মী বাঙালির মেয়ে, তিনি লক্ষ্মীকে চুরি করে আনেননি। হিন্দু মতেই তাঁদের দু'জনের বিয়ে হয়।[৮১] এখন তাঁদের দুটি ছেলে-মেয়ে। পাঠান লোকটির স্ত্রী লক্ষ্মী বাঙালি বলেই তিনি বাঙালিকে ভালোবাসেন। তবে লেখক লক্ষ্মীকে যখন জিজ্ঞেস করেছিল এখানে তুমি কেমন আছো? তখন লক্ষ্মী উত্তর দিয়েছিল 'সব কিছু মানিয়ে নিতে হয়েছে। একবার যখন এসে পড়েছি তখন তো আর ফেরার পথ নেই! তবে এই পাঠান আমাকে খারাপ রাখেনি, আমি বেশ ভাল আছি, আমার দুই সন্তান তাঁদের নিয়েই আমার সুখের সংসার। সুজলা সুফলা বাংলাদেশের একটি কোমলিনী বধূ শুষ্ক কর্কশ পাঠানকে স্বামীত্বে বরণ করে তাঁর গৃহকে আপন করে নিয়েছেন।'[৮২]

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় দেখতে পেয়েছি। যিনি আফগানিস্তানকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ' নামক গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে তিনি আফগানিস্তানের কথা তুলে

ধরেছেন। তাঁর লেখা এই গ্রন্থে আফগানিস্তানের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এবং আফগানিস্তানের ভালো-মন্দ দিক তুলে ধরেছেন।[৮৩] লেখার মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন আফগানিস্তানের সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারী হিসাবে কীভাবে তিনি অপমানিত হয়েছেন এবং জীবন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন। জাম্বাজ নামের কাবুলিওয়ালার সঙ্গে প্রণয়ঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন গ্রন্থে। কাবুলিওয়ালাকে ভালোবেসে বিয়ে করে আফগানিস্তানে পাড়ি দিয়ে তাঁর অবস্থা কেমন হয়েছিল সে বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন জাম্বাজকে ভালোবাসার পরিণতি কি হয়েছিল। তিনি জাম্বাজের সঙ্গে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তবে সেখানে যাওয়ার পর থেকে জাম্বাজের আসল রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। সুস্মিতা আগে থেকেই জানতেন না জাম্বাজ বিবাহিত এবং আফগানিস্তানে যাওয়ার পরে তিনি এই দৃশ্য নিজের চোখে দেখতে পেয়ে রাগে, ঘৃণায় এবং অস্থিরতায় ভেঙে পড়েন। কারণ জাম্বাজ যে ভালোবাসার অভিনয়ে ভুলিয়ে তাকে প্রতারিত করেছে তা সুস্মিতার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন আফগানিস্তান সম্পর্কে ভালোলাগার বোধ তৈরি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা-র রহমতের চরিত্রের কারণে। কিন্তু আজ সেই রহমতের দেশটা আতঙ্কের মতো লাগে। মনে হয় এটা কি রহমতের দেশ? এই দেশেই কি থাকত রহমতের মেয়ে?[৮৪]

সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যে এমন একাধিক বাঙালি মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে সুস্মিতার মতই একজন একজন পাঠানকে ভালোবেসে আফগানিস্তানে এসেছিলেন। তাঁর নাম কাকলি, এই কাকলির জীবনও সুখের হয়নি। সুস্মিতা লিখেছেন- কাবুলে থাকাকালীন এই রকম অনেক বাঙালি মেয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে, যাঁরা তাঁর মতো জীবনের রঙিন স্বপ্ন দেখে আফগানিস্তানে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে কাকলি যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে জোবেদা, নুরজাহান, কমলা, যশোদা, হারানি, সবিতা, মানসী ইত্যাদি।[৮৫] এই সব নারীদের মধ্যে জোদেবা তাঁর চার মেয়েকে নিয়ে কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন, হারানি নামের মহিলা বর্তমানে অনেকটা বৃদ্ধ অন্যদের চেয়ে, নুরজাহান খ্রিস্টান মেয়ে, লরেটোতে পড়তেন, কলকাতাতে তাঁর বাবার সোনার দোকান

ছিল। এঁরা প্রত্যেকেই হয়তো আফগানিস্তানে বাকি জীবন অতিবাহিত করে কাটিয়ে দেবেন।[৮৬] এই রকম কত মেয়েই না রয়েছে আফগানিস্তানের ধূসর মরুভূমিতে। যাঁদের সন্ধান হয়তো আমরা পেয়ে উঠি না। তবে আফগানিস্তানের মাটিতে যে নারী স্বাধীনতার লেশ মাত্র নেই সেকথা জানা যায় লেখিকার কলম থেকে।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে কলকাতাতে যত আফগান জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ আফগানিস্তানের দক্ষিণে অবস্থিত পাকতিয়া প্রদেশের বাসিন্দা।[৮৭] তাই পাকতিয়া অঞ্চলেই সবথেকে বেশি বাঙালি মেয়েদের দেখা মেলে। এঁরা সকলেই প্রায় কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে দেশ ছেড়েছেন। 'কাবুলের পথে পথে' গ্রন্থে লেখক পান্থজন দেখিয়েছেন এমনই একটি মেয়ের কথা, যার নাম আমিনা। এই আমিনার আসল নাম রুমা মৈত্র, আফগানিস্তানে এসে নাম পরিবর্তন করে রুমা থকে আমিনাতে রূপান্তরিত হয়েছে। আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের এক আফগান ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে করে আফগানিস্তানে চলে এসেছিলেন আজ থেকে প্রায় সতের বছর আগে। বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চুঁচুড়াতে। ১৯৮০ সালে ধানবাদের মেডিকেল কলেজে পড়তে পড়তে আফগান ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রেমে পড়েন রুমা, তারপর ১৯৮৬ সালে বাড়িঘর ছেড়ে পাকাপাকিভাবে আফগানিস্তানে চলে আসেন।[৮৮] আমিনার কথা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন, এই পাকতিয়া অঞ্চলে বাংলা জানা শুধু রুমা মৈত্র ওরফে আমিনার মতো মেয়েরা নেই, আছে আরও অনেক বাঙালি মেয়ে। যাঁরা বেশিরভাগ নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়কে আড়াল করে বেঁচে রয়েছেন আফগানিস্তানের মাটিতে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আত্মপরিচয়ের সংকটের সম্মুখীন হয়ে কোনও রকমে বেঁচে থাকার লড়ায়ে নিমজ্জিত আছেন তাঁরা। এই সমস্ত বাঙালি মেয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই কলকাতাতে আসা আফগানদের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বেছে নিয়েছেন আফগানিস্তানের জীবন।

যদিও এই স্বল্প পরিসরের কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সব কিছুর সিদ্ধান্তে আসা কঠিন, তবুও বলা যায় কাবুল দেশে বাঙালি মেয়েরা ভালো নেই। আমরা আদৌ জানতে পারি না সুস্মিতার মতো এমন কত মেয়ে রয়েছেন, যাদের কথা হয়তো আমাদের কানে

এসে পৌঁছায় না। কাজেই এই আফগানিস্তান দেশটি নিয়ে আজও কত মানুষের কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা, কত ধোঁয়াশা তার কোনও অন্ত নেই।

২.৯. সাহিত্যে কাবুলিওয়ালাদের আত্মপরচয়ের সন্ধান ও আফগান সমাজ

সাহিত্য এবং ইতিহাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন- "কোনও দেশ বা জাতির অর্ধ-জাগ্রত ক্রমাস্ফুরিত, চেতনা ও প্রচলন সাহিত্যের মাধ্যমেই ধরা দেয়। যা কিছু শ্রুত, অলিখিত, যা কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার, এমনকী জনশ্রুত কিংবদন্তি অর্থাৎ যাঁর মধ্যে জাতীয় সত্তার ও চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, সেই সব জিনিসই ব্যাপক অর্থে ইতিহাস।" কবি এই সমস্ত মালমসলা 'রূঢ়দ্রব্য 'হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই 'রূঢ়দ্রব্য' বিদেশে ঘুরে ঘুরে পণ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত হয়ে ফিরে এলেই তার মর্যাদা এবং মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। নাহলে তাদের কদর হয় না। তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন সাধারণত চলিত অর্থে যাকে ইতিহাস বলা হয়। কবি তার থেকে গভীরে গিয়ে হেলায় ছড়ানো সাহিত্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অগোচরে জাতীয় ঐতিহ্য ও স্মৃতিকে প্রকৃত ইতিহাস বলে সমাদর জানিয়েছিলেন।[৮৯]

ইতিহাস এবং সাহিত্য যে একে অপরের পরিপূরক সেই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর নিজের মতামতো প্রকাশ করেছেন, তেমনই তিনি নিজেই সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর লেখার মধ্যে বারে বারে উঠে এসেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট থেকে স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাস। এছাড়া সামাজিক কৌলীন্যে নিম্নবর্ণের মানুষের কথাও তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীতে। এক্ষেত্রে সামাজিক পদমর্যাদায় সমাজের নিচু স্তরের জনগণ, পেশাগত দিক থেকে অন্তর্ধান জনগোষ্ঠী, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দিক থেকে গৌণ জনগোষ্ঠীর কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন সাহিত্য, কাব্য, নাটক, কবিতার মধ্যে দিয়ে। তিনি বারে বারে তুলে ধরেছেন সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা এবং সামাজিক লড়াইয়ের প্রসঙ্গ। ১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'কাবুলিওয়ালা' গল্প রচনার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সমাজে মিশে থাকা আফগান কাবুলিওয়ালাদের প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন।[৯০]

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের প্রসঙ্গে সাহিত্য রচিত হলেও সরাসরি কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে তেমন কোনও আকর গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তবে অল্প কয়েকটি গ্রন্থে কাবুলিওয়ালা বিষয়ে কিছু খণ্ড খণ্ড তথ্য উঠে আসে। এক্ষেত্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'পথ চল্‌তি' নামক গল্পের মধ্যে কাবুলিওয়ালাদের প্রসঙ্গ উঠে আসে। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে তিনি এই গল্পের মধ্যে দিয়ে আধুনা বাংলাদেশের বরিশালের পাটুয়াখালিতে কাবুলিওয়ালাদের বসতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এই গ্রন্থে সুনীতি বাবু দেখিয়েছেন 'কাবুলিওয়ালারা' দল বেঁধে ট্রেনে চড়ে বরিশালের দিকে রওনা দিচ্ছিলেন। তাঁরা নাকি পটুয়াখালির স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন, সুদের কারবারি ছিল তাঁদের মূল ব্যবসা। এরা বাংলা ভাষা বলতে না পারলেও, বরিশালের ভাষায় অগাধ দখল ছিল। এই সমস্ত কাবুলিওয়ালাদের কয়েক প্রজন্ম বরিশালেই বসবাস করছেন।[৯১]

তবে এর বাইরে বাংলা সাহিত্যে কাবুলিওয়ালা বিষয়ে যে সমস্ত রচনা রচিত হয়েছে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেখক/লেখিকাদের আত্মজীবনী এবং ভ্রমণ সাহিত্যে মূলক লেখার মধ্যে দিয়ে কাবুলিওয়ালাদের কথা উঠে এসেছে। তবে রবীন্দ্রনাথে লেখা কাবুলিওয়ালা গল্পটি এতটাই জনপ্রিয় ছিল তা স্কুলপাঠ্যের বিষয় থেকে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এই গল্পের অনুবাদ প্রাকশিত হয়েছে। ঠিক এমনি একটি অনুবাদ সিস্টার নিবেদিতা (Marget Noble) নামের একজন আইরিশ ১৯১০ সালে কাবুলিওয়ালা গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'The Cabuliwllah'। গল্পটি ১৯১১ সালে 'The Modern Review' নামের একটি জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকাতে সম্পাদক রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজিতে অনুবাদ হওয়া এই গল্পে রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু পত্রিকাতে কাবুলিওয়ালার একটি ছবি চিত্রিত করেছিলেন।[৯২]

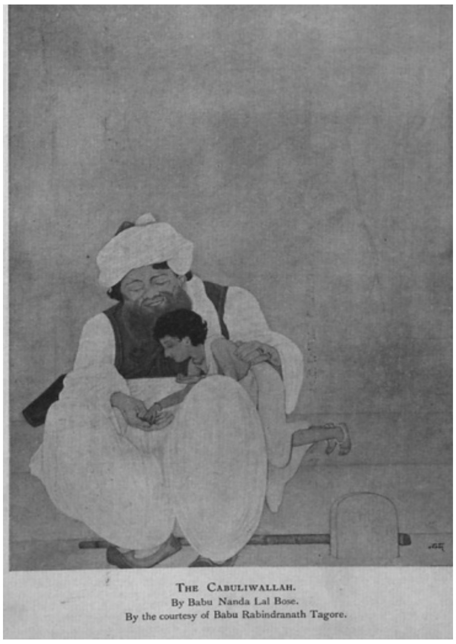

সূত্র: THE CABULIWALLAH, (Nandal Basu, The Modern Review a monthly Review and Miscellany 1911)

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের রচনার পরে প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে আফগানদের নিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা 'দেশে বিদেশে' গল্পেও উঠে আসে আফগানিস্তানের কথা। তিনি আফগানিস্তানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৯২৭ সালে থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি আফগানিস্তানে ছিলেন। তার আফগানিস্তানে থাকার এই সময়পর্বে যেভাবে আফগানিস্তানকে দেখেছিলেন তার বর্ণনা করেছেন। আফগানিস্তানে যাওয়ার আগে সম্ভবত তিনি কাবুলিওয়ালা গল্পটি পড়ে ফেলেছিলেন। ফলে খানিকটা রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পের কাউন্টার দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন 'খোদ কাবুলিরা কেন কলকাতাতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসবেন'।

রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় ঘটে, আজ থেকে কয়েক বছর আগে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ' (১৯৯৮) নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরে বাঙালি সমাজে কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে আলোড়ন পড়ে যায়।[৯৩] জাম্বাজ নামে এক কাবুলিওয়ালার প্রেমে পড়েন লেখিকা সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রেম পরিণয়ে প্রকাশ পেয়েছিল জাম্বাজের সঙ্গে বিবাহ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। সুস্মিতা দেবীর বিবাহের পরেই আফগানিস্তানে চলে আসেন, তারপর শুরু হয়

নতুন জীবন। এই গল্পের মধ্য দিয়েই তিনি তুলে এনেছিলেন আফগানদের কথা। তাঁর বর্ণনাতে ভণ্ড, দুর্দশাগ্রস্থ এবং ধর্মান্ধ আফগানিস্তানের কথা তুলে ধরেছেন। সঙ্গে কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালা জাম্বাজের পরিবার পরিজন এবং আফগান সমাজের অনেক দিক তুলে ধরেছিলেন এখানে। মানুষ কত নিষ্ঠুর হতে পারে তা তিনি 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ'-তে দেখিয়েছেন। তবে লেখিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তিক্ততা নিয়ে যা লিখেছেন তাঁর সবটা বর্তমানে কলকাতার কাবুলিদের মধ্যে দেখা যায় না। কারণ কলকাতাতে এমন অনেক কাবুলি রয়েছে যাঁরা অনেকেই বাঙালি মেয়েদের বিয়ে করে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছেন। রমানাথ বিশ্বাসের 'আফগানিস্তান ভ্রমণ'[৯৪] নামক গ্রন্থে সে কথা ফুটে ওঠে। রমানাথ দেখিয়েছেন আফগানিস্তানে এমন অনেক বাঙালি মেয়েরা রয়েছেন যাঁরা ভালোভাবে সেখানে দিন কাটাচ্ছেন। তবে লেখিকা সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা অমূলক নয়। তিনি নিজের জীবন দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তালিবানরা যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে।

২.১০. ভারতীয় চলচ্চিত্রে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পরিচয়

ভারতীয় চলচ্চিত্রের যত ঘরানা রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি জনপ্রিয় ঘরানা হল সাহিত্যকে কেন্দ্র করে সিনেমা নির্মাণ। কোনও সাহিত্যিক বা গল্পকারের লিখে যাওয়া কোনও কালজয়ী 'উপন্যাস' বা 'গল্প'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছবির সংখ্যা ভারতীয় সিনেমাতে অপ্রতুল নয়। হিন্দি সিনেমাতে তো বটেই, বিশেষ করে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এমন ছবির সংখ্যা অসংখ্য। সাহিত্যকে কেন্দ্র করে গল্প অবলম্বনে সৃষ্ট শিল্প খুব সহজে মানুষের মধ্যে পৌঁছে যায় দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে। তাই ছবির পরিচালকরা বার বার ছবি বানানোর ক্ষেত্রে নির্ভর করেছে বিখ্যাত এবং কালজয়ী গল্পগুলির উপরে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সিনেমা কুশীলবরা যেমন বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়েছেন আবার একই সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছে বিশ্বের দরবারে। এমনই একটি বিখ্যাত গল্প অবলম্বনে ষাটের দশকে নির্মাণ হয়েছিল একটা কালজয়ী সিনেমা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'কাবুলিওয়ালা' গল্প অবলম্বনে ১৯৫৭ সালে তপন সিংহ নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত বাংলা সিনেমা 'কাবুলিওয়ালা' (Kabuliwala)।[৯৫] ছবিতে কাবুলিওয়ালার নাম ভূমিকায় অর্থাৎ রহমতের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাস।

ছোট্ট মিনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ঐন্দ্রিলা বিশ্বাস। ছবিটা এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে ১৯৫৬ সালে শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেছিলেন।[৯৬] পরবর্তীকালে কাবুলিওয়ালা গল্পের উপরে নির্ভর করে ১৯৬১ সালে হেমেন গুপ্তের নির্দেশনায় 'কাবুলিওয়ালা' ছবিটি হিন্দি ভাষায় নির্মাণ হলে সেখানে 'রহমত'-এর ভূমিকাতে অভিনয় করেন অভিনেতা বলরাজ সাহানি। অভিন্ন ভাষায় নির্মাণ এই দুটি ছবির বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের মূল গল্প অবলম্বনেই তৈরি হয়েছিল। একই গল্পের উপরে ভিত্তি করে জনপ্রিয় পরিচালক অনুরাগ বসু কয়েকটি পর্বে দর্শকদের দেখিয়েছিলেন, যেটি টেলিভিশনে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[৯৭]

সিনেমা এবং সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে কাবুলিওয়ালারা আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই কাবুলিওয়ালা গল্পের জনপ্রিয়তা শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল সুদূর আফগানিস্তানেও। সাম্প্রতিক নাজেস আফরোজ এবং প্রয়াত আফগান প্রেসিডেন্ট নাজিবুল্লাহর কন্যা মোজসা নজিব কলকাতার আফগানদের নিয়ে একটা তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। সেটা যখন কলকাতা সহ কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখানো হলে আফগানরা যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছিল।[৯৮] তাঁরা কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবন-জীবিকার উপর নির্মিত তথ্যচিত্র দেখেই বুঝতে পেরেছেন, কাবুলিওয়ালাদের জীবনের সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের পূর্বেকার স্মৃতি। সুতরাং ভারতীর চলচ্চিত্রে একদিকে যেমন 'কাবুলিওয়ালা' সিনেমার মধ্যে আফগানিস্তানের সংস্কৃতির একটা দিক ধরা পড়ে, তেমনই উঠে আসে কলকাতার মহানগরে একজন বিদেশি মানুষের জীবনের কথা। খুব ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও আফগান সমাজের ভিতরে চলে আসা কিছু কিছু ঘটনার প্রতিফল দেখা যায় এই ছবিতে। আবার একইভাবে ভারতে নির্মিত এমন অনেক চলচ্চিত্র রয়েছে যাঁর মধ্যে দিয়েও আফগানিস্তানের সমাজ জীবনের নানা ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায়। একাধিক হিন্দি ছবিতে আফগানিস্তানের রুক্ষ মাটির কাহিনি উঠে আসে। ১৯৯২ সালে মুক্তি পেয়েছিল এমনই একটি ছবি যেখানে অমিতাভ বচ্চন এবং শ্রীদেবী অভিনয় করেছিলেন, ছবির নাম 'খুদা গাওয়া' (১৯৯২)।[৯৯] পরিচালক মুকুল এস আনন্দের নির্দেশনায়। ছবিতে দেখানো হয়েছিল আফগানিস্তানের জাতীয় খেলা 'বাজকাশি' খেলার মধ্যে দিয়ে কীভাবে আফগানরা

ঘোড়ায় চড়ে মৃত পশুর দখল নেয়। ছবিটি ভারত এবং আফগানিস্তানে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ছবিতে আফগান সমাজের নানা দিক উঠে এসেছিল। কলকাতার কাবুলিওয়ালা আমির খান সাহেবের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি 'খুদা গাওয়া' ছবি প্রসঙ্গ উঠে আসলে তিনি বলেন এই ছবি তাঁর নিজের খুব প্রিয়। উনি নিজে কখনও আফগানিস্তানে যাননি, কাজের এই ছবিতে আফগানিস্তানের দৃশ্য দেখতে পেয়ে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। আসলে আফগানিস্তানে ভারতীয় হিন্দি সিনেমার জনপ্রিয় বাজার রয়েছে, যে কথা অভিতাভ রায় তার 'কাবুলনামা' গ্রন্থে জানিয়েছেন দৃঢ়ভাবেই।[১০০]

২০০৩ সালে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ' গল্প অবলম্বনে পরিচালক উজ্জ্বল চ্যাটার্জি বানিয়েছিলেন 'এসকেপ ফ্রম তালিবান'[১০১] (Escape from Taliban) নামে একটা হিন্দি ছবি। ছবিটি লেখিকা সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের বাস্তব জীবন কাহিনির উপরে লেখা হয়েছিল। ছবির গল্পে উঠে এসেছিল এক বাঙালি মেয়ের আফগানিস্তানে পাড়ি দেওয়ার গল্প, এক কাবুলিওয়ালাকে ভালোবেসে সংসার করার আখ্যান। কিন্তু সেই মেয়ের উপরে নেমে এসেছিল অকথ্য অত্যাচার। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পেরে ওঠেননি তালিবান শাসনের সঙ্গে। ফলে তাঁর মূল্য চোকাতে হয়েছিল তালিবানদের হাতেই তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। ছবিটিতে মুখ্য ভূমিকাতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী মনীষা কৈরালা। এরপর ২০০৬ সালে পরিচালক কবির খানের পরিচালিত 'কাবুল এক্সপ্রেস'[১০২] (Kabul Express) ছবিতেও দেখা যায় তালিবান আক্রমণের সময়ে আফগানিস্তানে কীভাবে মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল ভয়ঙ্কর দিনগুলি। কবীরের এই ছবিতে ফুটে উঠেছিল আফগানিস্তানের সন্ত্রাসদীর্ণ চেহারার প্রতিচ্ছবি। ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেতা জন আব্রাহাম এবং আরশাদ ওয়ারসির মতো অভিনেতারা। ২০২০ সালে সঞ্জয় দত্ত অভিনীত 'তোরবাজ' (২০২০) ছবিতেও আফগানিস্তান সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য ওঠে আসে।[১০৩] ছবিতে দেখানো হয়েছিল আফগানিস্তানের শিশুদের শৈশব কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বারুদের গন্ধে। এরপর ২০১৮ সালে আফগানিস্তানের উপরে নির্ভর করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি নির্মাণ করেছিলেন পরিচালক দেব মেধেকর। ছবিটির নাম 'বায়োস্কোপওয়ালা' (২০১৭)।[১০৪] রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটি সিনেমা নির্মাণ করেন

পরিচালক। ছবিতে বায়োস্কোপওয়ালার ভূমিকাতে অভিনয় করেছেন ড্যানি ডেনজোপাং, যিনি রহমতের চরিতে অভিনয় করেছেন। আর মিনির চরিত্রে অভিনয় করেছেন গীতাঞ্জলী থাপা। ছবিটিতে বার বার যেন কাবুলিওয়ালার ফিরে আসার গল্প বলা হয়েছে।

১৯৫৭ সালে তপন সিংহ পরিচালিত কাবুলিওয়ালা চলচ্চিত্রের পোস্টার

সূত্র- https://bn.wikipedia.org/wiki

২.১১. পর্যবেক্ষণ

কলকাতার অভিবাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে জানা যায় জব চার্নকের সুতানুটি পদার্পণ থেকে কেটে গেছে তিনশো বছরের বেশি, দীর্ঘ এই সময় ধরে কলকাতা হয়ে উঠেছিল বিদেশিদের কাছে বাসভূমি। ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে বিদেশিরা বসতি স্থাপন করেছিলেন। তবে কলকাতার যে কসমোপলিটান চরিত্র রয়েছে তা সমৃদ্ধ হয়েছিল এই সমস্ত বিদেশি জনগোষ্ঠীর আহ্বানে। তাঁদের আগমন কলকাতাকে দিয়েছে নতুন রূপ। কলকাতার এই বহুত্ববাদী নাগরিক কোলাহলের মধ্যে এই সমস্ত অভিবাসিত বিদেশি জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি কলকাতাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছে শ্রেষ্ঠ গরিমায়। আজও কলকাতার আনাচে-কানাচে শহরের নীরবতায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিদেশিদের দ্বারা নির্মিত স্থাপত্য, কীর্তি, ভাস্কর্য এবং স্মৃতির ফলক। আর্মেনিয়ান গির্জা থেকে জিউস সেনেগন, চিনা বাজার

থেকে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের একটুকরো পুরনো বাড়ি, আফগান কাবুলির হিং থেকে আখরোট, এবং ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের স্মৃতি ফলক। যা কলকাতাকে করেছে গৌরবান্বিত। কলকাতা নানা জাতি, নানা দেশের মানুষের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বছরের পর বছর, শতকের পর শতক ধরে, যা আজও বহমান সভ্যতার মাঝ থেকে উঁকি মারে আর জিইয়ে রাখে তার অস্তিত্ব।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের অভিমুখে রওনা দিয়েছেন বহু জনগোষ্ঠীর মানুষ। আবার একই ভাবে ভারতবর্ষ থেকেও বহু মানুষ বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের এই ধরনের অভিগমন খুবই সাধারণ দৃশ্য। তবে এই ধরনের অভিগমনের পিছনে নানা কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা এই স্বাভাবিক অভিগমনকে কতকগুলি তত্ত্বের মধ্যে নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করেছেন। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে 'অভিবাসন' এবং 'ডায়াস্পোরা' অন্যতম। আবার একইভাবে অভিবাসন এবং ডায়াস্পোরার কারণে যাঁরা দেশান্তরিত হয়ে অন্যদেশে আশ্রয় গ্রহণ করছেন তারা 'প্রান্তিক' জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন, এরই সঙ্গে এই প্রান্তিক স্তরের মানুষ যখন আবার অন্যদেশে পরিচয়হীনতার সমস্যার মধ্যে পতিত হচ্ছেন তাঁদের 'আত্মপরিচয়ের সংকট' -এর মধ্যে পর্যভূষিত হচ্ছেন।

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সার্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে উপরের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে রয়েছে। প্রথমত অভিবাসন যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে ডায়াস্পোরার ধারণা। কারণ অভিবাসনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে, তার চেয়ে ডায়াস্পোরার বৈশিষ্ট্য অনেকটা প্রসারিত, অভিবাসনের ধারণার মধ্য দিয়ে সমস্ত অভিগমনকারী মানুষকে এক ছাতার নীচে আনা যাচ্ছিল না। কাজেই ডায়াস্পোরার উৎপত্তি ও ডায়াস্পোরা কথাটির নির্মাণ বা বিনির্মাণের মধ্যে যন্ত্রণার কারণে বিতাড়ন, খানিকটা বাধ্য হয়ে, স্বেচ্ছায় পেশার টান সহ ইত্যাদি কারণে 'ঘর হারানো' মানুষেরা ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠী হিসাবে আখ্যায়িত হতে থাকে। কাজেই ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠী হোক আর অভিবাসিত জনগোষ্ঠী হোক উভয়ই

যখন অন্য কোনও দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেখানে তাঁদের ‘প্রান্তিক জনগোষ্ঠী’ হিসাবে ‘আত্মপরিচয়ের সংকটের’ মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই সমস্যা তাঁদেরকে পরিচয়হীনতার সম্মুখে ফেলে। কাজেই তাঁদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট দেখা দেয়। বাংলা সাহিত্য থেকে সিনেমাতে কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে একাধিক আলোচনা হলেও, কাবুলিওয়ালারা কলকাতার সমাজে অবহেলিত হয়ে রয়ে গেছেন চিরকাল।

টীকা ও সুত্র নির্দেশ

১. কৃষ্ণ ধর: *কলকাতার তিন দশক,* (কলকাতা, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, ১৯৮৯), পৃ. ১।

২. বিশ্বনাথ জোয়ারদার: *অন্য কলকাতা,* (কলকাতা, অনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩), পৃ. ১১।

৩. P.C Bagchi*: Calcutta Past and Present,* (Calcutta, Calcutta University Press, 1939), পৃ. ৯।

৪. নিখিল সুর: *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* (কলকাতা, সেতু পাবলিশার্স, ২০১৫), পৃ.২০।

৫. *তদেব,* পৃ. ২১।

৬. বিনয় ঘোষ: *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত,* (কলকাতা, বাক্ সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৮), পৃ.পৃ. ১৬-১৭।

৭. Keya Dasgupta: *Mapping the Space of Minorities in Bancrsee,* Himadri Banerjee, Nilanjana Gupta, Sipra Mukherjee *(ed.): Calcutta Mosaic Essays and Interviews on the Minority Communities of Calcutta,* (New Delhi, Anthem press, 2012).

৮. বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: *সংবাদপত্রে সেকালের কথা,* (কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৪৯), পৃ. ৬৫২।

৯. A.K Roy: *Census of India,* (Calcutta, Bengal Secretariat Press, Vol. VII, 1901), পৃ. IV।

১০. M.K.A Siddique: *Muslims of Calcutta,* (Kolkata, Anthropological Survey of India, September 1974)।

১১. রাধারমণ মিত্র: *কলকাতা বিচিত্রা,* (কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯১)

১২. জোয়াকিম জোসেফ এ. ক্যাম্পোস, শানজিদ অর্নব (অনুঃ): *হিস্ট্রি অব দ্যা পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল,* (ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০১৮)।

১৩. রাধারমণ মিত্র: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৪।

১৪. মুহম্মদ আবদুল জলিল: *বঙ্গে মগ- ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার,* (ঢাকা, বাংলা আকাদেমী, ১৯৮৮)।

১৫. পার্থ সারথী সেনগুপ্ত: *পর্তুগিজ সমীক্ষা,* (এই সময়, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫)।

১৬. সাহানা জানা:*পর্তুগিজ সেটলারস ইন রুলার ওয়েষ্ট বেঙ্গল,* (মেদিনীপুর, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, নৃতত্ত্ব বিভাগ)

১৭. তিয়াস মুখোপাধ্যায়: *বাংলার বুকে পর্তুগীজিদের গ্রাম,* (দ্যা ওয়াল,২৯ অক্টোবর ২০১৯)।

১৮. আরিফ ইকবাল: *ইলিশ আর মিষ্টিতেই জয়ের উৎসব ভেতো পর্তুগিজদের,* (অনন্দবাজার, মহিষাদল, ১২ জুলাই ২০১৬)।

১৯. পীযূষ কান্তি রায়: *কলকাতার প্রতিবেশী,* (কলকাতা, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, কলকাতা পৌরসংস্থা, ২০০২), পৃ. ৫৩।

২০. *তদেব,* পৃ. ৫৮।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *সহজ পাঠ,* (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথামিক শিক্ষা পর্ষদ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩৩৭)।

২২. রাধারমণ রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৩।

২৩. অলোক রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪২২।

২৪. Himadri Banerjee, Nilanjana Gupta, Sipra Mukherjee: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮০।

২৫. *তদেব,* পৃ. ৮৩।

২৬. Issac S. Abraham: *Origin and History of the Calcutta Jews,* (Calcutta, Daw Sen and Co. Private Ltd, 1996), পৃ. ২০।

২৭. পীযুষ কান্তি রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮২।

২৮. Soumitra Das: *On Calcutta's Vanishing Jews Community: Then these were 39,* (Kolkata, The Telegraph, Peoples and Places, 8 December 1990).

২৯. Sukanta Chaudhuri (ed.): *Calcutta the Living City,* (Calcutta, Oxford University Press, 1990).পৃ. ৩০।

৩০. Himadri Banerjee, Nilanjana Gupta, Sipra Mukherjee: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৯।

৩১. Basanta Kumar Basu: *A Bygone Chinese colony in Bengal,* (Calcutta, Bengal Past and Present, Vol-42, 1944), পৃ.পৃ. ১২০-১২২।

৩২. Hasan Ali: *The Chinese in Calcutta,* S. Siddique *(ed.): A Study of Racial Minority in some aspect of Society and Culture in India,* (Kolkata, Anthropology Survey of India, 1989), পৃ. ৮৭।

৩৩. Jwahar Sarkar: *The Chinese of Calcutta* and Sukanta Chowdhury *(Ed.)*: *Calcutta the Living City,* (Calcutta, Oxford University Press, 1992), পৃ.পৃ ৬৪-৬৬।

৩৪. Ashok Mitra: *District Census,* (Calcutta, Hand Book of Calcutta, Part III & IV, 1951), পৃ. ৫২।

৩৫. *The Times of India, ২০ May,* ২০০৭।

৩৬. পীযূষ কান্তি রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯৬।

৩৭. Sukanta Chaudhuri (ed.): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬২।

৩৮. ইন্দ্রজিৎ দাস: *সেকালের কলকাতার ধর্মীয় চিত্র,* (কলকাতা, ভ্রমণ আড্ডা, উনবিংশ সংকলন, ২০১৭)।

৩৯. পীযূষ কান্তি রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯৯।

৪০. তুষার কান্তি স্যান্যাল: *কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজ,* (কলকাতা, কলকাতা পুরশ্রী, ষষ্ঠ বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৯৮৩), পৃ. ২০১।

৪১. Sukanta Chaudhuri (ed): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৮।

৪২. অলোক রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪২৩।

৪৩. Pijush Kanti Roy: *New Face in old Calcutta,* (Kolkata, Sarat Book Distributors, 2008), পৃ. ১২৬।

৪৪. *তদেব,* পৃ. ১২৫।

৪৫. অলোক রায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪২৪।

৪৬. Pijush Kanti Roy: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২৬।

৪৭. *তদেব,* পৃ. ১২৭।

৪৮. নাজিয়া আফরিন: *কাবুলিওয়ালার খোঁজে,* (ঢাকা, বিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২০১৫)।

৪৯. সৈয়দ মুজতবা আলী: *দেশে বিদেশে,* (কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৬), পৃ.৭১।

৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *কাবুলিওয়ালা,* (বিশ্বভারতী, সাধনা পত্রিকা, ১২৯৯)।

৫১. *তদেব।*

৫২. M.K.A Siddique: *Muslims of Calcutta,* (Kolkata, Anthropological Survey of India, September 1974)

৫৩ আশিস হীরা: *উদ্বাস্তু ইতিহাসে ও আখ্যানে,* (কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৯), পৃ. ৯।

৫৪. *তদেব,* পৃ. ৯।

৫৫. *Report of Refugee Population in India,* (Human Right Low Network, November 2007).

৫৬. সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরি: *ভারত মুখ ফেরাল,* (কলকাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৭), পৃ. ২।

৫৭. রূপকুমার বর্মণ: *সংকটজনিত উদ্বাস্তু ও তিতাস একটি নদীর নামের সার্বজনীনতা,* (কলকাতা, অন্তর্মুখ পত্রিকা, ২০১৪), পৃ ১২।

৫৮. Rup Kumar Barman: *Forced Migration Enviourment Refugees and State Politics: Indian scenario in global context*, Amit Bhattacharya (ed.)*: Exploring the green Horizon,* (Kolkata, Setu Publication, 2003), পৃ. ১৭৯।

৫৯. F. G Ferris (ed.): *Refugees and World Politics* (ed.): *Refugees and World Politics,* (New York, Praeger, 1985), পৃ. ৬।

৬০. UNO: *Guideline Principle on International Displacement,* (New York, United Nations Publication, 2001).

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *প্রাগুক্ত*।

৬২. Jaci Eisenberg: *The Boatless People, The UNHCR and Afghan Refugees, 1978-1989*, (Geneva, Working Papers in International History, 2013), পৃ.পৃ. ২৪-২৫।

৬৩. নাজিয়া আফরিন: *প্রাগুক্ত।*

৬৪. Arka Biswas: *Durand line: History, legality and Future,* (New Delhi, Vivekananda International Foundation, 1992).

৬৫. Asish Bose: *Afghan Refugee in India,* (Economic and Political Weekly, Vol.39, 2004), পৃ.পৃ ৪৬৯৮-৪৭০১।

৬৬. Indrajeet Singh: *Afghan Hindus and Sikhs,* (Readomania Publication, New Delhi, 2019), পৃ. ১৭৬।

৬৭. Kaching Tololyan: *Rethinking Diaspora (S): Stateless Power in the Transnational Movement,* (Toronto, University of Toronto Press, vol.5, 1996).

৬৮. Judith M Brown*: Creating New Homes and Communities, Global South Asians: Introducing the Modern Diaspora,* (New York, Cambridge University Press, 2006).

৬৯. মোজাফফার হোসেন: *ভারতীয় ডায়াস্পোরা সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপটে নাইপল,* (ঢাকা, কালি ও কলম, ২০১৮), পৃ.পৃ. ১-৪।

৭০. সুমনা দাস সুর: বৈশিক বাঙালি এবং ডায়াস্পোরা বাঙ্গলা সাহিত্য, (কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০২২), পৃ.পৃ. ১১-১২।

৭১. Robin Cohen: *Classical Nations of Diaspora; Global Diasporas: An Introduction*, (New York, Routhledge, 2008).

৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *প্রাগুক্ত।*

৭৩. Stuart Hall: *Culture Identity and Diaspora, Jonathan Rutherford (ed.): Identity, community, Culture Difference,* (London, Lawrence and Wishart 1990).

৭৪. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়: *প্রান্তিক নিম্নবর্গ দলিত: পরিভাষার অন্দরে,* (কলকাতা, অন্তর্মুখ, ডিসেম্বর ২০১৪), পৃ. ৬।

৭৫. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: *প্রান্তিক মানব,* (কলকাতা, প্রতিক্ষণ, ১৯৯৭), পৃ.১২।

৭৬. প্রশান্ত দাস: *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রান্তিক মানুষের জীবিকা ও পেশার বিবরণ,* (আসাম, A Journal of Humanities and Social Science, vol-III, করিমগঞ্জ কলেজ বাংলা বিভাগ, ১৯৯৭), পৃ. ৯৯-১০৫।

৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *প্রাগুক্ত।*

৭৮. জহর মজুমদার: *নিম্নবর্গের পেশার বিবরণ,* (কলকাতা, পুস্তক বিপনি, ২০০৭), পৃ.৬১।

৭৯. খোকন কুমার বাগ (সম্পা:): *আত্মপরিচয়ের সংকট: সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি,* (কলকাতা, আন্তর্মুখ পত্রিকা, ২০১৯) পৃ.পৃ. ৬-৮। অন্তর্মুখ পত্রিকার এই সংখ্যাতে

আত্মপরিচয়ের সংকট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সেই বিষয়ের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে।

৮০. শ্রী রমানাথ বিশ্বাস: *আফাগানিস্থান,* (কলকাতা, কোরক, প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৩), পৃ. ৮৮।

৮১. *তদেব,* পৃ. ৮৯।

৮২. *তদেব,* পৃ. ৯৫।

৮৩. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: *কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ,* (কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৮), পৃ.পৃ. ১২-১৬।

৮৪. *তদেব,* পৃ. ২২।

৮৫. *তদেব,* পৃ. ২৩।

৮৬. *তদেব,* পৃ. ৪৪।

৮৭. পান্থজন: *কাবুলের পথে পথে,* (কলকাতা, আনন্দ, ২০০৯), পৃ.পৃ. ১৬৪-১৬৮।

৮৮. *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৫৯-১৬০।

৮৯. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়: *সাহিত্য সমাজ ও ইতিহাস,* (কলকাতা, চতুরঙ্গ, স্বরসতী প্রেস, ১৩৬৯), পৃ. ১৭৩।

৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *প্রাগুক্ত।*

৯১. শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়: *পথ চল্‌তি* (কলকাতা, বাক্ সাহিত্য প্রা: লি:, ১৯৬০) পৃ.পৃ. ১২৬-১৩৪

৯২. Sister Nivadita: *Cabuliwallah,* Ramananda Chaterjee [Ed.]: (Calcutta, The Modern Review: *A monthly Review and Miscellany,* January to June, 1911).

৯৩. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: *প্রাগুক্ত।*

৯৪. শ্রী রমানাথ বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮৯।

৯৫. অগ্নি রায়: *বদলেছে ঝুলি, নয়া দিগন্তে রহমতেরা,* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ এপ্রিল ২০১৫)।

৯৬. তদেব।

৯৭. *Hindstam Times*, 29 July 2015.

৯৮. Moaka Najib and Najesh Afroz: *Kabul to Kolkata,* (কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে তথ্য চিত্র ও ছবি প্রদর্শনী, কলকাতা, ২০১৫).

৯৯. http://www.Indiantelevison.com/television/tv-channel/kids/anuragh-basu-to-stories-by-rabindranath-tagore-for-epic-150514

১০০. অমিতাভ রায়: *কাবুল নামা,* (কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১০)।

১০১. Mohammad Shafiq: *The Impact of Globalization: An insight into the Afghan Diaspora in India,* (Delhi, Jawaharlal Nehru University, School of International Studies, 2020).

১০২. পৃথা মুখোপাধ্যায়: *অশান্ত আফগানিস্তানে এই ছবিগুলি হতোই না,* (এই সময় পত্রিকা, ২২ আগস্ট ২০২১)।

১০৩. *এই সময় পত্রিকা,* ২২ আগস্ট ২০২১।

১০৪. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৯ মে ২০১৮।

তৃতীয় অধ্যায়

কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকট এবং কলকাতায় বসতি স্থাপনের প্রেক্ষাপট

আফগান কাবুলিওয়ালাদের আফগানিস্তান থেকে কলকাতাতে আগমনের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের কলকাতায় বসতি স্থাপনের কারণ। কাজেই বিষয় দুটি একে অপরের পরিপূরক। প্রথমদিকে আফগানদের আগমনের লক্ষ ছিল আক্রমণ, লুণ্ঠন এবং যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি। তবে রাজনৈতিকভাবে মোহম্মদ ঘুরি ১১৯২ সাল থেকে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, লক্ষ ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে ভারতবর্ষে শাসনকার্যে স্থায়িভাবে প্রতিনিধিত্ব করা।[১] মধ্যযুগের এই বিচ্ছিন্ন কালপর্বের সাময়িক অবসান হলেও আফগান অভিবাসনের ধারা ঔপনিবেশিক কালপর্ব পেরিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়েও সমানভাবে প্রবাহমান আছে। তবে যুগে যুগে আফগান অভিবাসিত মানুষদের অভিগমনের পিছনে কারণ কী ছিল, সেই বিষয়ের উপরে আলোকপাত করতে গেলে প্রথমে আফগানিস্তান দেশটির সম্পর্কে একটু পরিচিত হওয়া দরকার। কাজেই উক্ত অধ্যায়ে আফগান অভিবাসনের পিছনে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরণ সমস্যা কতটা দায়ী সেই বিষয়ে আলোচনা করার সঙ্গে আফগান জনগোষ্ঠীগুলির নতুন বাসস্থান হিসাবে কলকাতাকে নির্বাচন করার পিছনে যুক্তি কী ছিল তার উপরে আলোকপাত করার প্রয়োজন।

৩.২. আফগান জনমানস ও আফগানিস্তানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আফগানিস্তান দেশটির পরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের দেওয়া তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলে না। দেশটির আয়তন প্রায় ২৫০০০ হাজার বর্গমাইল। দুইশত বছরের ইতিহাসের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে আফগানিস্তান দেশটি। ভারতবর্ষে লেপটে থাকা আরব সাগর এবং সুদূর পশ্চিমে ইরানের সঙ্গে যোগসূত্রের মধ্যে একটি ছোট্ট গিট হল আফগানিস্তান। দু-হাজার বছর আগে আর্য উপনিবেশের প্রাক্কাল থেকে যার স্পন্দন বয়ে চলেছে আর্যাবতের মাটি। যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার

প্রসারিত বাহু পশ্চিম এশিয়ার হাত ধরেছে এবং মিলিয়ে দিয়েছে দুটি ভিন্ন সভ্যতা আর সংস্কৃতিকে। ভারতীয় কবি মহম্মদ ইকবাল যাকে বলেছেন 'এশিয়ার হৃদয়' এবং ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড কার্জন যে দেশকে বলতেন 'ককপিট অফ ইন্ডিয়া'।[২] ভৌগলিকভাবে দেশটিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, আফগানিস্তান সবসময় সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে। মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত দেশটির চারপাশে পাহাড় বেষ্টিত ঊষর অসমতল মরুভূমি, একদিকে শুষ্ক নিষ্পাদপ প্রান্তর ও অন্যদিকে তৃণবিস্তীর্ণ প্রান্তর। যেখানে আধুনিক সভ্যতার পরশটুকু পর্যন্ত পৌঁছায়নি। আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বে পাকিস্তান, পশ্চিমদিকে ইরান, উত্তর দিকে তুর্কমেনিস্তান ও তাজাকিস্তানের মতো দেশগুলি আফগানিস্তানকে চারিদিক থেকে ঘিরে আছে। কাজেই আফগানিস্তানের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই সাংস্কৃতিক সম্মেলনের কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়েছে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আফগানিস্তানের নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারিত হওয়ার পর বিদেশি শক্তি আফগানিস্তানকে দখল নিতে উদ্যত হয়। বিশেষত ব্রিটিশ শাসিত ভারত এবং জার শাসিত রাশিয়ার আগ্রাসি নীতি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আফগানরা রুদ্ধদ্বার নীতি গ্রহণ করেন।

১৯৬৪ সালে প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে আফগানিস্তানকে ২৯ টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই প্রদেশগুলির মধ্যে ব্রাকট্রিয়া, হিন্দুকুশ, হাজরাজাত, আরাকেসিয়ান সমভূমি, কাবুলিস্তান, হারিহুদ উপত্যকা, জালালাবাদ বা নাঙ্গারাহার, এবং বাদাখ্শান ছিল অন্যতম।[৩] মধ্য-এশিয়ায় অবস্থিত এই দেশটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৭৪৭ সালে। বর্তমানে এই দেশটি ইসলামি প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিচয় পায়। আফগানিস্তান দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে ১৯১৯ সালে ১৯ই আগস্ট। দেশটির রাজধানী কাবুল ছাড়াও আরও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রদেশের নাম উল্লেখযোগ্য। যেমন- কান্দাহার, হেরাত, বালখ (রাজধানী: মাজার-ই-শরীফ), বাদাকশান, বামিয়ান, গজনি, ঘুর, হেরাত, পাতকিয়া, পাকতিকা ইত্যাদি।[৪] আফগানিস্তানের এই প্রদেশগুলির মধ্যে কাবুল ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। একসময় কাবুল ছিল ভারত এবং মধ্য এশিয়ার মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। আবার কান্দাহার ছিল আফগানিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, এই শহরটি ফলমূলের জন্য বিখ্যাত ছিল। আফগানিস্তানের অবস্থান এমন একটি স্থানে

যেখান থেকে খুব সহজে এশিয়া ভ্রমণ করা যেত। ফলে ইন্দো-আর্য, শক, পার্সিয়ান, কুষাণ, গ্রিক, মঙ্গল, হূণ তুর্কি এবং অসংখ্য নাম না জানা জনগোষ্ঠী আফগানিস্তানে এসেছেন। এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি উপজাতি ছিল যাঁরা আফগানিস্তান জুড়ে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করতেন সর্বময়। আফগানিস্তানের এক-একটি উপজাতি এক একটি ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। তবে বর্তমানে আফগানিস্তানে মূলত চারটি জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব আছে বেশি। এরা হল পাসতুন, তাজিক, হাজরা এবং উজবেক। সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে পাশতুনরা পূর্ব ও দক্ষিণে পাকিস্তান সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাস করেন এছাড়া তাজিকরা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, হাজরারা দেশের কেন্দ্র হিন্দকোহের কাছে 'হাজারাজাত' অঞ্চলে এবং সর্বোপরি উজবেকরা হিন্দকোহ পেরিয়ে উত্তর অঞ্চলে বসবাস করেন। এছাড়া অল্প কিছু ছোটো ছোটো আফগান জনগোষ্ঠী রয়েছে এঁদের মধ্যে তুর্কমেন, ঘুর, গিলজাই, উইসুফজাই, কাকার ইত্যাদি উপজাতি উল্লেখযোগ্য।[৫] এই সমস্ত জনগোষ্ঠী আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থানে অল্প কিছু কিছু করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

২০০১ এর জনগণনা অনুযায়ী আফগানিস্তানের মোট লোকসংখ্যা ২৬,৮১৩,০৫৭ জন। প্রাপ্ত এই জনসংখ্যার মধ্যে অধিকাংশ বসবাস করেন গ্রামাঞ্চলে, অনুপাতে প্রায় ৭৮%। শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা ২২ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৯ শতাংশ মুসলিম।[৬] এদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ পাসতুন, ২৫ শতাংশ তাজিক, ১৯ শতাংশ হাজরা এবং ক্ষুদ্র অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২ শতাংশ এবং সর্বোপরি ৬শতাংশ উজবেক। আফগান জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে যেমন তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি আফগানিস্তানের ভাষার ক্ষেত্রেও এই ভিন্নতার লক্ষণ ফুটে ওঠে। আফগান জনগোষ্ঠীর এক জনের যে 'ভাষা' অন্যজনের সেই একই ভাষা আবার 'উপভাষা'।[৭] তবে আফগানদের মধ্যে একাধিক ভাষা এবং উপভাষার প্রচলন থাকলেও 'পশতু' এবং 'দারি' ছিল অন্যতম ভাষা। সম্রাট জাহির শাহের আমলে 'দারি' ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 'দারি' ভাষা ফারসি ভাষারই একটি উপভাষা। ২০০৪ সালে সি.আই এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী আফগানিস্তানে ফারসিভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল ৫০ শতাংশ এবং পাশতুভাষীর সংখ্যা ছিল ৩৫ শতাংশ। বাকি ১১ শতাংশ ছিল ছিল তুর্কিভাষী (উজবেক

এবং তুর্কমেন) এবং অন্যান্য ৩০ টি সংখ্যালঘু ভাষার লোক ছিল। ফারসি (দারি) ভাষা ছিল মূলত সরকারি দপ্তরের ভাষা।[৮]

আফগানিস্তান দেশটি গঠনগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিভিন্ন উপজাতি বেষ্টিত ও একাধিক ভাষাভাষীর মানুষের বসবাসের কারণে তাঁদের মধ্যে কখনো ঐক্য গড়ে ওঠেনি। স্বভাবতই দেশটি ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েই গেছে চিরকাল। তাঁদের এই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দেশটির ইতিহাস রচিত হয়েছে। তবে 'আফগানিস্তান' শব্দটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীতে। যখন আফগানিস্তানকে পূর্বে সিন্ধু নদী পর্যন্ত অঞ্চলকে বোঝাত। তবে আফগানিস্তান মূলত হিন্দুকুশ পর্বতমালার দেশ।[৯] কারণ দেশটির পশ্চিম অংশের সঙ্গে চিনের যোগাযোগ রক্ষা করার সঙ্গে পূর্ব-ভারতের যোগাযোগকে স্পষ্ট করেছে আবার একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ানের সঙ্গে দেশটির যোগাযোগ ছিল। ফলে অসংখ্য ব্যবসায়ী এবং আক্রমণকারী দল আফগানিস্তানের উপর দিয়ে যাতায়াত করেছে যুগে যুগে। উদাহরণ হিসাবে 'রেশমপথ' এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। বিখ্যাত এই রেশমপথ হিন্দুকুশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই পথ ধরে আলেকজান্ডার, বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাসী, মোঘল, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীরা যাতায়াত করেছেন।[১০] তাই আফগানিস্তানের যে প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শত বছরের অভিগমনকারী জনগোষ্ঠীর যাতায়াতের ইতিহাস। এই আফগানিস্তানের উপরে একসময় জরাথ্রুষ্ট প্রচার চালিয়েছিলেন, অ্যালেকজান্ডার পারস্যরাজা দারায়ুসকে পরাজিত করে আফগানিস্তানে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, অশোক বৌদ্ধধর্মের ব্যাপ্তি আফগানিস্তান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন, রাজা কণিষ্কের সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার আফগানিস্তানেই সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতকে মঙ্গোল নেতা চেঙ্গিস খান আফগানিস্তান আক্রমণ করেন, ফলে আফগানিস্তানে উদ্ভব হয় 'হাজরা' নামক একটি জনগোষ্ঠীর যাঁদের চেহারার গঠন অনেকটা চিনা জনগোষ্ঠীর মানুষদের মতো, এরাই ছিলেন চেঙ্গিস খানের বংশধর। এরপর একে একে তৈমুর লং, জাহিরুদ্দিন বাবর আফগানিস্তানের কাবুলে ঘাঁটি স্থাপন করে এখান থেকেই তাঁরা ভারতবর্ষ আক্রমণের পরিকল্পনা করেন।[১১]

এর পরে আহমেদ শাহ দুরানী আফগানিস্তানকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে তিনি সার্বিকভাবে সফল হননি। তারপর আবদুর রহমানের সময়ে ব্রিটিশরা 'ডুরান্ড' লাইন দিয়ে আফগানিস্তান এবং ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত করে দেন। ফলে পাখতুনরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের শেষ হয় আবদুর রহমানের নাতি আমানুল্লার সময়ে। ১৯১৯ সালে 'রাওয়ালপিন্ডি' চুক্তির মাধ্যমে আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র নীতিতে ব্রিটিশ প্রভাব মুক্ত হয়। এইভাবে দুরানি শাসকগণ ১৭৪৭ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে রাজত্ব করেন। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন ধরে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে এবং গৃহযুদ্ধের মধ্যেই রাশিয়ার দ্বারা ড. নাজিবুল্লাহ আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে গৃহযুদ্ধের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অবশেষে দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে ১৯২২ সালে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়। ফলে আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় আফগান 'মুজাহিদিন' বা 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র'। ১৯৯২ সালে বুরাহানউদ্দিন রব্বানি প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার নিলেও আফগানিস্তানে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হল না। ১৯৯৪ সালে মুল্লা উমরের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হল তালিবান সরকার। এই সরকার আফগানিস্তানে এক দুর্বিষহ, ভয়ানক, ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করলেন এবং কট্টরপন্থী ইসলামি শাসন কায়েম করলেন সমস্ত আফগানিস্তান জুড়ে। অবশেষে ২০০১ সালে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ বাহিনীর প্রচেষ্টায় আফগানিস্তান থেকে তালিবান সরকারের পতন ঘটে এবং হামিদ কাজরাই (২০০১-২০১৪) এর নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকার গঠন হয়। সর্বশেষ আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আরসাফ গনির (২০১৪-২০২১) নেতৃত্বে আধুনিক আফগানিস্তান নির্মাণ হতে শুরু করে। তবে সাম্প্রতিককালে আরসাফ গনির নেতৃত্বে আফগান সরকার পুনরায় তালিবানদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ে। ফলে বর্তমানে আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন হাতিবুল্লাহ আখুন্দজাদা।[১২]

৩.৩. কাবুলিওয়ালাদের আদি বাসস্থান

আফগান শব্দের উপৎত্তি ও অর্থ অজ্ঞাত। তবে কোনও এক অজ্ঞাত লেখক আনুমানিক ৯৮০ সালের দিকে 'হুদুদ আল আলম' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'আফগান' শব্দের উল্লেখ

করেছিলেন। যেখানে তিনি পর্বতের উপরে অবস্থিত ‘সাউওল’ নামক একটা মনোরম গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে আফগানরা বাস করত। পরবর্তীকালে এই একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায় অল বিরুণির লেখার মধ্যে। যেখানে তিনি লেখেন ‘ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পর্বতমালায় বিভিন্ন আফগান গোত্র বসবাস করে’।[১৩] আফগানিস্তান এবং আফগানদের নিয়ে এমন নানা উপকথা এবং গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁদের আদি বাসস্থান সম্পর্কিত একাধিক তথ্য উঠে আসে। তবে মাতৃভূমি ছেড়ে যাওয়া আফগানদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ ছিল যাযাবর জনগোষ্ঠী। এঁরা সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে যাযাবর রূপে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন। এঁরা মূলত আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে ঘুরে বেড়াতেন। তবে এই সমস্ত আফগান জনগোষ্ঠীগুলির যাতায়াতের পরিসর শুধুমাত্র পার্শ্ববর্তী দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতসহ এশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে। ছড়িয়ে পড়া এই আফগানদের মধ্যে শহর কলকাতাতে যাঁদের আগমন ঘটেছিল তাঁদের উপরে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কাবুলিওয়ালারা আফগানিস্তানের কোন প্রদেশগুলি থেকে অভিবাসিত হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, সেই বিষয়ে অনেকেই মনে করেন কাবুলিওয়ালাদের আদি বাসভূমি আফগানিস্তানের কাবুলে। একথা ঠিকই কাবুলিওয়ালারা কাবুলের বাসিন্দা, তবে তাঁরা যে শুধুই কাবুল থেকেই কলকাতাতে এসেছিলেন একথা ঠিক নয়। কারণ এঁরা কাবুল ছাড়াও আফগানিস্তানের একাধিক প্রদেশগুলি থেকে কলকাতাতে এসেছিলেন। ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কাবুলিওয়ালাদের বেশিরভাগ অংশ এসেছিলেন বাদাখশান, গজনী, হেরাট, কান্দাহার, পাকতিয়া, পাকতিকা এবং কাবুলের মতো প্রদেশগুলি থেকে। সুতরাং কাবুলিওয়ালা মানেই যে কাবুলের বাসিন্দা একথা ঠিক নয়।[১৪] কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের নথিতে দেখা গেছে আফগানদের কলকাতার অভিমুখে আগমনের সময়ে দিল্লিতে অভিবাসন দপ্তরে প্রথমেই নাম নথিভুক্ত করে। এরপর আফগানিস্তানের কোন প্রদেশ থেকে তাঁরা ভারতবর্ষে এসেছেন এবং ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে তাঁরা বসবাস করতে চান তার বিস্তারিত উল্লেখ করে তবেই এখানে প্রবেশ করতেন। কাজেই অভিবাসন

সংক্রান্ত তথ্যের মধ্যে থেকে পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে আফগান কাবুলিরা আফগানিস্তানের কোন প্রদেশগুলি থেকে কলকাতাতে এসেছিলেন।[১৫]

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে অবস্থিত ‘ডুরান্ড লাইনের’ কথা। এই ডুরান্ড লাইনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আফগান অভিবাসিত মানুষ কলকাতার দিকে এসেছিলেন। যাঁরা আফগানিস্তানের পাকতিয়া এবং পাকতিকা প্রদেশের মানুষ। অনুমান করা যায় এঁদের মধ্যে একটা অংশ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কাজের সন্ধানের পাশাপাশি কলকাতাতে এসেছিলেন বসবাসের সন্ধানে।[১৬] এই পাকতিয়া অঞ্চলের অবস্থান ছিল আফগানিস্তানের দক্ষিণপ্রান্তে, যার দূরত্ব কাবুল থেকে বেশ খনিকটা দূরে। কলকাতার কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের নেতা আমির খান স্বীকার করেন তাঁর পূর্বপুরুষরা পাকতিয়া প্রদেশের অধিবাসী, তাঁর বাবা এবং যে চাচার মাতৃভূমি এই পাকতিয়া প্রদেশে।[১৭] এই পাকতিয়া প্রদেশের প্রত্যন্ত মফফ্সলের গ্রামগুলি থেকে সুদূর অতীত থেকে কলকাতাতে কাবুলিওয়ালা আসছেন। তবে ‘পাকতিয়া’ বা ‘পাকতিকা’ প্রদেশ থেকেই অধিকাংশ কাবুলিওয়ালারা কলকাতাতে এলেও, আফগানিস্তানের আরও একাধিক প্রদেশ থেকে আফগান কাবুলিওয়ালারা দশকের পর দশক কলকাতাতে অভিবাসিত হয়েছেন।

কলকাতাতে যে সমস্ত কাবুলিরা বসবাস করছেন তাঁদের বাসস্থান সম্পর্কে যদি আরও খানিকটা গভীরভাবে আলোকপাত করা যায় তাহলে কাবুলিওয়ালাদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উঠে আসে। যেমন সৈয়দ মুজতবা আলী এ প্রসঙ্গে তাঁর ‘দেশে বিদেশে’ নামক রম্য রচনাতে বলেছেন- রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পটি স্কুল পাঠ্য হওয়ার দরুন ভারতের সব ভাষাতেই ‘কাবুলিওয়ালা’ কথাটি খুব প্রচলিত। গুরুভক্তি অটুট রেখেই তিনি বলেছেন কলকাতার কাবুলিওয়ালারা মোটেই কাবুলের লোক নয়, কলকাতার কাবুলিরা সীমান্ত (সাবেক ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স, এখনকার পাকিস্তানের ফেডারেল অথোরিটি ফর ট্রাইবাল এরিয়ার্স) অর্থাৎ ‘খাইবার’ বা বড়োজোর ‘কান্দাহারের’ বাসিন্দা।[১৮] অর্থাৎ মুজতবা আলী দীর্ঘদিন আফগানিস্তানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে কাবুলিওয়ালাদের বাসস্থান সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে গিয়ে ‘খাইবার’ বা ‘কান্দাহারের’ আদি বাসস্থান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তথ্যসহকারে।

মুজতবা আলীর এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলা যায়, কলকাতাতে এমন অনেক কাবুলিওয়ালার সন্ধান পাওয়া গেছে, যাঁরা আফগানিস্তানের এই দুইটি অঞ্চল থেকে কলকাতাতে এসেছিলেন। একইভাবে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ’ নামক গ্রন্থে কাবুলিওয়ালাদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে অনেকটা নির্ভেজাল তথ্য উঠে আসে। সেখানে তিনি ‘পাকতিয়া’ অঞ্চলকেই কাবুলিওয়ালাদের আদি বাসস্থান হিসাবে নির্বাচিত করেছেন।[১৯] তিনি লিখেছেন তাঁর স্বামী জাম্বাজ খানের দেশের বাড়ি ছিল আফগানিস্তানের ‘পাকতিয়া’ প্রদেশের ‘সারান’ নামক জেলাতে। এছাড়া ‘Muslim of Calcutta’ নামক গ্রন্থে এম.কে.এম সিদ্দিকি কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের আগমনের উপরে মত প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন, কাবুলিওয়ালারা আফগানিস্তানের কান্দাহার, মাজার-ই-শরিফ, জালালাবাদ এবং গজনীর মত শহরগুলি থেকে কলকাতাতে এসেছিলেন।[২০] সুতারাং একটা বিষয় খুব স্পষ্টভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় যে, আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলি থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কাবুলিওয়ালা অভিবাসিত হয়েছেন।

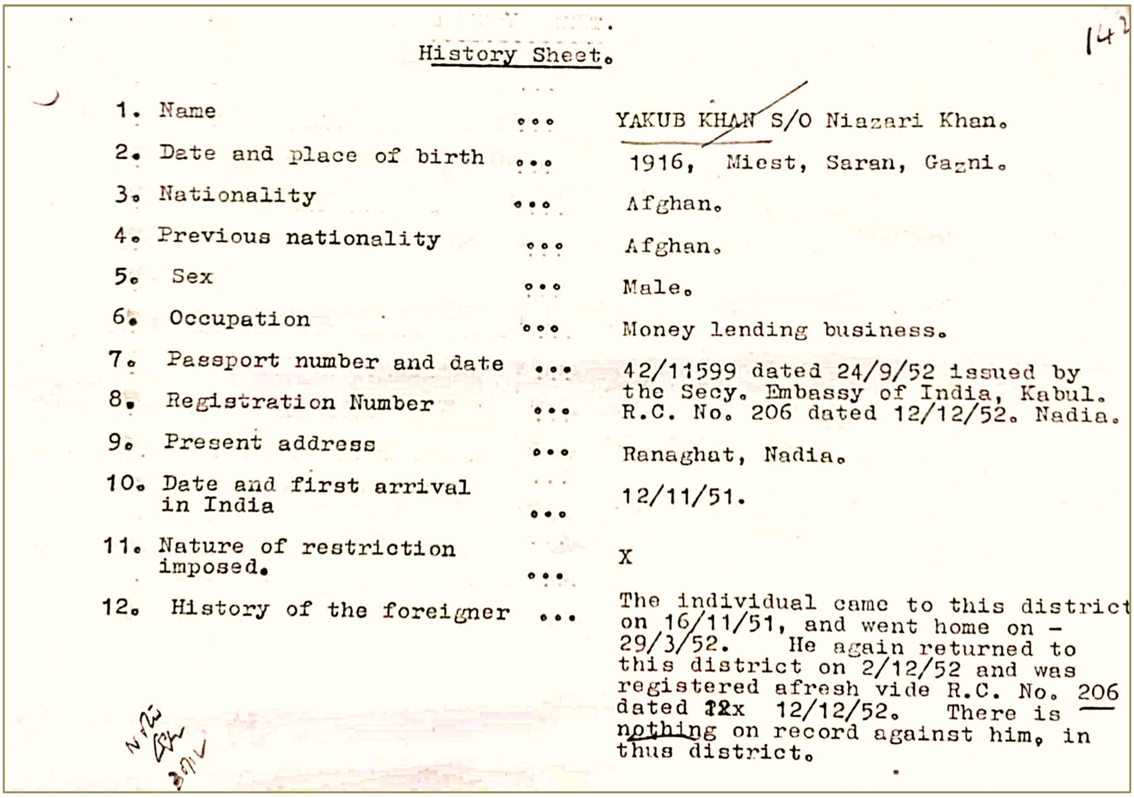

142

History Sheet.

1.	Name	...	YAKUB KHAN S/O Niazari Khan.
2.	Date and place of birth	...	1916, Miest, Saran, Gazni.
3.	Nationality	...	Afghan.
4.	Previous nationality	...	Afghan.
5.	Sex	...	Male.
6.	Occupation	...	Money lending business.
7.	Passport number and date	...	42/11599 dated 24/9/52 issued by the Secy. Embassy of India, Kabul.
8.	Registration Number	...	R.C. No. 206 dated 12/12/52. Nadia.
9.	Present address	...	Ranaghat, Nadia.
10.	Date and first arrival in India	...	12/11/51.
11.	Nature of restriction imposed.	...	X
12.	History of the foreigner	...	The individual came to this district on 16/11/51, and went home on - 29/3/52. He again returned to this district on 2/12/52 and was registered afresh vide R.C. No. 206 dated 12x 12/12/52. There is nothing on record against him, in thus district.

সূত্র: West Bengal State Archives, Intelligence Branch, File No- 236/39(16) Foreigners Afghan National in Nadia.

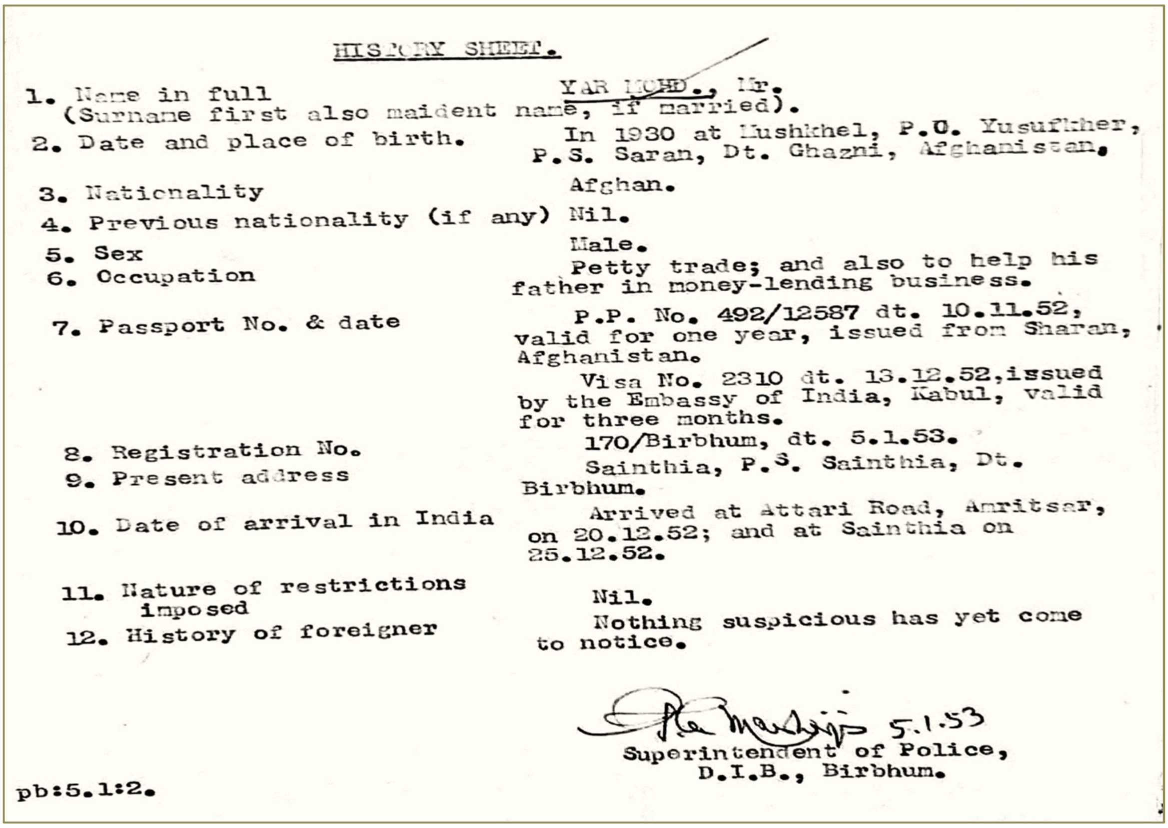

HISTORY SHEET.

1. Name in full (Surname first also maiden name, if married). — YAR MOHD., Mr.
2. Date and place of birth. — In 1930 at Mushkhel, P.O. Yusufkher, P.S. Saran, Dt. Ghazni, Afghanistan.
3. Nationality — Afghan.
4. Previous nationality (if any) — Nil.
5. Sex — Male.
6. Occupation — Petty trade; and also to help his father in money-lending business.
7. Passport No. & date — P.P. No. 492/12587 dt. 10.11.52, valid for one year, issued from Sharan, Afghanistan. Visa No. 2310 dt. 13.12.52, issued by the Embassy of India, Kabul, valid for three months.
8. Registration No. — 170/Birbhum, dt. 5.1.53.
9. Present address — Sainthia, P.S. Sainthia, Dt. Birbhum.
10. Date of arrival in India — Arrived at Attari Road, Amritsar, on 20.12.52; and at Sainthia on 25.12.52.
11. Nature of restrictions imposed — Nil.
12. History of foreigner — Nothing suspicious has yet come to notice.

5.1.53
Superintendent of Police,
D.I.B., Birbhum.

pb:5.1:2.

সূত্র: West Bengal State Archives, Intelligence Branch, File No- 236/39(16) Foreigners Afghan National in Bhirbhum.

৩.৪. কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনের অর্থনৈতিক কারণ

আফগান কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ যে গুরুত্বপূর্ণ ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা কীভাবে আফগানদের দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল, সেই বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়োজন। কাজেই আফগানিস্তান থেকে যত সংখ্যক কাবুলিওয়ালা কলকাতাতে অভিবাসিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সকলেই প্রায় জীবন-জীবিকা এবং পেশার টানে দেশান্তরিত হয়েছিলেন। কারণ স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ভিতের উপরে আফিগানিস্তান ঠিক সেভাবে দাঁড়াতে পারেনি কোনও কালেই। ফলে আফগানরা ক্রমেই নিজেদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। এই অস্থির অবস্থা আফগানিস্তানের অর্থনীতির উপরে একটা দীর্ঘ প্রভাব ফেলেছিল। এর ফলে সাধারণ আফগানরা বিশেষত যাঁরা আফগানিস্তানের গ্রামঞ্চলে বসবাস করেন তঁদের মধ্যে দেশান্তরিত হওয়ার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।

১৯৭৯ সালে জনগণনা অনুসারে আফগানিস্তানে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা ছিল ১,৩০,৫১,৩৫৮ জন এবং যাযাবরের সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশ লক্ষের মতো। সুতরাং যাযাবরের এই পরিসংখ্যান অনুসারে বোঝা যায় আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা ঠিক কেমন ছিল।[২১] কাজেই আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থাকে পর্যালোচনা করতে গেলে আফগানিস্তানে বিভিন্ন প্রদেশ এবং প্রদেশগুলিতে উপজাতিভিত্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা উপস্থাপিত করতে হয়। কারণ কোন কোন প্রদেশগুলি থেকে বেশি সংখ্যক মানুষ অর্থনৈতিক কারণে দেশান্তরিত হচ্ছেন এবং কোন শ্রেণির উপজাতির সংখ্যা তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তার বিশ্লেষণ জরুরি। তবেই আফগানিস্তানের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত বনাঞ্চলহীন বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি, বালুকাপূর্ণ মরুভূমি, অনুর্বর, শিল্পে অনুন্নত, কৃষিকাজ ও পশুপালন নির্ভর জীবিকা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বিমুখ একটি দেশ হল আফগানিস্তান দেশটি। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বের গরিব দেশগুলির মধ্যে আফগানিস্তান অন্যতম। বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিদেশি শক্তির অনুপ্রবেশ, নিজেদের মধ্যে জাতি কলহ, অর্ন্তদ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে আফগানিস্তানের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। এর ফলে বেড়েছে পরনির্ভরতা ও অন্য দেশের উপরে মুখাপেক্ষী হওয়া। আফগানিস্তান মূলত কৃষি নির্ভর একটি দেশ। যদিও দেশের সর্বমোট জমির মধ্যে মাত্র ১২ শতাংশ জমি আবাদযোগ্য। দেশের উৎপাদিত কৃষিজ প্রধান পণ্য ছিল ধান, গম, যব, ভুট্টা, বার্লি, তুলা, পপি, পেস্তা, বাদাম, মেওয়া ইত্যাদি। ফলের মধ্যে আঙুর, আপেল, চেরি, ন্যাসপতি, এলমন্ড এবং পেস্তা উল্লেখযোগ্য। আফগানিস্তানের এই সব সুস্বাদু ফল ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। ১৯৭৬ সালের পর থেকে আফগানিস্তানে এই সমস্ত ফসলের উৎপাদন কমতে থাকে।[২২] কারণ একটানা তুষার বৃষ্টির কারণে উৎপাদন কমে যেতে থাকে। এরপর ১৯৮০ সালের পর আফগানিস্তানে আফিম চাষ সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আফগানিস্তানের কৃষিকাজে জলসেচের প্রয়োজন হলে তা সবসময় সম্ভব হয় না। কারণ এখানে জলসেচের তেমন সুবিধা নেই, ফলে নদীর জলের উপরেই নির্ভর করতে হয়। তবে নদীর জল সবসময় না পাওয়ার কারণে চাষের ক্ষয়ক্ষতি খুব বেশি

হয়ে থাকে। দেশের মোট ৮৫% শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। আফগানিস্তানের শিল্পও কাঁচামাল নির্ভর, কাঁচামাল আসে মূলত কৃষি থেকেই। শিল্পে ব্যবহৃত শস্য তুলো, তামাক, আখ ইত্যাদি। ভেড়া এবং ছাগল লালন-পালন আফগানদের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা।[২৩] আফগানিস্তানে যাযাবর সম্প্রদায় গরমকালে চারণ ভূমিতে পশুপালনে লিপ্ত থাকেন। আফগানিস্তানে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেও অধিকাংশ অ-উত্তোলিত অবস্থায় পড়ে আছে। অর্থাৎ আফগানিস্তানের অর্থনীতির এই চালচিত্র থেকে পরিলক্ষিত হয়, দেশটির মানুষ কত অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে কীভাবে জীবন কাটাচ্ছেন। এর উপরে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার একপ্রকার বন্ধ থেকেছে দীর্ঘসময় ধরে।

আফগানিস্তানের এই দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে আফগানরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিয়েছে যুগ যুগ ধরে। দীর্ঘ সময় ধরে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের ফলে সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। অর্থনীতির এই পতন দারিদ্র বাড়িয়েছে। আফগানিস্তানে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির কারণে আয়ের স্তর অনেক নেমে গেছে। খাদ্য নিরাপত্তায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এরই পাশাপাশি বেড়ে চলেছে জনসংখ্যার অনুপাত। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের এমনকি প্রদেশের অভ্যন্তরেও এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের আর্থিক পার্থক্য রয়েছে বিস্তর। আফগানদের কিছু কিছু প্রদেশ রয়েছে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা ভালো যেমন হেরাত, জালালাবাদ এবং কান্দাহারের মতো প্রদেশগুলি। কারণ এই সমস্ত অঞ্চলগুলি সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত, ফলে অন্যদেশে যাতায়াত এবং পারাপারের অনেকটা সুবিধা রয়েছে। আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং গৃহযুদ্ধের কারণে বেশ কিছু অঞ্চলে খাদ্যাভাব লক্ষ করা গেছে। যেমন- বাদাখশান বা বামিয়ানে। সুতরাং খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে আফগান অভিবাসনের সঙ্গে কীভাবে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার যোগাযোগ রয়েছে।

আফগান অভিবাসনের পিছনে আফগান অর্থনীতির প্রভাব ছিল দ্বিমুখী। প্রথমত আফগানিস্তানের যে সমস্ত প্রদেশগুলি প্রতিবেশী দেশের বর্ডার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। সেই সব দেশগুলিতে আফগানরা নিজেদের দেশের পণ্যদ্রব্যগুলি নিয়ে বিক্রি করতেন।

ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে এঁরা অধিকাংশই খানিকটা স্বাচ্ছন্দেই ছিলেন। যেমন কান্দাহার থেকে ডালিম, আঙুর ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে বিদেশের বাজারে খুব সহজেই বিক্রি করতেন। ভারতে বর্তমানে যে সমস্ত বাণিজ্যমেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয় সেখানে কান্দাহারের লোকেদের প্রাধান্য বেশি, মাজার-ই-শরিফ থেকে গলিচা, কার্পেট, কারাকুল ইত্যাদি খুব সহজেই অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে আফগানরা বিক্রি করে বেড়ান।[২৪] তবে যে সমস্ত আফগানরা শহরের কেন্দ্র থেকে অনেকটা দূরে বসবাস করেন তাঁদের অবস্থা বেশি সংকটজনক। কারণ তাঁদের নেই কোনও নিশ্চিত খাদ্যের সংস্থান, নেই বসবাসের নিশ্চয়তা কাজেই একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাঁরা অন্যদেশে চলে যান। এক্ষেত্রে 'পাকতিয়া' প্রদেশের বিভিন্ন জেলাগুলি অন্যতম। আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল আফগানিস্তান সরকারের বিনিয়োগের মাধ্যম ছিল রাষ্ট্রয়ত্ত ক্ষেত্রগুলিতে, বেসরকারি উদ্যোগের পথ খোলা ছিল কৃষি এবং বাণিজ্যে। বিগত দু-দশক রাষ্ট্রের বিনিয়োগ কমেছে এবং বেসরকারী উদ্যোগ বেড়েছে। ফলে আফগানিস্তানের সংকট নিরন্তর বেড়েই চলেছে।

আফগানিস্তানের এই প্রচলিত অর্থব্যবস্থা সাধারণ আফগানদের উপরে যেমন প্রভাব ফেলেছিল, ঠিক তেমনই যাঁরা বাধ্য হয়ে দেশান্তরিত হয়েছিল তাঁদের উপরেও পড়েছিল। ফলে সাধারণ আফগানরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভিবাসিত হচ্ছিলেন। ভারতে যে সমস্ত আফগানরা এসেছিলেন এঁদের মধ্যে অনেকেই স্বচ্ছল ব্যবসায়ী, যাঁরা শুধুমাত্র ব্যবসা- বাণিজ্য করবার জন্যে এদেশে এসেছেন, এঁরা নিজেদেরকে কাবুলিওয়ালা হিসাবে পরিচয় দেন না। তবে যাঁরা কাবুলিওয়ালা হিসাবে নিজেদের পরিচয় দেন তাঁরা মূলত ছোটো ব্যবসায়ী, হকার, সুদের কারবারি। এই শ্রেণির আফগানরা মূলত আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত পাকতিয়া বা পাকতিকা অঞ্চলের অধিবাসী, কেউ কেউ আবার গজনীর অধিবাসী। গজনী হয়ে সবচেয়ে বেশি কাবুলিওয়ালা এসেছিলেন, কান্দাহারের কাবুলিওয়ালারা প্রায়শই ভারতে আসেন বাণিজ্য করতে, অনেকেই আবার ফিরে যান দেশে। এরা সাধারণত মরশুমি ফলের ব্যবসাতে নিজেদের নিযুক্ত রাখতেন।[২৫] বর্তমানে যে সমস্ত আফগানরা কলকাতাতে বসতি স্থাপন করছেন তাদের পূর্বপুরুষরা আফগানিস্তানের সিল্ক

রুটের মাধ্যমে কান্দাহার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। বিশ শতকে জলপথ এবং আকাশপথে যাতায়াতের অগ্রগতির ফলে পুরাকালের সেই উট এবং ঘোড়ায় চলা পথকে পরিত্যাগ করেছেন। তবে শুধুমাত্র চাষবাস বা ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে যে আফগান অভিবাসন হয়েছিল তা নয়, আফগানিস্তান দেশটিতে একস্থানের সঙ্গে অন্যস্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থার অর্বাচীন অবস্থা, মাথাপিছু আয়ের উৎস খুব অল্প, চিকিৎসা ব্যবস্থার করুণ অবস্থা, অনুপযুক্ত আবহাওয়া, সর্বোপরি ক্ষুধা, যন্ত্রণা, ঠিকা শ্রমিক, সীমান্ত পারাপার বাণিজ্যের যন্ত্রণা ইত্যাদি কারণে আফগান কাবুলিওয়ালারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালারা আফগানিস্তানের কাবুল, কান্দাহার, গজনী, গাদরেজের মত প্রদেশগুলি থেকে কলকাতাতে এলেও, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে কলকাতার কাবুলিওয়াদের একটা বৃহৎ অংশ আফগানিস্তানের পাকতিয়া ও পাকতিকা প্রদেশ থেকে কলকাতাতে এসেছিলেন, যে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কারণ আফগানিস্তানের যেসব প্রদেশগুলি থেকে কাবুলিওয়ালারা কলকাতাতে এসেছিলেন তার মধ্যে এইদুটি প্রদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। কাবুলের পথে পথে গ্রন্থে লেখক পান্থজন লিখেছেন "এই 'পাক্তিকা' একসময় 'পাক্তিয়ার' রাজধানী ছিল"। বর্তমানে পাকতিকার রাজধানী 'সারান' প্রদেশটি আফগানিস্তানের দুর্গম প্রান্তরে অবস্থিত। কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালা আমির খানের পূর্বপুরুষ থেকে শুরু করে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী জাম্বাজ খানসহ একাধিক কাবুলিওয়ালাদের জন্মস্থান এই পাকতিয়া অঞ্চলে। আফগানিস্তানের এই অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে রাস্তা ঘাটের অবস্থা ভীষণ অনুন্নত, শিক্ষা ব্যবস্থার হাল প্রচন্ড খারাপ, গত কয়েক দশকে মাত্র দু-চার জন কাবুলে গিয়েছেন শিক্ষা অর্জনের জন্য, জলের অভাব, জলসেচের একমাত্র মাধ্যম বলতে পাম্প।[২৬] পেঁয়াজ, তরমুজ, পালং, টমেটোর মতো ফলের অভাব নেই, সেপ্টেম্বর মাসে আঙুর পাকতে শুরু করে, গমের চাষ পাকতিয়ার সারণা প্রদেশে খুব ভালোই হয়। এখানে মে মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত চাষবাস চলতে থাকে, এর পরে ঠণ্ডা পড়ে যায়। বরফ পড়তে শুরু করলে গাছপালা শুকিয়ে যায়। এই সময়ে পাকতিয়ার অবস্থা এতটাই খারাপ পর্যায়ে

পৌঁছায় যে পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা টমেটো, শশা, সান্তারা, কমলালেবু, কড়াইশুঁটি, আচার, মুলো, কাঁচালঙ্কার মতো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাকতিয়ার বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে।[২৭] আফগানিস্তানে টাকাকে 'আফগানি' বলা হয়। সুস্মিতা দেবী লিখেছেন এক হাজার ভারতীয় টাকায় ষাট হাজার আফগানি টাকা পাওয়া যেত।

৩.৫. কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনে ভূ-রাজনৈতিক কারণ

আফগানদের অভিবাসনের পিছনে অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন দায়ী ছিল, ঠিক তেমনই আফগানিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা তাঁদের অভিবাসনের পথকে প্রশস্ত করেছিল। এলফিনস্টোন তাঁর লেখাতে সেকথা বারবার বলতে চেয়েছেন। তিনি বলেন আফগানরা এমন একটি জাতি যাঁরা অভিবাসিত হয়েছেন সারা পৃথিবীতে। আফগান অভিবাসনের এই ধারা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মতো ভারতবর্ষেও এসে পড়েছিল। প্রথমদিকে আফগানরা সড়ক পথ ধরে পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে ভারতে এলেও পরবর্তীকালে একাধিক উপায়ে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু আফগানদের এই অভিবাসনের ধারা আজও শেষ হয়নি। পৃথিবীর যে কোনও দেশে অভিবাসনের পিছনে নির্দিষ্ট কতকগুলি কারণ থাকে। সে হতে পারে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং আবহওয়াজনিত কারণে। আফগান অভিবাসনের পিছনে নির্বাচিত এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সবটাই একইসঙ্গে কাজ করেছিল। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে আফগানিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক কারণ যে বিশেষভাবে দায়ী ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর ফলে আফগানিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘড়ছাড়া হয়েছে যুগে যুগে।

আফগানিস্তান দেশটি দীর্ঘ সময় ধরে ব্রিটিশ এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে অবস্থিত একটা 'বাফার স্টেট' হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে। এছাড়া আফগানিস্তানে অবস্থিত বিপুল খনিজ সম্পদ এবং বিশেষত তৈলখনিগুলির প্রতি বিদেশিদের মূল লক্ষ ছিল। ফলে বিদেশি শক্তি চিরকাল আফগানিস্তানের মাটিকে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে আফগানিস্তানের মাটিকে সর্বত্র ব্যবহার করেছে বিদেশি শক্তিরা। ফলে আফগানিস্তান বিভিন্ন সময়ে জড়িয়ে পড়েছে নানারকমের আন্তর্জাতিক সমস্যাতে। তাই আফগানিস্তানের এই দীর্ঘ কালপ্রবাহের

ইতিহাসে আফগান অভিবাসনকে শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে আফগান অভিবাসনের চিত্র সে ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। একসময় পশ্চিমের আক্রমণকারী ও ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষে ঢোকার জন্য আফগানিস্তানকে ব্যবহার করেছিলেন।[২৮] বাল্‌খ অঞ্চলে জরাথ্রুস্ট প্রচার চালিয়েছিলেন, গ্রিক দেশ থেকে অ্যালেকজান্ডার এসে পারস্য রাজা দারায়ুসকে পরাজিত করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিল, অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য আফগানিস্তান পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। চেঙ্গিস খান বাহমিয়ানে প্রবেশের জন্য আফগানিস্তানকে ব্যবহার করেছিল, বাবর কাবুল দখল করে সেখান থেকে দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং পরে একে একে রঞ্জিত সিং, নাদির শাহ থেকে শুরু করে আহমেদ শাহ আবলদালি পর্যন্ত চলেছিল আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে আক্রমণ এবং পরাক্রমণের খেলা।[২৯]

ঔপনিবেশিক আমলে রাশিয়া যখন ক্রমশ আগ্রাসি হয়ে উঠছে তখন রাশিয়াকে আটকাবার জন্য ব্রিটিশরা আফগানিস্তানকে কব্জা করার চেষ্টা শুরু করেন। ফলে ব্রিটিশদের আগ্রাসী নীতি আফগানিস্তানের উপরে নেমে আসে, এর ফলে আফগানিস্তানের সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর তিনবার যুদ্ধ সম্পন্ন হয়।[৩০] যুদ্ধের ফলে আফগানিস্তানের উপরে যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। এর ফলে ব্রিটিশরা জোর করে 'ডুরান্ড' লাইন বর্ডার স্থাপন করে কিছু আফগান প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। এর ফলে বর্ডারের আশে পাশের মানুষ রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েন এবং ছিন্নমূল কিছু মানুষ দেশ না পেয়ে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।[৩১] পরে আফগানিস্তানে একের পর এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। রাজতন্ত্রের অবসানের পর শুরু হয় প্রজাতন্ত্র। আফগানিস্তানে একের পর এক রাজা, বাদশা এবং আমিরদের মধ্যে নিরন্তর বিবাদ চলতে থাকে। ফলে আধুনিক আফগানিস্তানের ভিত্তি খুব একটা শক্তভাবে গড়ে ওঠেনি। এর কারণ আমির দোস্ত মহম্মদ, আমির আমানুল্লা, আব্দুর রহমান, জাহির শাহসহ এমন অনেক যোগ্য আফগান নেতারা আফগানিস্তানের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র আফগান প্রদেশ গঠনে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। তবুও এই বিচ্ছিন্ন অবস্থা আফগানদের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হননি। এর ফলে আফগানরা সংকটের মধ্যে পড়েন দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

আফগানিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা কীভাবে আফগানিস্তানের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে আরও সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল সে বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য উঠে আসে আফগানিস্তানের ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যেমন ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে চলে মুজাহিদিনদের শাসনপর্ব। এই সময়ে সোভিয়েত বাহিনীর রেখে যাওয়া বোমা, গোলা, বারুদের স্তুপ আফগানিস্তানের শহরগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, মুজাহিদিনদের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্বে আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের জীবন নির্বিকারে চলে যায়। এর ফলে বহু আফগান দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পলায়ন করেন এবং আফগানিস্তানের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির তৈরি হয়। এর পরে দেশের ব্যবসা- বাণিজ্য চরম সংকটের মধ্যে পড়ে দিশাহীন অবস্থায় পতিপন্ন হয়, দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করে। ফলে আফিমের মতো ব্যবসা আফগানিস্তানের কৃষিজমির বৃহৎ অংশকে দখল নিতে শুরু করে এবং আফগানিস্তানে অবাধ আফিমের ব্যবসা শুরু হতে থাকে। এই আফিমকে কেন্দ্র করেই আফগানিস্তানের উপরে বিদেশি শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাজেই আফগানিস্তানের সংকটকালীন অবস্থা আরও চরমে গিয়ে পৌঁছায়।[৩২] তবে আফগানিস্তানের উপরে আসল আঘাত নেমে আসে তালিবানের (১৯৯৬-২০০১) মতো অগণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা হলে। এই অবস্থায় দেশটি আবার বিপদজনক পরিস্থিতির মুখে পতিত হয়। কারণ তালিবান বাহিনী আফগানিস্তানের গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আফগান জাতীয় সরকারের আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক নীতি থেকে একাধিক আইনকানুন লঙ্ঘন করে দেশের স্বাধীনতাকে বিনিষ্ট করে দেন। যাঁরা এই সময়ে তালিবান শক্তির আধিপত্যবাদকে অগ্রাহ্য করেছিল, তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কাজেই আফগানরা বাধ্য হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে শুরু করে এবং আফগান অভিবাসনের ঢল নামতে শুরু করে আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে।

ধর্মীয় উদ্দীপনা ও পাশতুন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ তালিবানরা নন-পাশতুনদের সঙ্গে কিছুতেই মৈত্রী গড়ে তুলতে পারেননি। এর ফলে বিগত দু-হাজার বছর ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্তঃরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের ক্ষেত্র হিসাবে আফগানিস্তান বিশ্বের দরবারে নিজেদের স্বাধীনদেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে পারেনি। আফগানিস্তানের হাজার বছরের

সোনালি অধ্যায়ে এবং আফগান কীর্তিগাথার যে অধ্যায় ছিল, তা একদিক থেকে যেমন তাকে গৌরবদান করেছিল। অন্যদিকে তেমনই এই জনপদের উপরে নেমে এসেছিল হাজার সমস্যা। তবে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা যে আফগান শরণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মদত দিয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই সাধারণ আফগানদের দেশান্তরিত হওয়ার সঙ্গেই মুজাহিদিনদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ার পরে তালিবানদের ভয়ে হাজার হাজার মুজাহিদিন সমর্থকরা আশ্রয় নিল আফগানিস্তানের প্রতিবেশি দেশগুলিতে। আবার কেউ কেউ চলে গেছেন শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে। এই সমস্ত আফগান শরণার্থীদের একটা বিরাট অংশের ঠাঁয় হয় পাকিস্তান ও ইরানে। ভারতবর্ষেও কিছু আফগান মুসলিম এবং আফগান হিন্দু এবং শিখ আফগানরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল সেই সময়ে।[৩৩] সুতরাং খুব সহজেই অনুমেয় আফগানদের অভিবাসনের পিছনে আফগানিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক কতটা দায়ী ছিল। আসলে আফগান জাতিগুলি একাধিক উপজাতিতে বিভক্ত হওয়ার কারণে কোনও দিন তাঁদের নিজেদের মধ্যে খুব একটা ঐক্য গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে তাঁদের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়েছে বিদেশি শক্তিগুলি। নিজেদের এই সমস্যার কারণে আজও আফগানিস্তানের শরণার্থীরা ভারতের মতো দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তবে আফগানদের এই সংকটজনক অবস্থা থেকে অব্যহতির চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন হামিদ কারজাই এবং আরসাফ গনি সরকার। উভয়েই চেষ্টা করেছিলেন বিদেশি সাহায্য গ্রহণ করে আফগানিস্তানকে সু-সংগঠিত করার। এছাড়া যে সমস্ত আফগানরা রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অন্যদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের স্বদেশে ফেরানোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন এঁরা। কিন্তু তাঁদের এই সংগঠিত প্রয়াস বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফল হয়নি। কাজেই ভূ-রাজনৈতিক সংকট যে আফগান অভিবাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

৩.৬. আফগান কাবুলিওয়ালাদের ভারতবর্ষে আগমনের প্রাথমিক পর্ব

ঔপনিবেশিক আমলে আফগান কাবুলিওয়ালাদের ভারতবর্ষে আগমনের পিছনে আফগানিস্তানের আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা যেমন দায়ী ছিল, তেমনই বাসস্থান হিসাবে ভারতবর্ষকে নির্বাচন করার পিছনেও অনেকগুলি যুক্তি কাজ করে।

পরাধীন ভারতে আফগানরা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে শুরু করেছিলেন তখন ব্যবসা- বাণিজ্যে ও জীবিকা নির্বাহ ছিল মুখ্য কারণ। তবে এর সঙ্গে কয়েকটি গৌণ কারণ তাঁদের ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রসঙ্গত খান আব্দুল গফফর খানের নির্দেশে সীমান্তের পাঠানরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের ফলে অনেক আফগান এই সময় থেকেই ভারতবর্ষে বসবাস করতে শুরু করেন। উদাহরণ হিসাবে বর্তমানে 'অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ' সংগঠনের সদস্যদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। যাঁরা সীমান্ত গান্ধির নির্দেশে ভারতের মধ্যে অবস্থিত পাঠানদের একত্রিত করে সংগঠনের সভাপতি লালাজান খানকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এছাড়া আরও একটি বিষয় পাঠানদের ভারতের দিকে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯২০ এবং ১৯৩০ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জাতীয় কংগ্রেস ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। এই সময়ে ভারত এবং পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে যখন দুটি দেশ ভাগ হয়ে গেল তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আইনসভা ভারতের পক্ষে যোগ দেওয়ার জন্যে ভোটদান করেছিলেন। বিনিময়ে ভারত তাঁদের স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন।[৩৪] এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় দুটি দেশের মধ্যে মিত্রতার বন্ধন কীভাবে গড়ে উঠেছিল। এই মিত্রতার উপরে ভিত্তি করে আফগানদের ভারতে বসবাসের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও সমস্যা ছিল না। ঔপনিবেশিক আমলে খুঁজে পাওয়া সরকারি নথিতে ১৯৩০ এর দশক থেকে আফগানরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে ছিল তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৫] তবে প্রথম দিকে দিল্লি, পাঞ্জাবের মতো প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়লেও কলকাতা অভিমুখে তাঁদের আগমন ঘটেছিল ধীরে ধীরে।

তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আফগানদের ভারতে আগমনের ক্ষেত্রে একাধিক প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল। কারণ দুটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ততই মজবুত হয়েছে। বিশেষত ভারত সরকার ১৯৫১ এবং ১৯৬৭ সালে রিফিউজি কনভেনশনে যোগ না দিয়েও UNHCR এর নিয়মকে মান্যতা দিয়ে আফগান অভিবাসিত মানুষের জন্য আশ্রয় দিয়েছিলেন।[৩৬] ফলে তখন থেকেই আফগানদের

ভারত সম্পর্কে উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতের সঙ্গে আফগানদের এই যোগাযোগ নির্মাণ আফগান পাঠানদের এদেশে বসবাসের ক্ষেত্রে অনেকটা নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণান ১৯৬৩ সালে কাবুল এবং কান্দাহার গিয়ে বলেছিলেন- 'ভারত এবং আফগানিস্তানের সম্পর্ক অতীতের নিরিখে একইভাবে বজায় থাকবে, মাঝখানে ঘটে যাওয়া কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এই সম্পর্কের উপরে কোনও প্রভাব ফেলবে না'।[৩৭] ১৯৫৯ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর জওহরলাল নেহেরু আফগানিস্তানে গিয়ে আফগানিস্তান এবং ভারতের সম্পর্ক বিষয়ে বলেছিলেন Afganisthan has been "good friend and neighbour" not only in the past but the present as wall.[৩৮] ভারতের পক্ষ থেকে এই ধরনের আশ্বাস দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ভিত মজবুত করেছিল। একইভাবে এই সম্পর্কের প্রেক্ষিত আফগানদের ভারতে আগমনের পথ প্রশস্ত করেছিল। কারণ দুটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মজবুত হওয়ার কারণে খুব সহজেই দু-দেশের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক, আর্থিক এবং সামাজিক মেলবন্ধন স্থাপন হয়েছিল। UNHCR এর তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আধিপত্যবাদের ফলে প্রায় ৬০,০০০ আফগান দেশ ছাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান ছাড়ার পরে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি আরও সংকটজনক অবস্থার মধ্যে পড়ে। দেশের মধ্যে অনাচার, গৃহযুদ্ধ, নাজিবুল্লাহ সরকারের পতন, তালিবানদের আবির্ভাব, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ ইত্যাদি কারণে আফগানরা অভিবাসিত হতে বাধ্য হয়।[৩৯]

কাজেই আফগানদের ভারতবর্ষে আগমনের প্রেক্ষাপটের মধ্যে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকট যেমন দায়ী ছিল, তেমনই কাবুলিওয়ালাদের ভারতবর্ষে আগমনের ক্ষেত্রে দু-দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি এবং ভারত সরকারের সঙ্গে আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক অতীত যোগাযোগের ইতিহাস বিশেষভাবে কাজ করেছিল।

সূত্র: সত্তর বছর আগে কলকাতাতে পাশতুন জনগোষ্ঠীর মানুষ, গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা, ২২.০৪.২০১৮)।

৩.৬.১. ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আফগান জনগোষ্ঠীর বসতি

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অভিবাসিত মানুষের বিরাট বৈচিত্র্য আছে ভারতবর্ষে। এই বৈচিত্র্য বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতের গরিমাকে প্রজ্বলিত করেছে যুগে যুগে। আফগানরা ছিল ঠিক এমনই একটি জনগোষ্ঠীর মানুষ যাঁরা আজ থেকে কয়েক দশক আগে ভারতে আসেন। কলকাতায় ‘কাবুলিওয়ালা’ নামে প্রসিদ্ধ হলেও সারা ভারতে ‘পাখতুন’ জনগোষ্ঠী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশ এই সমস্ত পাখতুন জনগোষ্ঠীর মানুষ বসতি স্থাপন করেছিলেন। আগমনের একেবারে প্রাথমিক পর্বে দিল্লি, বোম্বায়, কলকাতা, পাঞ্জাবের মতো শহরগুলিতে এঁরা নিজেদের ঘাঁটি বেঁধেছিলেন।[৪০] বড়ো শহরগুলিতে পাখতুনরা এসেছিলেন কারণ এই সমস্ত শহরগুলিতে প্রাত্যহিক জীবনধারণ করা ছিল অনেকটা সহজ। শহরকেন্দ্রিক এই জীবনে কাবুলিরা খুব সহজে অভিযোজিত করতে পেরেছিলেন, কারণ পরিবর্ত পেশার চাহিদা মেটাতে শহর ছিল তাঁদের কাছে একমাত্র ভরসা। কাজেই কলকাতাসহ ভারতের অন্যান্য ছোটো শহরগুলিতেও তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন, কারণ ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে আফগানদের জন্য ছিল উন্মুক্ত। কাজেই খুব সহজে এরা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে আফগান অভিবাসনের ধারা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। কারণ আফগানিস্তানের সংকটময় পরিস্থিতি আফগান নাগরিকদের দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল। এই সময় আফগানরা সড়কপথে বা রেলযোগে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে পাঞ্জাবে এসে পৌঁছাতেন। পাঞ্জাবের অমৃতসর থেকে আত্রি রোড হয়ে সরাসরি কলকাতাসহ পশ্চিমবাংলার দিকে অগ্রসর হতেন।[৪১] আফগান অভিবাসিরা এইভাবে ভারতের দিল্লি, কলকাতা, বিহার, পাঞ্জাব, ফিরোজপুর, উত্তরপ্রদেশ, আসামসহ একাধিক রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়েন। এই সমস্ত আফগানদের মধ্যে বেশিরভাগ আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশ থেকে প্রথমে দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে নাগরিকত্বের জন্য নাম নথিভুক্ত করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েন।[৪২]

তবে বর্তমানে দিল্লি এবং কলকাতায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পাখতুন জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস রয়েছে। ভারতবর্ষের এই দুটি শহরে আফগানরা সর্বাধিক বসবাসের অন্যতম কারণ ছিল কাজের সুযোগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা। দিল্লিতে অভিবাসিত আফগান জনগোষ্ঠীরা রেস্টুরেন্ট এবং হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কলকাতাতেও রয়েছে আফগান কাবুলিদের হোটেল।[৪৩] যা দেখে খুব সহজে অনুমান করা যায় আফগান কাবুলিদের এই দুই রাজ্যে সংখ্যাধিক্য রয়েছে। তবে দিল্লির চাঁদনি চকের কাছে বাল্লিমারা গলিতে এই সমস্ত আফগানদের চোখে পড়ে। ১৯৭৯ এবং ২০০৯ সালে দিল্লিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আফগান অভিবাসি মানুষের আগমন ঘটেছিল। কারণ ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণের ফলে প্রায় ১৪,০০০ হাজার এবং ২০০৯ সালে নাজিবুল্লাহ সরকার পতনের পরে তালিবানরা আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলের পরে দিল্লিতে প্রায় ১০,০০০ আফগান অভিবাসী মানুষের আগমন ঘটেছিল। ২০০৯ সালে দিল্লির লাজপথ নগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে যে প্রায় ১০,০০০ আফগান অভিবাসি আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ৯০ শতাংশ হিন্দু এবং শিখ বাকি ১০ শতাংশ পাশতুন এবং হাজারা জনগোষ্ঠীর মানুষ।[৪৪] কাজেই দিল্লির লাজপথ নগরকে বলা হয় ‘মিনি কাবুল’। কারণ এখানে শতাধিক আফগান অভিবাসিত মানুষের বসবাস রয়েছে। এখানে আফগানদের নিজস্ব হোটেল, খাবারের দোকান, রেস্টুরেন্ট রয়েছে।[৪৫]

তবে সুরাট, অসম, পাটনা, রাঁচির মতো রাজ্যগুলিতে এই সমস্ত পাখতুন জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস আছে।[৪৬]

৩.৭. পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আফগান কাবুলিওয়ালাদের বসতি

ভারতবর্ষের যে সমস্ত অঞ্চলে পাখতুন জনগোষ্ঠীর মানুষদের অভিবাসন হয়েছে তার মধ্যে একটি বড়ো অংশের মানুষের বসবাস ছিল পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অংশে। যাঁরা বাংলাতে যতটা না 'পাখতুন' নামে পরিচিত তার থেকে বেশি খ্যাত 'কাবুলিওয়ালা' নামে। বাংলাতে এই আফগান কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনের পর্ব শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলে। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের রচনার সময়কাল থেকে তা খানিকটা উপলব্ধি করা যায়।[৪৭] এছাড়া আদমশুমারি থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রাপ্ত নথিগুলি থেকে জানা যায় আফগানদের বাংলাতে আগমনের সময়কাল মোটামুটি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। আফগানিস্তানের গজনি, গাদরেজ, সারানসহ বেশ কয়েকটি প্রদেশ থেকে আফগান কাবুলিওয়ালারা প্রথমেই কলকাতাতে এসেছিলেন, এর পরে ধীরে ধীরে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৪৮]

আফগানিস্তান থেকে আগত এই সমস্ত কাবুলিরা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নিজেদের বাসস্থান স্থাপন করেছেন। কলকাতা লাগোয়া হাওড়া জেলা ছাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা, বীরভূম, বাঁকুড়া, দিনাজপুর, নদিয়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ইত্যাদি জেলাগুলিতে কাবুলিওয়ালারা বসতি স্থাপন করেছিল।[৪৯] এর পর পশ্চিমবঙ্গের জেলা লাগোয়া শহরগুলিতে আফগান কাবুলিরা ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এই সমস্ত কাবুলিরা শুধুমাত্র পেশার টানে এখানে আসেননি, তাঁরা অনেকেই এমন আছেন স্বেচ্ছায় আফগানিস্তান ছেড়ে চলে এসেছেন। এই সমস্ত আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন যাঁদের পূর্বপুরুষ বহু বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছেন, সেই সূত্রে অনেক আফগান পরিবার পশ্চিমবঙ্গে নিরাপদ আশ্রয় মনে করে এখানেই বসতি স্থাপন করেছেন। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই সমস্ত আফগান জনগোষ্ঠীর মানুষ

পশ্চিমবঙ্গে আগমনের ইতিহাস পাওয়া যায়। ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব আইন অনুসারে এঁরা নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কারণ পাসপোর্ট বা ভিসার যে নিদিষ্ট মেয়াদ থাকত, সেই মেয়াদ অনুযায়ী আফগান কাবুলিওয়ালারা ভারতে থাকার সুযোগ পেতেন।[৫০]

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে কয়েকটি জেলাতে কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর, নদিয়া, বর্ধমান, কলকাতা ও হাওড়া। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার ছিল অন্যতম।[৫১] এই জেলাগুলিতে কাবুলিওয়ালাদের সবচেয়ে বেশি দেখা মিলত। গন্তব্যের ক্ষেত্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মফসস্‌লের জেলাগুলি ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ। এইভাবে ধীরে ধীরে আফগান কাবুলিওয়ালারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি রচনা করেছিলেন তখন বাংলাতে ব্রিটিশরা রাজত্ব করছেন। ধারণা করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় কাবুলিওয়ালাদের প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের গল্পের রচনাকাল এবং পশ্চিমবঙ্গের আদমশুমারির তথ্য থেকে অনুমান করা যায় আফগানরা কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু আগে থেকেই বসবাস করছিলেন।

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত আফগান নাগরিকরা শুধুমাত্র জেলাগুলিতেই বসবাস করতেন না। এঁরা পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলার প্রত্যন্ত শহরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিলেন পেশাগত জীবনের টানে। যেমন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার ইছাপুর, বাটানগর, বজবজ, ডায়মন্ড হারবার, টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, মাটিয়াব্রুজ, দমদম, টালিগঞ্জ, বারাসাত, কামারহাটি, গড়িয়া বাজার, বারুইপুর, আলমবাজার, শ্যামনগর, কাঁচড়াপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলগুলিতে আফগান কাবুলিওয়ালাদের দেখা গিয়েছিল।[৫২] উত্তর চব্বিশ পরগণার এই অঞ্চলগুলি ছিল আফগান কাবুলিওয়ালাদের আদি বাসস্থান। স্বাভাবিকভাবে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হিসাবে আফগানরা খুব সহজে এই অঞ্চলগুলিকে জীবিকা নির্বাহ এবং পেশাগত সুবিধার কারণে বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সুবিধার্থে অবিভক্ত উত্তর চব্বিশ পরগণা বিভক্ত হয়ে গেলে। উত্তর চব্বিশ পরগণার বেশ কিছু অংশ দক্ষিণ কলকাতায় ও উত্তর

কলকাতার মধ্যে চলে আসে। ফলে আফগান কাবুলিওয়ালারা মধ্যে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কারণে উক্ত অঞ্চলগুলিকে বাসস্থানের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। সাম্প্রতিকসময়ে উক্ত অঞ্চলগুলিতে কলকাতার কাবুলিয়ালাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে নানা কারণে। তবে এখনও এই অঞ্চলগুলিতে কাবুলিওয়ালাদের দেখা মেলে। হারিয়ে যাওয়া কাবুলিওয়াদের একটা বড়ো অংশের বসবাস এখনও এই অঞ্চলগুলিতে আছে।[৫৩]

পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলার মধ্যে কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলা হাওড়া জেলায় আফগান কাবুলিরা বসতি স্থাপন করেছিলেন। হাওড়াতে কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসিত হওয়ার মূল কারণ ছিল হাওড়া একদিক দিয়ে যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনেকটা উন্নত ছিল সেই সময়ে। অন্যদিকে রেলপথ এবং জলপথে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ ছিল। আবার একইভাবে হাওড়া ছিল কলকাতার পার্শ্ববর্তী শহর ও শহরতলী, স্বভাবতই আফগানরা খুব সহজে হাওড়া থেকে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হতেন।[৫৪] কাজেই হাওড়া জেলার শিবপুর, সালকিয়া, আমতা, উলুবেড়িয়া, পঞ্চাননতলা, বিলিয়াস রোডের মতো অঞ্চলগুলিতে কাবুলিওয়ালাদের বাসস্থান ছিল।[৫৫] এই অঞ্চলগুলিতে কাবুলিরা নানা রকমের পেশার সঙ্গে নিযুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হাওড়াতে যে সমস্ত কাবুলিওয়ালারা এসেছিলেন এঁরা সকলেই আফগানিস্তান থেকে পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে, আবার কখনো বানপুর বর্ডার হয়ে কলকাতাতে প্রবেশ করে হাওড়া জেলার প্রত্যন্ত শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এছাড়া হুগলি জেলাতে আফগান কাবুলিওয়ালাদের একটা বড়ো অংশ অভিবাসিত হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালের দিকে আফগানরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হয়ে হুগলিতে বসবাস করতেন। ফলে হুগলি জেলার তেলিনীপাড়া, আরামবাগ, তারকেশ্বর, জঙ্গিপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলে আফগান কাবুলিওয়ালাদের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫৬] হুগলিতে কাবুলিরা পাটকলের ঠিকা শ্রমিক, ফেরিওয়ালা এবং শুকনো ফলের ব্যবসার সঙ্গে নিজেদের নিযুক্ত রেখেছিলেন। তবে নদিয়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষত কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাট এই দুই অঞ্চলে আফগান কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনের চিত্র ধরা পড়ে বৃহৎ প্রেক্ষিতে।[৫৭] কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাটের মতো বড়ো

শহরগুলিতে এঁরা নিজেদের ঘাঁটি গড়েছিল মূলত এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুবিধা ছিল। নদিয়া এবং রানাঘাট অঞ্চলে আফগান কাবুলিরা সুদের কারবার এবং কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। এই সমস্ত কাবুলিরা কলকাতা থেকে মালপত্র ক্রয় করে জেলা শহরগুলিতে নিয়ে বিক্রি করতেন।[৫৮]

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও কাবুলিওয়াদের বসবাস পরিলক্ষিত করা যায়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ির মতো জেলাগুলিতে কাবুলিওয়ালাদের একসময় অগাধ দেখা মিলত।[৫৯] উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগের পথ সুপ্রশস্ত থাকার কারণে পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চল থেকে কাবুলিওয়ালা ঢাকা হয়ে খুব সহজে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করতেন। দার্জিলিং এর কাবুলিওয়ালারা সাধারণত এসেছিলেন নেপালের প্রত্যন্ত সীমানা পেরিয়ে।[৬০] এছাড়া কলকাতা থেকে রেলযোগে বা সড়কপথে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও কাবুলিওয়ালারা প্রবেশ করেছিলেন। উত্তরবঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের আগমনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, এই অঞ্চলগুলিতে শুকনো ফলের ব্যবসা হিসাবে কাজু, কিসমিস, হিং এবং কাপড়ের ব্যবসার বাজার ছিল অনেকটা প্রশস্ত তবে সময়ের সঙ্গে পেশার ধরনের পরিবর্তনের ফলে বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এরপর ধীরে ধীরে জেলা শহরগুলি থেকে ক্রমশ মফফ্সলের দিকে ছড়িয়ে পড়েন। উত্তরবঙ্গের মাথাভাঙা অঞ্চলের অধিবাসী শ্রী অঙ্কন রায় বলেছেন, আজ থেকে পনেরো কুড়ি বছর আগে তিনি কাবুলিওয়ালাদের স্বচক্ষে দেখেছেন মাথাভাঙা অঞ্চলে। তিনি বলেছেন কাবুলিরা বড়ো পাঞ্জাবি পরিহিত, লম্বা চেহারার মানুষগুলি টাকা ধার দেওয়া (সুদের কারবার) ব্যবসার সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন।[৬১]

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে আফগান কাবুলিওয়ালারাদের একটা বড়ো অংশ বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ শহরগুলিতেও বসতি স্থাপন করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতবর্ষের নতুন করে নাগরিকত্ব আইন লাগু হলে বিদেশিদের ভারতবর্ষে আগমনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা এবং আইন চালু হয়। ফলে আফগানিস্তান থেকে আগত নাগরিকরা রেসিডেন্ট পারমিটের কাগজপত্র নিয়ে ভারতে প্রবেশ করতেন।[৬২] কাজেই পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো বর্ধমানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও আফগান

কাবুলিরা বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। বর্ধমান জেলার মধ্যে বর্ধমান টাউন, রানিগঞ্জ, আন্ডাল বাজার, আসানসোল, কুসুমগ্রাম, জামুড়িয়া, গলসি, মনিগজ্ঞ, মুনসি বাজার, কুলটিসহ একাধিক অঞ্চলে আফগান কাবুলিওয়ালাদের বসবাস ছিল।[৬৩] বর্ধমানের শহরগুলির মধ্যে রানিগঞ্জ এবং আসানসোল এই দুটি অঞ্চলে আফগান কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যেত। কারণ এই দুটি অঞ্চল সাধারণত শিল্পাঞ্চল হিসাবে ছিল বিখ্যাত। স্বাভাবিকভাবে কাজের সুযোগ ছিল বেশি, ফলত জীবিকা নির্বাহের তাগিদে কাবুলিরা এই অঞ্চলগুলিতে ছুটে গিয়েছিলেন। তবে সাম্প্রতিককালে ক্ষেত্র সমীক্ষাতে ফুটে উঠেছে বিশ শতকের চার এবং পাঁচের দশকে বর্ধমান জেলাতে যত সংখ্যক কাবুলিওয়ালাদের বসবাস ছিল বর্তমানে তা ক্ষীণপ্রায়।[৬৪] ক্রমশ কমতে শুরু করেছে এই জনগোষ্ঠীর আসল চেহারা। এখন বেশিরভাগ কাবুলিওয়ালারা কলকাতাকেন্দ্রিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে বীরভূম, মালদা, মেদিনীপুর জেলাগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ এই তিনটি জেলাতেও কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা কম ছিল না। এছাড়া মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলিতেও বেশকিছু কাবুলিওয়ালাদের দেখা গিয়েছিল। তবে বীরভূম জেলার কিছু বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিতে কাবুলিওয়ালাদের সন্ধান পাওয়া যায়।[৬৫] বীরভূমের রামপুরহাট, বোলপুর, সিঁউড়ি, সাঁইথিয়া অঞ্চলগুলিতে আফগান কাবুলিওয়ালাদের দেখা মিলত এক সময়। বীরভূম জেলার বোলপুরের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে কাবুলিরা একসময় সুদের ব্যবসাতে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া মালদা জেলার ইংলিশ বাজার, মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর, কাঁথি, মহেশপুর ইত্যাদি অঞ্চলে এখনও কাবুলিওয়ালাদের বসতি আছে। সাম্প্রতিককালে মেদিনীপুরের দাড়িবান্দ শহরে বেশকিছু কাবুলিওয়ালার দেখা মিলেছে। যাঁরা বিভিন্ন রকমের পেশার সঙ্গে নিজেদের নিযুক্ত রেখেছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে অবিভক্ত মেদিনীপুরে কাবুলিওয়ালাদের জনসংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।[৬৬]

ঔপনিবেশিক আমল থেকে কাবুলিওয়ালাদের বসবাস শুধুমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল না। মফফ্সলের গ্রামগুলিতেও তাঁরা বসবাস করতেন। তবে ১৯৭০ সালের পর

থেকে এঁরা ক্রমশ কলকাতা কেন্দ্রিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিভিন্ন কারণে। তবে কলকাতা ছাড়াও বর্তমানে মেদিনীপুর, বীরভূম, নদিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, কোচবিহার, দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে কাবুলিওয়ালাদের দেখা মেলে।

সারণি: ৩.১. পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আফগান জনসংখ্যার তালিকা (১৯৭১-২০১১)

জনগণনার সাল	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	
জেলার নাম	জনসংখ্যা					জেলাভিত্তিক মোট জনসংখ্যা
দার্জিলিং	০	৮৬	৩২০	১২	৮	**৪২৬**
জলপাইগুড়ি	০	১৫৮	৬০	৪৮	২০	**২৮৬**
কোচবিহার	০	০	০	৪	০	**৪**
উত্তর দিনাজপুর	০	০	০	০	৪	**৪**
দক্ষিণ দিনাজপুর	০	০	০	০	০	**০**
মালদা	০	০	২০	০	০	**২০**
মুর্শিদাবাদ	০	০	২০	৪	০	**২৪**
বীরভূম	০	০	০	৪	০	**৪**
বর্ধমান	০	৪০	২২০	২৬	২০	**৩০৬**
নদিয়া	০	০	২০০	০	০	**২০০**
উত্তর চব্বিশ পরগণা	৯৫	০	১২০	৬২	১৩৬	**৪১৩**
হুগলি	০	১৫২	০	২৬	৮	**১৮৬**
বাঁকুড়া	২০	১০	০	২০	৬	**৫৬**
পুরুলিয়া	০	৩০	৪০	৮	০	**৭৮**
মেদিনীপুর	৪০	০	২০	৮	০	**৬৮**
হাওড়া	০	৩০	৪০	৪৬	৬৪	**১৮০**
কলকাতা	**০**	**০**	**২৬০**	**১৭৪**	**৪২**	**৪৭৬**
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা	০	০	২০	২৪	২২	**৬৬**
মোট জনসংখ্যা	**১৫৫**	**৫০৬**	**১৩৪০**	**৪৬৬**	**৩৩০**	**২৭৯৭**

সূত্র: ১৯৭১ থেকে ২০১১ জনগণনা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তালিকা

৩.৮. আফগান কাবুলিওয়ালাদের কলকাতা আগমন ও বসতি স্থাপন

আফগান কাবুলিওয়ালারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কাবুলিওয়ালার বসবাস ছিল কলকাতায়। আফগানিস্তান থেকে যে সমস্ত কাবুলিওয়ালারা অভিবাসিত হয়ে বাংলার দিকে এসেছিলেন তাঁদের বেশিরভাগ অংশ কলকাতাকে বসতি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ কলকাতায় তখন শুধুমাত্র আফগানরা নয়, সারা পৃথিবী থেকে আসা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের বাসস্থান ছিল।[৬৭] কলকাতা মানেই যে শুধু ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির আস্ফালন বা স্থানীয় অধিবাসীদের কর্মকাণ্ড তা নয়, বহিরাগত নানা জাতির মানুষ বাণিজ্য বৃত্তি এবং স্ব-ধর্ম পালনের দ্বারা এই মহানগরীকে সমৃদ্ধ করেছিল। কলকাতার এই আন্তর্জাতিক সত্তার মধ্যে আফগানরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল। কলকাতার বৃহত্তর বৈদেশিক জনগোষ্ঠীর ছোটো ছোটো অংশ কলকাতাকে বাসস্থান হিসাবে গ্রহণ করার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল উনিশ শতকে কলকাতা ছিল বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে অতি উল্লেখযোগ্য প্রাণকেন্দ্র। স্বাভাবতই কাবুলিওয়ালারা কলকাতাকে বেছে নিয়েছিলেন বাসস্থান হিসাবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ জেলাগুলিতে কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসন হলেও, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আফগান অভিবাসনের ক্ষেত্র ছিল কলকাতা শহর। কলকাতাকে কেন্দ্র করে আফগান অভিবাসন শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক আমল থেকেই। আফগান কাবুলিরা সারা ভারতে যে কয়েকটি প্রদেশে অভিবাসিত হয়েছিলেন তার মধ্যে কলকাতা ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কলকাতা শহরে আফগান অভিবাসনের মূল ধারা শুরু হয় বলে মনে করা হয়। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'কাবুলিওয়ালা' গল্প থেকে সেই ধারণার জন্ম নেয়। তবে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে এই সমস্ত কাবুলিওয়ালাদের কলকাতাকেন্দ্রিক জীবনযাপন আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ এই সময়ে কলকাতায় বিভিন্ন রকমের পেশার দিগন্ত খুলে গিয়েছিল।[৬৮]

আফগান কাবুলিওয়ালাদের কলকাতাতে বসতি স্থাপনের প্রেক্ষাপটকে দুইটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত ঔপনিবেশিক আমলে এবং দ্বিতীয়ত স্বাধীনতা

পরবর্তী সময়কাল থেকে একেবারে বর্তমান সময় পর্যন্ত। ঔপনিবেশিক আমলে যে সমস্ত কাবুলিওয়ালারা কলকাতাতে এসেছিলেন তাঁদের একটা বৃহৎ অংশের বসবাস ছিল পুরানো কলকাতার বেশ কিছু অঞ্চলে। এই সময়ে কাবুলিওয়ালাদের বসবাসের অন্যতম প্রধান অঞ্চল ছিল বড়োবাজার এলাকা, কাশিপুর এলাকা, ভবানীপুর, ধর্মতলা, কলুটোলা, খিদিরপুর এবং জাকারিয়া স্ট্রিটের মতো অঞ্চলগুলি।[৬৯] এই সব অঞ্চলগুলিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কাবুলিদের দেখা মিলত। কলকাতার হিন্দিভাষী অঞ্চলগুলি ছিল এঁদের বসবাসের মূলকেন্দ্র। এছাড়া এই সমস্ত অঞ্চল ব্যতীত কলকাতার অন্যান্য অংশেও বিচ্ছিন্নভাবে কাবুলিওয়ালারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে কলকাতা থেকে অনেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে অন্যত্র অনেকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সমস্ত আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই পেশোয়ারি কাবুলি ছিলেন।

তবে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে কাবুলিওয়ালাদের কলকাতা আগমনের ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় থেকে কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনের কারণগুলি আরও তীব্র হতে থাকে। আফগানিস্তানের একের পর এক বিদেশি আগ্রাসন এবং গৃহযুদ্ধের দামামা আফগানদের ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছিল। সমসাময়িক সময়ে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতিসাধন হয়েছিল। ফলে আফগানদের কলকাতা আগমনের পথ ক্রমশ সহজ হয়ে যাচ্ছিল। আফগানরা একসময় ভারতবর্ষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে থেকে যাওয়ার যে দাবি করেছিলেন, তাঁর পূর্ণতা না পেলেও পরবর্তীকালে দুটি দেশের মধ্যে অন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাতাবারণ দুটি দেশকে পাশাপাশি নিয়ে এসেছিল। একইসঙ্গে যেহেতু আফগানদের পূর্বপুরুষরা কলকাতাতে ছিলেন সেহেতু তাঁদের উত্তরপুরুষরা কলকাতাকে নিজেদের বাসস্থান হিসাবে বেছে নিতে উদ্যত হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের পর থেকে দিল্লির চেক পোষ্টগুলির দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে অসংখ্য আফগান জনগোষ্ঠীর মানুষ এই সময় থেকে কলকাতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন।[৭০]

কলকাতার অভিবাসিত আফগান কাবুলিওয়ালারা নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লেও, এই সমস্ত আফগানরা সাধারণত

দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রথমদিকে যখন এঁরা কলকাতাতে এসেছিলেন তখন ব্যবসার সূত্র ধরে ফলে এদের বেশিরভাগ অংশ ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। এই সময়ে কলকাতাতে বেশ কতগুলি স্থান ছিল যেখানে তাঁরা বসবাস করতেন। যেমন- লাল মহম্মদ খান নামের একজন কাবুলিওয়ালা তিনি আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশ থেকে কলকাতাতে এসেছিলেন সড়ক পথ ধরে ১৯৫২ সালে। তিনি সুদের কারবারের ব্যবসা করতেন, তার বাসস্থান ছিল ৫ নং আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা টালিগঞ্জ। আব্দুল করিম নামের একজন কাবুলিওয়ালার কথা জানা যায় যিনি আফগানিস্তানের সারান প্রদেশ থেকে কলকাতাতে এসেছিলেন। ইনি দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া বাজারের কাছে একটা বাড়ি ভাড়াতে থাকতেন। শাহ মহম্মদ খান নামের একজন কাবুলিওয়ালার কথা জানা যায় যিনি সুদের ব্যবসার সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫১ সালে কলকাতা এসে মেটিয়াব্রুজের বেঙ্গলি বাজারে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে কাবুলিওয়ালারা বসতি স্থাপন করেছিলেন।[৭১]

তবে পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মের সঙ্গে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। শুরুর দিকে মধ্য কলকাতাতে তাঁদের বাসস্থান সীমাবদ্ধ থাকলেও, পরবর্তীকালে তা প্রসারিত হয়েছে। নতুন প্রজন্মের কাবুলিওয়ালারা এখন নিজেদেরকে অনেকটা বদলে ফেলেছে। বর্তমানে কলকাতা শহরে এমন অনেক কাবুলিওয়ালা রয়েছেন যাঁরা ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে এদেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ গাটছাড়া বাঁধনে বেঁধেছেন। এইভাবে ধীরে ধীরে কলকাতাতে কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা ক্রমশ বর্ধিত হয়েছে। এমনকি এমন অনেক কাবুলিওয়ালা রয়েছেন যাঁরা কাবুলকে কখনও চোখেই দেখেননি। কারণ তাঁদের অনেকের জন্মই হয়েছে কলকাতাতে। বর্তমানে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অনেকেই বড়ো বড়ো ব্যবসার সঙ্গে নিযুক্ত রয়েছেন। আগের মত ছোটো ব্যবসার সঙ্গে তাঁরা যুক্ত নন, কলকাতায় তাঁরা রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা এসেছে, ভোটাধিকারের ক্ষমতা এসেছে, সরকারী সুযোগ সুবিধা মিলতে শুরু করেছে।

ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসন বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ ছিল স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারত সরকারের মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন। ভারত আফগান বিষয়ে সর্বময় উদার ভূমিকা পালন করে এসেছে। আফগানিস্তানের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে বরাবর সাহায্য করে এসেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু থেকে শুরু করে বর্তমানে নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত সকলেই আফগানিস্তানের ব্যাপারে সহানুভূতির ভূমিকা পালন করে এসেছেন। এমনকি আফগানিস্তানে যখন অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে তখন আফগান অভিবাসী মানুষদের ভারত আশ্রয়ের জন্যে বন্দোবস্ত করেছে। ফলে আফগানরা খুব সহজে ভারতের দিকে অগ্রসর হতে সাহস পেয়েছে। কাজেই আফগান অভিবাসনের চাপ খুব স্বাভাবিকভাবে কলকাতায় এসে পড়েছে। কারণ কলকাতার সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক সেই রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্প থেকে শুরু।

خدائی خدمت گار بھارت پختون جرگہ ہند کے صدر عامر خان کی قیادت میں پختونوں کی جانب
سے وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی کو مبارکباد اور گلہائے عقیدت پیش کیا گیا۔ زیر نظر تصویر میں
رائٹرس بلڈنگ کے لان میں پختونوں کی جماعت نظر آرہی ہے۔

সুত্র- কাবুলিওয়ালা সংগঠনের নেতা আমির খান, গবেষক নিজে সংগ্রহ করেছেন। (কলকাতা, ২২-০৪-২০১৮)

সারণি: ৩.২. ১৯৩৯ সালে কলকাতায় আগত কলকাতার আফগান নাগরিকদের নাম ও ঠিকানার তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	পিতার নাম	জন্মস্থান	ভারতে প্রবেশের সময়কাল	বর্তমান ঠিকানা	পাসপোর্ট নং
১.	আলম গুল	আত্তা গুল	খাজাখেল	১৮.০৫.৫০	কলকাতা	৫৯১/৩২৯৫৯
২.	আসরাফ খান	জামাল খান	মুসাখেল	১৬.০৫.৫০	কলকাতা	২৪/১০২৫৪
৩.	পিন্ডাই খান	হাজি খান	সারান	১৮.০৫.৫০	কলকাতা	১৩৪/৮১১০
৪.	বাবর খান	সাইদ খান	মহম্মদ খেল	১৮.০৫.৫০	কলকাতা	৯৩৬/৩১৫০৭
৫.	বিরাম খান	শের খান	ফাকির কালান	১৮.০৫.৫০	কলকাতা	৩৩১/৩১৫৫৩
৬.	মইউদ্দিন	আলাউদ্দিন	পালড খেল	১৮.০৫.৫০	কলকাতা	৩২৯/৩১৫৩১
৭.	জুমা খান	বারার	হারবান্ড	১৮.০৫.৫০	কলকাতা	৯১৩/৩৪৬৯
৮.	মহম্মদ হাসান	হাজি খানজি	ইউসুফখেল	০৯.০৫.৫০	কলকাতা	৬১০/৩১৫১৯
৯.	মহম্মদ আজম	মহম্মদ আকরাম	ইউসুফখেল	০৯.০৫.৫০	কলকাতা	১৫৩৮/১৫৩৭২
১০.	নুর মহম্মদ	মহম্মদ আলম	সারান	০৫.০৯.৫০	কলকাতা	৬১৩/২২১৩৬
১১.	গুলদান	জামাল খান	কার্টওয়াজ	১০.০৫.৫০	কলকাতা	৪৫৮/১৮৮৩৪
১২.	পিন্ডাই মহম্মদ	মহম্মদ	ইউসুফখেল	১০.০৫.৫০	কলকাতা	৩১৭/৮১০৮
১৩.	নেক মহম্মদ	আব্দুল ঘানি	সেইখমেল	১৬.০৫.৫০	কলকাতা	-----------
১৪.	ইয়ার মহম্মদ	গাদি	সেইখমেল	১৮.০৫.৫০	কলকাতা	------------

বিঃদ্রঃ: কলকাতায় আরও ততধিক আফগান নাগরিকের তথ্য পাওয়া যায়।

সূত্র: IB File No-236/1939 (16)- Afghan National Calcutta

৩.৯. পর্যবেক্ষণ

অভিবাসিত জনগোষ্ঠী হিসাবে কাবুলিওয়ালাদের ভারতে অভিগমনের পিছনে দ্বিমুখী কারণকে দায়ী করা যেতে পারে। অর্থাৎ একদিকে যেমন আফগানিস্তানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিপর্যয় তাঁদেরকে দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল। অন্যদিকে তেমনই ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আফগানিস্তানের তুলনায় অনেকটা উন্নতিসাধনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ফলে আফগানরা ভারতের কলকাতা, দিল্লির মতো বড়ো বড়ো শহরগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা

পেয়েছিল। আফগানিস্তানের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতির পিছনে আফগানিস্তানের কৃষিতে অনুন্নত, মাথাপিছু আয়ের নিম্নসীমা, আফগান উপজাতিগুলি মধ্যে দ্বন্দ্ব, ধর্মান্ধতা এমনকি আফগানির্স্তানে একের পর এক ব্রিটিশ, রাশিয়া, আমেরিকা এবং পাকিস্তান সরকারের নিরন্তর আক্রমণ আফগানিস্তানকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছিল। সমসাময়িক সময়ে দিল্লি এবং কলকাতার মতো শহরগুলি আফগানদের কাছে নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে হয়েছিল। কাজেই দিল্লি থেকে শুরু করে কলকাতার দিকে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিল। আফগানদের আগমনের শুরুর দিকে কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ফলে তাঁরা জীবন জীবিকার প্রয়োজনে বাংলার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছিল।

বাংলাতে আফগান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলিওয়ালারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং জেলার মধ্যে বিভিন্ন শহরগুলিতে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে। তবে কলকাতা ছিল কাবুলিওয়ালাদের প্রধান বাসস্থান। ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বসতি স্থাপন করলেও, বর্তমানে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. Satish Chandra: *History of Medieval India 800-1700*, (New Delhi, Orient Black Swan, First Published 2007), পৃ.পৃ. ৬৯-৭০।

২. দিলিপ ব্যনার্জি: *আফগানিস্তান একনজরে,* (কলকাতা, কারিগর, ২০২০), পৃ. ১০।

৩. Mohammad Ali: *A New Guide to Afghanistan*, (Kabul, Northern Pakistan Printing and Publishing Company, 1958).

৪. দেবাশিশ চক্রবর্তী, অধৃষ্য কুমার এবং স্বাতী বিশ্বাস (সম্পাঃ): *আফগানিস্তান এবং সমসাময়িক বিশ্ব,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০০১), পৃ. ৯।

৫. Central Intelligence Agency, *The World Factbook*, 2018.

৬. Louis Dupree: Afganistan, (Karachi oxford, New York and Delhi, Oxford University Press, 1997), পৃ. ৫৭।

৭. *তদেব,* পৃ.৫৯-৬৪।

৮. এম. শামসুল আলম: *আফগানিস্তান ও তালিবান,* (ঢাকা, বাংলাবাজার প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ.২১।

৯. Willem Vogelsong: *The Afghan*, (United Kingdom, Blackwell Publishers, 2002), পৃ.পৃ. ৪০-৪১।

১০. রমেশচন্দ্র চন্দ: *গান্ধারীর দেশে,* (কলকাতা, সেরিবান, নভেম্বর ২০২১)।

১১. Louis Dupree: *প্রাগুক্ত,* পৃ.৫৭।

১২. *Afganistan Encyclopaedia Britanica 2006*, পৃ.২৬। বিস্তারিত জানতে দেখুন *www Britannica.com.*

১৩. Edward C. Sachan: *Alberuni's India*, (London, Kegan Paul, Trench Trubner & co.Ltd, 1910).

১৪. M.K.A Siddique: *Muslims of Calcutta*, (Kolkata, Anthropological Survey of India, September 1974), বিস্তারিত জানতে দেখুন সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা ‘দেশে বিদেশে’ গ্রন্থ এবং রমেশচন্দ্র চন্দের লেখা ‘গান্ধারীর দেশে’ গ্রন্থে।

১৫. I.B File No: *File no- 236/ 1939, Afghan National in India.*

১৬. পান্থজন: *কাবুলের পথে পথে,* (কলকাতা, আনন্দ, ২০০৯), পৃ. ১৬৭।

১৭. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদগার, সভাপতি, কলকাতা] : *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৮.০৩.২০১৯)।

১৮. সৈয়দ মুজতবা আলী: *দেশে বিদেশে,* (কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৬), পৃ.৭১।

১৯. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: *কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ,* (কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৮),পৃ. ৭৭।

২০. M.K.A Siddique: *প্রাগুক্ত,* পৃ.৩১।

২১. রমেশচন্দ্র চন্দ: *প্রাগুক্ত,* পৃ.২৩৩।

২২. দেবাশিশ চক্রবর্তী, অধৃষ্য কুমার এবং স্বাতী বিশ্বাস (সম্পাঃ): *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪।

২৩. সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী: *সীমান্তের অন্তরালে,* (কলকাতা, জয়ঢাক প্রকাশনা, ২০১৭), পৃ.২৭।

২৪. রসিদ খান [৪৭, শুকনো ফল এবং কার্পেট ব্যবসায়ী, কান্দাহার]: *সাক্ষাৎকার।*

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে (১৯.১২.২০১৮)। সাধারণত শীতের শুরুতে কলকাতার বাণিজ্য মেলাগুলি শুরু হয়, এই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা তাঁদের দেশের পণ্যদ্রব্য নিয়ে কলকাতাতে আসেন প্রচার এবং বিক্রির উদ্দেশ্য। রসিদ খান এমনই একজন ব্যবসায়ী, যিনি আফগান পণ্যদ্রব্য নিয়ে কলকাতার বাণিজ্য মেলাগুলিতে প্রতিবছর চলে আসেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন-*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৯ই জানুয়ারি, ২০১৬। এবং *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৯ এ ডিসেম্বর, ২০১৫।

২৫. শেখ মকবুল ইসলাম: *ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কলকাতার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়,* (সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৩)।

২৬. পান্থজন: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৬৪-১৬৫।

২৭. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৫০-৫১।

২৮. পান্থজন: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৩-১৫।

২৯. *তদেব:* পৃ. ১৫।

৩০. Barnet R. Rubin: *The Fragmentation of Afghanistan, state Formation and Collapse in the International System*, (New Haven, CT, Yale University Press, 1955).

৩১. রমেশচন্দ্র চন্দ*: গাঁ শহর বিভূঁই দিল্লি ও কাবুল,* (কলকাতা, একুশ শতক, আগস্ট ২০১০), পৃ.পৃ. ২৩৬-২৩৭।

৩২. Shaista Wahab and Barry Youngerman*: A Brief History of Afganisthan,* খন্দকার মাহমুদ উল হাসান, সৈয়দ মমতাজ টুকু (অনুবাদ): আফগানিস্তানের ইতিহাস, (ঢাকা, দিব্য প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ ২০২১), পৃ.পৃ. ২৩৪-২৬০।

৩৩. Arpita Basu Roy: *Conceqences and Challenges of the Afghan Conflict: Situation Workable,* (kolkata, Jadavpur University, Doctor of Philosopy Thesis, 2014).

৩৪. রমেশচন্দ্র চন্দ: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৮৪-১৮৬।

৩৫. I.B File No: *236/1939 (16c), Afghan National in transits thus India to East Pakistan (Report).*

৩৬. Ashish Bose: *Afghan Refugees in India,* (Economic and Political Weekly, vol. 39, No. 43, October 2004), পৃ.পৃ. ৪৬৯৮-৪৭০০।

৩৭. *President Radhakrishnan's Speeches and Writing: May 1962-1964 India:* Ministry of Information and Broadcasting, Publication Division, 1965, পৃ. ৩০৩।

৩৮. Nehru Visit Afganistan, *Asain Recorder,* Vol. 5, No.40, October 3-9, 1969, পৃ. ২৯২৩।

৩৯. Jaci Eisenberg: *The Boatless People, The UNHCR and Afghan Refugees, 1978-1989*, (Geneva, Working Papers in International History, 2013), পৃ.পৃ.২৪-২৫।

৪০. I.B File No: *প্রাগুক্ত।*

৪১. I.B File No: *তদেব।* কলকাতা গোয়েন্দা দপ্তরের ১৯৩৯ সালের ফাইলগুলিতে পাওয়া যায় আফগানদের কলকাতাতে আসার তথ্য, তাঁদের প্রত্যেকেই প্রায় আত্রি রোড হয়ে, পাঞ্জাবের অমৃতসরের মধ্যে দিয়ে রেলযোগে কলকাতাতে পৌঁছাতেন।

৪২. I.B File No: *প্রাগুক্ত।*

৪৩. Mohammad Shafiq: *The Impact of Globalization: An insight into the Afghan Diaspora in India,* (Delhi, Jawaharlal Nehru University, School of International Studies, 2020).

৪৪. M Sharma: *Refugees in India working paper,* (India, Centre for Civil Society, No: 229, 2009).

৪৫. Aritry Das, Ankur Tanwar: *Inside India's Little Kabul by* (29 August, 2019) বিস্তারিত জানতে দেখুন- https://asiatimes.com/2019/08/inside-indias-little-kabul/.

৪৬. অগ্নি রায়: বদলেছে ঝুলি, নয়া দিগন্তে রহমতেরা, (আনন্দবাজার পত্রিকা, নয়াদিল্লী, ১৯ এপ্রিল, ২০১৫)।

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *কাবুলিওয়ালা,* (বিশ্বভারতি, সাধনা প্রত্রিকা, ১২৯৯)।

৪৮. I.B File No: *236/1939(16B), Foreigner/ Afghan National Entering India via Punjab en Route.*

৪৯. I.B File No: *236/1939 (16, 16B, 16C, 16E)* ফাইলগুলি বিস্তারিত দেখুন।

৫০. Home Political: *File No, 10A-1, Prog, B-317, 20 May, 1951 April- June.*

৫১. I.B File No: *প্রাগুক্ত।*

৫২. I.B File No: *236/1939 (Afghan National in Calcutta, Howrah, North 24 pargans).*

৫৩. *তদেব।*

৫৪. I.B File No: *236/1939(16), Afghan National in Howrah.*

৫৫. হাওড়াতে কাবুলিওয়লাদের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন- *H William warner, The kabuliwalas: Afghan Moneylending and the credit cosmopolis of British India, c 1880-1947,* (The Indian Economic and Social History Review, sage, 2020) পৃ. ১৮৬।

৫৬. I.B File No: *236/1939(16), Afghan National in Hooghly.*

৫৭. I.B File No: *236/1939 (16), Afghan National in Nadia.*

৫৮. I.B File No: *236/39 (16c), Afghan National in Nadia.*

৫৯. I.B File No: *236/39 (16, 16c),* ফাইলগুলি বিস্তারির দেখুন। এখানে শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি জেলাগুলিতে কাবুলিওয়ালাদের বসবাসের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

৬০. I.B File No: *236/1939 (16), Afghan National in Darjeeling.*

৬১. অঙ্কন রায় [৩৬, মাথাভাঙা, কোচবিহার]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আনিসুল হক, (২৫.০২.২০২২)।

৬২. I.B File No: *236/1939* এর ফাইলগুলিতে দেখা যায় যে সমস্ত আফগানরা ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকের কাছে ভারতে আগমনের জন্য তেমন কোনও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়া যায় না। কাজেই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে নাগরিকত্ব আইন পাশ হয়ে গেলে সরকার আফগান অভিবাসিত নাগরিকদের জন্য নতুন করে কাগজপত্র তৈরি করার নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে কাবুলিওয়ালারা সেই মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করেন। তবে যাঁরা এর পরেও ভারতে থাকার জন্য দরকারি কাগজপত্রের জোগাড় করতে পারেনি তাঁরা নাগরিকত্ব আইনের ফাঁদে পড়ে যায়। কাজেই তাঁরা গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

৬৩. I.B File No: *236/1939 (16), Afghan National in Burdwan.*

৬৪. আমির খান [৫৫, খোদাই-খিদমদগার, সভাপতি, কলকাতা]: *প্রাগুক্ত,* (১৮.০৩.২০১৯)।

৬৫. I.B File No: *236/1939 (16), Afghan National in Murshidabad and Mednipore.*

৬৬. I.B File No: *236/1939 (16c), Afghan National in Malda.*

৬৭. I.B File No: *236/1939, Afghan National in Calcutta.*

৬৮. I.B File No: *236/1939 (16), Afghan National in Calcutta.*

৬৯. তদেব।

৭০. Home Political Confidential: *File No- 10A-1, Prog- B3 to 157, 31 March, 1949.*

৭১. I.B File No: *236/39(16) Foreigners Afghan National in North 24 Parganas*

চতুর্থ অধ্যায়

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পর্যালোচনা

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর দ্বারা কলকাতা শহর শিল্প, বাণিজ্য এবং ইংরেজ পুঁজির পীঠস্থান হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কারণ ব্রিটিশ ভারতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী এবং কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভৌগোলিক অবস্থান ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে ছিল সহায়ক। কাজেই কলকাতার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কাবুলিওয়ালাদের জীবন ও জীবিকার চাহিদাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক জীবনের পৃথক ধরন থাকলেও, কলকাতার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাঁদের তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। ফলে কলকাতার ইতিহাসে কাবুলিওয়ালারা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে পেরেছিলেন। সুতরাং উক্ত অধ্যায়ে অভিবাসিত আফগান কাবুলিওয়ালারা কলকাতার বুকে কিভাবে নিজেদের আর্থ-সামাজিক জীবন থেকে রাজনৈতিক জীবন অতিবাহিত করে চলেছেন সেই বিষয়ের উপরে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত জীবন-জীবিকার কঠিন লড়াইয়ে কলকাতাকে গ্রহণ করে খুঁজে নিয়েছেন বিকল্প পেশা এবং বদলে ফেলেছেন রাজনৈতিক চেতনা। তবে এত বিপুল পরিবর্তনের মাঝেও কাবুলিওয়ালারা বাঁচিয়ে রেখেছেন নিজেদের সামাজিক সত্তা ও অভ্যেস। কাজেই অধ্যায়ের এই পর্যায়ে আফগান কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে।

৪.২. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (১৮৯২-১৯৪৭)

ঔপনিবেশিক আমলে আফগানিস্তানের অস্থির অবস্থা এবং আফগানদের জীবন জীবিকার সংকট জনিত কারণে আফগান কাবুলিওয়ালারা অভিবাসিত হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। ব্রিটিশ আমলে কলকাতা ছিল সারা ভারতবর্ষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র।[১]

কাবুলিওয়ালাদের আগমনের একেবারে প্রাক্‌কালে কোনও নিদিষ্ট পেশাকে বেছে নিয়ে তাঁরা কলকাতায় আসেননি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের জীবিকা নির্বাচন করেছেন অথবা পরিবর্তন করেছেন। ঔপনিবেশিক আমলে তাঁদের পেশার ধরন কেমন ছিল তা খানিকটা অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাবুলিওয়ালা গল্পে মধ্য দিয়ে।[২] সেই সময় কাবুলিওয়ালাদের অধিকাংশের বাসভূমি ছিল আফগানিস্তানের গজনি, গাদরেজ, মুসাখেল, কাবুল, কান্দাহার, পাকতিয়া প্রদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে। যাঁদের কলকাতা আগমনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ব্যবসা বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করা। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁরা কলকাতাতে অনেকদিন ধরে বসবাস করছেন। ফলে অনেকেই স্থায়ী ব্যবসাতে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে বেশীরভাগ ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যাঁরা অসংগঠিত শ্রমিকের পর্যায়ভুক্ত। কলকাতার মহাফেজখানা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় এই সমস্ত কাবুলিরা কলকাতাতে বিভিন্ন প্রকারের ছোট ব্যবসা থেকে শুরু করে ফুটপাথের ব্যবসার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছিলেন। ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালারা শহর থেকে মফস্‌সলের ছোট ছোট শহর গুলিতেও বসতি স্থাপন করতেন নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের কারণে। কাজেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের বসতি থাকলেও কলকাতা ছিল সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র, তাঁদের সমস্ত ব্যবসা কলকাতা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হত। ফলে কলকাতাসহ উত্তর চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং ইত্যাদি জেলাগুলিতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য করে জীবিকা অর্জন করতেন।[৩]

৪.২.১. কাবুলিওয়ালাদের পেশাগত জীবন

ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালাদের জীবিকা নির্বাহ ও পেশাগত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক চালচিত্রের একটা পরিষ্কার ছবি উঠে আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আফগানরা যখন কলকাতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন তখন তাঁরা কলকাতার অর্থনৈতিক জীবনে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য বেছে নিয়েছিলেন বিভিন্ন ধরনের পেশা। আফগানিস্তানের একাধিক প্রদেশ থেকে আসা আফগান কাবুলিরা কলকাতাতে আসতেন পার্শিয়ান কার্পেট, পোস্তিন (ভেড়ার ছালের কোট) বড়ো বড়ো বস্তায় করে হিং, শুকনো ফল ইত্যাদি নিয়ে।[৪] আফগানিস্তান

থেকে এই সব পণ্যদ্রব্য স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে কলকাতায় নিয়ে এসে অধিক মূল্যে বিক্রি করে নিজেদের মুনাফা অর্জন করতেন। তবে কাবুলিওয়ালাদের আগমনের একেবারে প্রাথামিক পর্বে আফগানিস্তান থেকে নিয়ে আসা পণ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য বেছে নিতেন মধ্য কলকাতাসহ উত্তর কলকাতার বড়ো বড়ো অঞ্চলগুলিকে। যেমন বড়বাজার, ধর্মতলা, খিদিরপুর, চিৎপুর, কাশিপুর, চাঁদনি চক ইত্যাদি অঞ্চলগুলিতে। তবে ধীরে ধীরে তাঁরা শহর ছেড়ে পায়ে হেটে মফফ্সলের গ্রাম গুলিতেও এই সমস্ত পণ্য দ্রব্য ফেরি করে বেড়াতেন। কাবুলিওয়াদের বিক্রিত শুকনো ফলের মধ্যে কাজু, কিসমিস, আখরোট ইত্যাদি ছিল অন্যতম। তবে এঁদের মধ্যে অনেকেই শুধুমাত্র এই সমস্ত পেশার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ছোট ছোট পেশাকেও বেছে নিয়েছিলেন, যেমন ঠিকা শ্রমিক, কল-কারখানাতে দিনমজুর, কাপড়ের ব্যবসা ইত্যাদি। কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালাদের সংগঠনের নেতা মিঃ আমির খান সাহেব তাঁর বাবার এবং চাচাদের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন- শৈশবে তাঁর বাবার মুখ থেকে শুনেছিলেন, যখন হাওড়া সেতুর নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছিল, সেখানে অনেক আফগান ঠিকা শ্রমিক নির্মাণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন।[৫]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক জীবনে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই সময়ে কলকাতাতে আফগান কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে অধিক লাভজনক পেশার দিকে তাঁরা ঝুকতে শুরু করেছিলেন। ফলে আফগান কাবুলিওয়ালারা বেছে নিয়েছিলেন সুদের ব্যবসাকে (Money Lending)।[৬] কাবুলিওয়ালাদের অনেকগুলি পেশার মধ্যে সুদে টাকা খাটানো ছিল অন্যতম প্রধান ব্যবসা। কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক অঞ্চলে কাবুলিওয়ালারা এই মহাজনি ব্যবসার পসাড় জমিয়ে ছিলেন। কাবুলিওয়ালারা যখন সুদের ব্যাবসা শুরু করেছিলেন, তখন কলকাতার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের জন্য সুদে টাকা দেওয়ার মতো কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে এই মহাজনি কারবারের বাজারে আফগানরা একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে যে সমস্ত কাবুলিওয়ালারা কলকাতায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগের পেশা ছিল সুদের কারবার। কাজেই আফগান কাবুলিওয়ালাদের নাম শুনলেই সাধারণ মানুষের মনে সর্বপ্রথম চলে আসে মহাজনি

কারবারের কথা। কাবুলিওয়ালাদের সংগঠনের নেতা আমির খান বলেন তাঁদের পূর্বপুরুষরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁরা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন তাঁর বাবা (ইয়ার মহাম্মদ খাঁ) নিজেই মহাজনি কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন এই পেশা একদিকে যেমন লাভজনক অন্যদিকে তেমনই ঝুঁকিও আছে।[৭]

১৯০১ সালে ভারতের জনগণনা অনুসারে বাংলায় আফগান সুদের কারবারির জনসংখ্যা ছিল ৪০০০ এর মতো। ঔপনিবেশিক আমলে ভারত সরকার রীতিমতো এই ব্যবসার জন্য কাবুলিওয়ালাদের লাইসেন্স প্রদান করেছিলেন।[৮] কারণ তাঁরা যাতে বৈধভাবে এই ব্যবসা করতে পারে। কাজেই কাবুলিওয়ালারা ঔপনিবেশিক আইন-কানুন সম্বন্ধে রীতিমতো সজাগ থাকতেন। সুদের কারবার খুব সংগঠিতভাবে পরিচালনা করার জন্য কাবুলিওয়ালারা নানারকমের আইনি কাজগপত্র নিজেদের হাতেই রাখতেন। কোনও দেনাদারের সঙ্গে সমস্যা হলেই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন কাবুলিরা।[৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ১৯১১ সালে হাওড়া কোর্ট চত্বরে কাবুলি পোশাক পরিহিত কাবুলিওয়ালাদের ভিড় উপচে পড়ত।[১০] আফগানরা মহাজনি কারবার গঠনমূলকভাবে করতে পারার জন্যে তাঁরা আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। কলকাতাসহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে কাবুলিওয়ালারা এইভাবে টাকা ছড়িয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। অনেক সময়ে মহাজনি কারবারের জন্য কাবুলিরা নিজেদের দেশ থেকে নগদ টাকা নিয়ে আসতেন। সেই টাকা এখানে এসে বিনিয়োগ করতেন। সুতরাং কাবুলিওয়ালাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই সুদের কারবারের সঙ্গে যুক্ত আছেন। ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন নথিপত্রে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় কাবুলিওয়ালারা এই সুদের ব্যবসার কারণে একাধিক সমস্যার মধ্যে পতিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৯১৯ সালে ২৮শে অক্টোবর 'বসুমতি' পত্রিকায় এই ঘটনার কথা উল্লেখ আছে-

> "Extortions by the kabuliwas, Migrant traders and moneylenders who were themselves a part of the cosmopolition city working class and the urban underbelly on the lower middle class and poor who also recurring problem. The Basumati (28 October) wrote that "the kabuli oppression"was increasing in Calcutta. Two Kabulis were sentenced to imprisonment for having assaulted a woman. In

another case, three kabuli's were find, and in another, one kabuli had been bound down. The paper demanded to know why the Government did not strike at the root of kabuli oppression in Bengal. We learn from newspaper that Mr Halliday, the commissioner of the Calcutta police, ordered all Kabulis to be deprived of their lathis and this order was to be carried out.But inspite of this measure, Kabulis were reportedly seen carrying big lathis in Calcutta streets.[১১]

ঔপনিবেশিক আমলে আফগান কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক জীবনে একটা মিশ্র অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত করা গিয়েছিল। তাঁরা ধীরে ধীরে শহর কলকাতার জীবনের সঙ্গে নিজেদের অভিযোজিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যে জীবিকা নির্বাহের জন্য ক্রমবর্ধমান পেশা পরিবর্তনের ঈঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। একেবারে শুরুর দিকে কাবুলিরা যেমন খুব পরিশ্রম করে কলকাতার অফিস, কাচারি, গৃহস্থের বাড়ি ফেরিওয়ালাদের মতো করে পণ্যদ্রব্য ফেরি করে বেড়াতেন শহর থেকে শহরতলি, মফসস্‌লের থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে। পরের দিকে তাঁরা অনেকটা বদলে ফেলেছিল। ফলে স্থায়ী ব্যবসার দিকে তাঁরা লক্ষ দিতে শুরু করেন। ১৯৩৯ সালের পর থেকে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে এই বদলটি শুরু হয়। পুরনো দিনের সুদের ব্যবসা অপরিবর্তিত রেখেই পরিবর্তন নিয়ে আসে অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রে। নতুন ব্যবসা হিসাবে পুরনো কাপড়ের ব্যবসা, নতুন কাপড়ের ব্যবসা, দর্জির দোকান, গৃহস্থের বাড়িতে কাজ, রান্নার কাজ ইত্যাদি পেশায় কলকাতার কাবুলিওয়ালারা নিযুক্ত হতে শুরু করেছিলেন।[১২] একই সঙ্গে কলকাতা শহরে ছোট ছোট দোকান ভাড়া নিয়ে একাধিক নিত্য নতুন ব্যবসাতে তাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই আবার শহরতলির বড়ো বড়ো শহরগুলিতেও নিজেদের বসতি স্থাপন করেছিলেন, কারণ এই সব অঞ্চলে কম দামে দোকান ভাড়া নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে থাকেন। এই সমস্ত শহরতলির বাজারগুলিতে আফগান পণ্যদ্রব্যের চাহিদা মন্দ ছিল না। বিশেষ করে বিভিন্ন পালা-পার্বণের দিনগুলিতে আফগান কাবুলিওয়ালাদের বিক্রি করে অনেকটা বেড়ে যেত। তবে ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমবর্ধমান প্রসারিত হলেও, তাঁরা আর্থিকভাবে নিজেদেরকে তেমনভাবে সংগঠিত করতে পারেননি।

৪.৩. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক জীবন (১৯৪৭-২০১৬)

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লাভের পর থেকে কলকাতার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যে কোনও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় মানুষের জীবনধারণের কৌশল এবং তার প্রভাব এসে পড়ে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপরে। তখন পরিবর্তনশীল সেই সময়ে নিজেদেরকে যুগের সঙ্গে অভিযোজিত করে বেঁচে থাকতে হয়। কলকাতার কাবুলিওয়ালারাও ঠিক এমন একটা সংকটের সম্মুখীন হতে শুরু করেছিলেন। কলকাতা মহানগরে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় পেশাগত জীবনে তাঁরা ক্রমাগত লড়ায়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সংকটপূর্ণ এই অবস্থায় নিজেদের অস্তিত্বকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক জীবন যেমন ছিল, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তার বদল ঘটে অনেকটা। তাই একদিকে যেমন পুরনো পেশা ছেড়ে নতুন পেশাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নানা রকমের সমস্যা হচ্ছিল। তেমনই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পুরনো পেশাগুলিতে আগের মতো আর লাভজনক হচ্ছিল না। ফলে আর্থিক জীবনের এই দ্বৈত সংকটের সম্মুখীন হয়ে কাবুলিওয়ালাদের কলকাতা শহরে বেঁচে থাকা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। কাজেই অনেকেই অস্তিত্বের এই কঠিন লড়াই এ টিকে থাকতে না পেরে আফগানিস্তানের দিকে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ফলে দিনে দিনে কলকাতাতে কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসতে শুরু করে। তবে যাঁরা অস্তিত্বের এই লড়াইয়ে কলকাতাতে থেকে যান, তাঁরা নতুন নতুন পেশার দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

৪.৩.১. কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনের সংকট

ঔপনিবেশিক সরকারের আমল থেকেই কাবুলিওয়ালাদের জীবনে নেমে এসেছিল পেশাগত সংকট। ফলে আর্থিক দিক থেকে তাঁরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই প্রবণতা আরও চরম আকার ধারণ করেছিল। যদিও এই সংকটের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত কাবুলিওয়ালারা তাঁদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ব্যবসা গুলিতে আগের মতো সে-ভাবে আর লাভবান হচ্ছিলেন না, ফলে তাঁরা বিপন্নতার সম্মুখীন হতে শুরু করে। পূর্বের মতো শহর কলকাতার বাজারগুলিতে

হিং, সুরমা, কাজু, কিসমিস, আতরের ব্যবসা থেকে শুরু করে পুরনো কাপড় ও রেডিমেট কাপড়ের ব্যবসা অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে। ফলে আগের মতো এই সমস্ত ছোট ছোট ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কাবুলিওয়ালারা একচ্ছত্র আধিপত্য হারাতে শুরু করেন। কারণ কলকাতার স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে অ-বাঙালি ভারতীয়রা এই সমস্ত পেশায় নিযুক্ত হতে থাকেন, যাঁদের মূলধন ও স্থানীয় যোগাযোগের সঙ্গে আফগান কাবুলিওয়ালারা কিছুতেই পেরে উঠছিলেন না।[১৩] একই সঙ্গে আগেকার দিনে যেমন কাবুলিওয়ালারা সুদূর আফগানিস্তান থেকে পণ্যদ্রব্য নিয়ে এসে কলকাতার বাজার ধরার চেষ্টা করতেন, পরবর্তীসময়ে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের সঙ্গে পণ্য নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসার ক্ষেত্রে খরচ অনেক বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে অনেক সময় কলকাতার কাবুলিওয়ালারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পণ্যদ্রব্য নিয়ে এসে- আফগানিস্তানের পণ্যদ্রব্য হিসাবে কলকাতার বাজারে বিক্রি করতে শুরু করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পণ্যদ্রব্যের গুণমান প্রশ্নের মুখে পড়তে থাকে এবং কলকাতার বাজারগুলিতে কাবুলিওয়ালারা ক্রমশ নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে থাকেন। কাজেই এই সমস্ত কারণের সহযোগে কাবুলিওয়ালারা পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে নতুন পেশার খোঁজে নিজেদের নিয়োজিত করতে উদ্যোগী হয়।

কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালাদের অধিকাংশের মূল পেশা ছিল সুদে টাকা খাটানো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই এই পেশার জগতেও তাঁরা নানা রকমের সমস্যার মধ্যে পড়তে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাবুলিওয়ালা গল্পের আফগান কাবুলি রহমতকে দেখা যায়, কীভাবে সুদের টাকা দিয়ে বিবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একইভাবে কলকাতার বসবাসরত কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় সুদের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বিবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা। কাজেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুদের ব্যবসা থেকে অনেকেই নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়া আরও একাধিক সমস্যার কারণে কাবুলিওয়ালাদের নতুন প্রজন্ম সুদের ব্যবসা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। অনেক সময় কাবুলিরা সুদে টাকা ধার দিয়ে সমস্যাতে পড়তেন, নির্ধারিত সময়ে সুদ সমেত আসল টাকা বাজার থেকে তুলে আনা তাঁদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। কারণ যাঁরা সুদে টাকা ধার নিতেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে না পারলে, এই টাকা অনাদায়কে কেন্দ্র করে কাবুলিওয়ালারা বিবাদে জড়িয়ে পড়তেন। ফলে

কাবুলিওয়ালারা থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাচারি, মামলা মোকদ্দমাতে জড়িয়ে পড়তেন।[১৪] কাজেই একটা সময়ের পরে এই অর্থ লগ্নির পেশা থেকে অনেক কাবুলিওয়ালা নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার অর্থলগ্নির বাজারের একটা বড় অংশ মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের হাতে চলে যেতে লাগল ফলে অর্থলগ্নির ব্যবসাতে কাবুলিওয়ালাদের একক আধিপত্যের দিন শেষ হতে শুরু হল। কলকাতার মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের হাতে যেহেতু প্রচুর পরিমাণে নগদ অর্থ ছিল, সেহেতু এই অর্থলগ্নির ব্যবসাতে কাবুলিওয়ালাদের পিছনে ফেলে দিল। এমনকী মাড়োয়ারিরা এই ব্যবসাতে একচ্ছত্র কায়েম করার জন্য কাবুলিওয়ালদের এই পেশা থেকে সরে যেতে নানা রকমের কৌশলের আশ্রয় নিতে শুরু করলেন। যেমন কাবুলিওয়ালাদের ভয় দেখানো, শারীরিক নিগ্রহ, পুলিশকে নিয়ে নানা রকমের সমস্যায় জড়িয়ে ফেলার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে গেলেন।[১৫] ফলে কাবুলিওয়ালারা নিজেরাই এই পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন অনেকেই। ১৯৩০ সালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় বাংলায় আফগানদের অর্থলগ্নির পরিমাণ ছিল প্রায় তিন মিলিয়ন টাকা।[১৬] ১৯৩৯ সালে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আইন অনুসারে একটি ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করেন ভারত সরকার। যেখানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জন্য Money-Lender Act তৈরি করেছিলেন,[১৭] সেখানে বাংলার জন্য Bengal Money-Lenders Act 1933 এবং 1940 এর ফলে মহাজনি কারবার নানা রকমের নিয়ম কানুনের মধ্যে দিয়ে যেতে থাকে। ফলে কাবুলিওয়ালারা সরাসরি এই ব্যবসাতে আগের মতো আর উৎসাহ পেতেন না। কাজেই কাবুলিওয়ালারা ধীরে ধীরে এই পেশা থেকে সরে আসছিলেন তা জানা যায় ১৯৪০ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে। যেখানে লক্ষ করা যায় কাবুলিওয়ালারা বাজারে পড়ে থাকা মোট টাকার ৬০ শতাংশ তুলে নিয়েছিলেন। এরপর ১৯৪৮ সালে ভারতের জাতীয়তাবাদী সরকার যখন ক্ষমতায় এলেন তখন পাকাপাকিভাবে কাবুলিওয়ালদের এই ব্যবসা থেকে সরে যেতে নির্দেশ প্রদান করলেন, যেখানে বলা হল কাবুলিওয়ালারা যেন আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই অর্থলগ্নির ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেন। একইসঙ্গে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আফগানিস্তান থেকে সরাসরি নগদ অর্থ আমদানির উপরেও নানা রকমের বিধিনিষেধ জারি হল।[১৮] এর ফলে কাবুলিওয়ালাদের অর্থলগ্নির ব্যবসা বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হল। তাঁরা একদিকে যেমন

আগে থেকে বাজারে ছড়ানো টাকা উদ্ধারে সমস্যার সম্মুখীন হলেন, অন্যদিকে টাকার অভাবে নতুন করে অন্য ব্যবসার দিকে যেতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলেন।[১৯]

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবনে পেশাগত সংকটের পিছনে একাধিক কারণের মধ্যে অন্যতম ছিল সুদের ব্যবসা থেকে কাবুলিওয়ালাদের উত্তর প্রজন্ম ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া। এছাড়া নবীন প্রজন্মের আফগানরা বুঝতে পেরেছিল সুদে টাকা খাটানো ইসলামের পরিপন্থী। এমনকি এই ব্যবসার কারণে আফগানদের ভাবমূর্তি যে বিনষ্ট হচ্ছে তা তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ফলে সুদের কারবার থেকে তাঁরা সরে আসতে উদ্যত হয়। যাঁর ফলস্বরূপ কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে আর্থিক সংকট প্রকাশ্যে এসেছিল। তবে কলকাতায় যত কাবুলিওয়ালার সন্ধান পাওয়া যায় তাঁরা অনেকেই বর্তমানে সুদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন। যদিও পরিবর্তিত পেশার যুগে কাবুলিওয়ালারা পুরনো দিনের মতো এই ব্যবসা করেন না। বর্তমানে তাঁরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ব্যবসা করে থাকেন।

৪.৩.২. কাবুলিওয়ালাদের পরিবর্তিত অর্থনীতির খোঁজ ও নতুন পেশার দিগন্ত

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবনে পেশাগত সংকটের কারণে তাঁরা পরিবর্তিত পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নতুন পেশার দিশার খোঁজে নিজেদের নিয়োজিত করতে শুরু করেছিলেন। কলকাতা মহানগরে কাবুলিওয়ালাদের নতুন পেশার দিকে যাওয়া একদিক থেকে যেমন ছিল ঝুঁকিপূর্ণ, অন্যদিকে তেমনই পুরনো পেশাতে অস্তিত্বের সংকট। কাজেই তাঁরা নতুন নতুন কাজের মধ্যে নিজেদের সংযুক্ত করার প্রয়াস অনুভব করেছিলেন।

পরিবর্তিত পেশার মাঝে পড়ে পূর্ববর্তী পেশা ছেড়ে সকলেই যে চলে এসেছিলেন একথা বলা যায় না। তবে অনেকেই কলকাতার মতো শহরে নতুন পেশার দিকে ঝুঁকেছিলেন। যেমন বড়বাজার এলাকায় মুদির দোকানের কর্মচারী, পাইকারি ব্যবসা, আফগান মশলার ব্যবসা এবং কাপড়ের মতো ব্যবসাতে কাবুলিওয়ালারা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে যাঁরা একটু আর্থিকভাবে সচ্ছল, তাঁরা অনেকেই কলকাতায় স্থায়ী দোকান নির্মাণ করে একাধিক ব্যবসা করতে শুরু করেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে

কলকাতার নিউ মার্কেট, বড়বাজার, মির্জা গালিব স্ট্রিটের আফগান ব্যবসায়ীদের দোকানগুলি যার বড় প্রমাণ। এছাড়া অনেকেই ধর্মতলা চত্বরে দর্জির দোকানের মতো পুরনো পেশাকে বড় আকারে স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এই দোকানগুলিতে কাবুলিওয়ালারা ভারতীয় ব্রান্ডের কাপড় গুজরাটের সুরাট থেকে আমদানি করে কলকাতার প্রান্তদেশে ছোট ছোট দর্জির দোকানে সরবরাহ করে থাকেন। তারপরে সেই কাপড়ের তৈরি স্যুট বানিয়ে আসাম, পাটনা, রাঁচির মতো রাজ্যগুলিতে রপ্তানি করতে থাকেন, যেখানে পাখতুন জনগোষ্ঠীর লোকের বসবাস আছে।[২০]

এছাড়া কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নতুন পেশার মধ্যে অন্যতম হল দুম্বার (ভেড়া জাতীয়) মাংস বিক্রি। দুম্বার মাংস ভারতের বসবাসকারী পাখতুন জনগোষ্ঠী পরিবারগুলিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খাবার। ফলে দুম্বার মাংসের চাহিদা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদনি, বড়বাজারের মতো এলাকাগুলিতেও। বাঙালিরা ইদানিং আগ্রহ দেখাচ্ছে মাংসের 'সুরুইয়া'ই। আশি বছর আগে সৈয়দ মুজতবা আলী 'দেশে বিদেশে' গল্পে এই দুম্বার মাংসের কথা বর্ণনা করেছিলেন, যা কিনা কাবুলের সেই আগা আব্দুর রহমানের তৈরি 'ঘিয়ে ঘন করে সেরখানেক দুম্বার মাংস'।[২১] দুম্বার মাংসের ব্যবসায়ী মোহাম্মাদ নাজিমের বসতি দিল্লি চাঁদনি চকের কাছে বিল্লিমারাও গলিতে। এখানেই বছরের বেশ কয়েকবার আফগানিস্তানের ধনী ব্যাবসায়ীরা কাবুল থেকে দুম্বার শুকনো মাংস নিয়ে আসেন এবং পুরনো দিল্লিতে তাঁরা পাইকারি দরে বিক্রি করেন। নাজিমের কথায়- "আমরা দিল্লি থেকে ৬০০ টাকা কেজি দরে মাংস কিনে কলকাতায় ফিরি, পশ্চিমবঙ্গে তা দ্বিগুণ তিনগুণ দামে বিক্রি করি।" ঈদের সময় এই বিক্রি আরও বেড়ে যায়।[২২]

বর্তমানে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা অনেকেই আর্থিকভাবে বেশ স্বচ্ছল। আগের মতো প্রথাগত ফেরিওয়ালার মতো পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করেন না। আধুনিক যুগের কাবুলিওয়ালারা পুরনো পেশার দিকে ফিরতে চাইছেন না। কারণ এঁদের মধ্যে অনেকেই কলকাতার নাগরিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন। ফলে চাহিদা এবং রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পেশার ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। কেউ কেউ আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

কাবুলিওয়ালাদের সন্তান-সন্ততি পেশার তাগিদে লেখাপড়া শিখে চাকরি করতেই বেশি আগ্রহী। ইউসুফ খানের পুত্র আরাফাত খানের (কলকাতায় বসবাসকারী আফগান) সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে সে কলকাতার নাম করা ইংলিশ মিডিয়ামে পাঠরত। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এছাড়া কলকাতাতে এমন অনেক আফগান অভিবাসী পরিবার আছেন, যাঁরা কলকাতার নামকরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। অনেকেই আবার বিভিন্ন ধরনের মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলিতে কলকাতার সাধারণ নাগরিকদের মতো চাকরি-বাকরি করছেন।[২৩]

কলকাতার খিদিরপুর এলাকাতে বহুবছর ধরেই কাবুলিওয়ালাদের বসবাস। খিদিরপুর এলাকা বন্দর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে কাজের সুযোগ অনেক বেশি। এই অঞ্চলের কাবুলিওয়ালারা অনেকেই খিদিরপুর ডক অঞ্চলে ঠিকা শ্রমিকের কাজ, কল-কারখানাতে শ্রমিকের কাজ এবং অনেকেই প্রোমোটারি ব্যবসার সঙ্গে নিযুক্ত আছেন, যাঁদের দেখলে বোঝার উপায় নেই এঁরা আফগান বংশোদ্ভূত। এছাড়া কলকাতার উপনগরী হিসাবে পরিচিত রাজারহাটে নিউটাউন এলাকাতে এঁদের অবাধ দেখা মেলে, উপনগরী অঞ্চলগুলিতে ঠিকাদারি ব্যবসা করে এঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন।[২৪] কাবুলিওয়াদের এই পেশার বহুমুখীতা আজও ভারতবর্ষের মতো দেশে তাঁদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে।

কলকাতার আফগান জনগোষ্ঠী পরিবর্তিত পেশা হিসাবে অনেকেই আবার বেছে নিয়েছেন আফগান খাবারের ব্যবসা। আফগান খাবার কলকাতাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষভাবে পরিচিত পেয়েছে। কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিট, পাকসার্কাস, বড়বাজার, নাখোদা মসজিদের আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে বর্তমানে আফগান খাবারের দেখা মেলে। এইসব অঞ্চলগুলিতে কাবুলিরা খাবারের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তবে কলকাতার আফগানদের মধ্যে অনেকেই আছে যাঁরা অনেকেই বিত্তশালী, এঁরা নিজেদের 'কাবুলিওয়ালা' জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। এঁরা সরকারকে রীতিমতো ট্যাক্স দিয়ে, সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনেই ব্যবসা করছেন, নিজেদেরকে আফগান ব্যবসায়ী হিসাবেই পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। এঁরা সাম্প্রতিক সময়ে শুধুমাত্র ব্যবসার তাগিদে আফগানিস্তান থেকে কলকাতাই এসে বড়ো বড়ো ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছেন। রাজারহাট

উপনগরী এবং সল্টলেক সেক্টর-৫ এর 'কাবুলিওয়ালা' রেষ্টুরেন্ট এবং পার্কসার্কাস এলাকাতে 'কাবুল কলকাতা রেষ্টুরেন্ট' ছিল তার বড় প্রমাণ।

সারণি: ৪.১. ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালাদের পেশার তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	পেশা	ক্রমিক সংখ্যা	পেশা
১.	সুদের ব্যবসা)Money Laundering(	৫.	কাপড়ের ব্যবসা (Garments Business)
২.	পুরনো কাপড়ের ব্যবসা (Old Garments Hawking)	৬.	হোটেল কর্মী (Hotel Employee
৩.	হিং বিক্রেতা (Asafoetida Sellers)	৭.	ছোট ব্যবসা (Petty Traders)
৪.	শুকনো ফল বিক্রেতা (Dry Fruit Seller)	৮.	গৃহভৃত্য (Domestic Servant)

সূত্র: IB File No-236/1939

৪.৩.৩. কাবুলিওয়ালাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগ

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতার আফগান জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা বড় অংশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি না হলেও এঁদের মধ্যে অনেকেই উন্নত, সংগঠিত ও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক জীবনের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই সমস্ত আফগানরা নিজেদের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের উপরে জোর দিয়েছিলেন। ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা নিজেদের সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। এই সমস্ত আফগানদের একটা বড় অংশ সাম্প্রতিকসময়ে কলকাতায় এসেছেন। ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে এঁদের নিত্য যাওয়া আসা লেগেই থাকে। ভারত সরকার কর্তৃক নির্দেশিত সমস্ত আইন-কানুন মেনেই এঁরা কলকাতায় ব্যবসা- বাণিজ্য করেন। এঁরা নিজেদের 'কাবুলিওয়ালা' হিসাবে পরিচয় করতে অপারগ বরং অনেক ক্ষেত্রে এঁরা নিজেদের আফগান ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচয় দিতে বেশি

স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এঁরা মূলত বড় ব্যবসায়ী, এঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে। কাজেই কলকাতার আর পাঁচটা সাধারণ কাবুলিওয়ালাদের মতো এঁদের জীবন নয়।[২৫]

এই সমস্ত আফগান ব্যবসায়ীরা কান্দাহার থেকে শুকনো ফল ক্রয় করে জালালাবাদ হয়ে পেশোয়ারের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে আসেন। এরপর কলকাতার ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কাছে তা বিক্রি করেন। এছাড়া এই সব শুকনো ফলের গুণমান অত্যন্ত ভালো হওয়ার কারণে ভারত সরকারের কাছ থেকে ব্যবসায়িক ছাড়পত্র নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাণিজ্য মেলাগুলিতে কাবুলিওয়ালারা তাঁদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।[২৬] কলকাতার মতো বড়ো বড়ো শহরগুলিতে তাঁরা কয়েক মাসের জন্য এই সব পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসেন। এতে একদিকে যেমন আফগানিস্তানের শুকনো ফল, পোশাক, কার্পেট, আফগান জুয়েলারি ইত্যাদির প্রচার ও পরিচিতি বাড়ে, অন্যদিকে তেমনই আফগান পণ্যের ব্যবসার প্রসারও ঘটে। ২০১৬ সালে কলকাতার বিধাননগরে অনুষ্ঠিত 'বাণিজ্য মেলাতে' (Trade Fair) আফগান পণ্যদ্রব্য নিয়ে একটি স্টলের আয়োজন করেন আয়োজকরা।[২৭] যেখানে আফগান পণ্যদ্রব্যের বিক্রি চোখে পড়ার মতো। দোকানের কর্মচারি মহম্মদ রসিদ খানের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে উঠে আসে একাধিক তথ্য। তিনি বলেন আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এই সমস্ত কাঁচামাল নিয়ে এসে তাঁরা নিজেরাই প্রক্রিয়াজাত করে উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্যগুলি বিশ্বের বাজারে নিয়ে আসেন।[২৮] তিনি বলেন ভারতে তাঁদের শুকনো ফলের বড় বাজার আছে। তবে মিঃ রসিদ সাহেবের কথা অনুযায়ী এই ব্যবসার সঙ্গে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের প্রত্যক্ষ কোনও যোগাযোগ নেই। তবে কলকাতার বাজারে আফগান শুকনো ফলের ক্রেতাঁরা কাজু, কিশমিশ, আখরোট, হিং, কোবানি বলতেই মনে করেন এ তো কাবুলিওয়ালাদের দেশের পণ্য। প্রসঙ্গত ভারত সরকার এবং আফগানিস্তানের মধ্যে ২০০৩ সালে PTA (Prefrential Trade Agreement) নামক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে ভারতের বাজারে আফগান শুকনো ফলের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়েছিল বহুগুণ।[২৯] কাজেই এই সমস্ত ব্যবসার সঙ্গে কাবুলিওয়লাদের কোনও যোগাযোগ না থাকলেও বাঙালিদের মনে রয়ে গেছে কাবুলিওয়ালাদের স্মৃতি।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পের সূত্র ধরে আফগানদের নিয়ে বাঙালি মানসপটে একটা নস্টালজিয়া চিরকাল ছিল। ফলে 'কাবুলিওয়ালা' নামকে সামনে রেখেই কলকাতার বাজারে আফগান ব্যবসায়ীরা শীতের শুরুতে বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য নিয়ে বিক্রয় করতে আসেন। এঁরা কেউই কলকাতার কাবুলিওয়ালা নয়, তবে সকলেই আফগান জনগোষ্ঠীর মানুষ। সকলেই প্রায় সারাবছর আফগানিস্তানে থাকেন, তবে শীতের শুরুতে দিল্লিতে অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করেন। এঁদের সঙ্গে কলকাতার আফগানদের নিত্য যোগাযোগ থাকে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার হো-চি-মিন সরণির হ্যারিংটন স্ট্রিটের আর্ট গ্যালারিতে আফগানিস্তান থেকে নিয়ে আসা পণ্যদ্রব্য নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন কয়েকজন আফগান ব্যবসায়ী। আয়োজিত এই প্রদর্শনীর নাম ছিল 'The Kabuliwalee', এই প্রদর্শনীতে তিনজন আফগান দায়িত্বে ছিলেন।[৩০] এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মিঃ সমীর খান যিনি কাবুলের বাসিন্দা। সমীর খান রকমারি আফগানি কার্পেট ও গালিচা নিয়ে এসেছিলেন প্রদর্শনীতে বিক্রির উদ্দেশ্যে। এছাড়া ওয়ালি খান এবং নুরি খান নামক আরও দু-জন সহযোগী ব্যবসায়ী ছিলেন তাঁর সঙ্গে, এঁরা উভয়েই কাবুলের বাসিন্দা। ওয়ালি খান দায়িত্বে ছিলেন আফগান পোশাক ও জুয়েলারির এবং নুরি খান দায়িত্বে ছিলেন উৎকৃষ্ট আফগানি শুকনো ফল, সুগন্ধি আতর বিক্রির। সুদূর আফগানিস্তান থেকে নিয়ে আসা এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যগুলির মধ্যে আফগানি কার্পেট, গালিচা, দরজা জানালায় ব্যবহৃত পর্দা যা আফগানি নকশায় আবৃত।[৩১] এছাড়া পোশাকের মধ্যে আফগানিস্তানের রাজা বাদশাদের অনুকরণে নির্মিত একাধিক ডিজাইনে, যা পুরনো আফগান স্মৃতিকথার মিশ্রণে আবৃত। এছাড়া শুকনো ফলের মধ্যে কাজু, কিশমিশ, সাদা বাদাম, জালগোজা, কাটজাদি বাদাম, কুবাণী, আখরোট, আমন্ড, কেশর ইতাদির সম্ভার ছিল এই 'The Kabuliwalee' প্রদর্শনীতে। মিঃ সমীর খানের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যগুলি আফগানিস্তানের সমরখন্দ, সামালি, কান্দাহার, জালালাবাদের মতো স্থান থেকে থেকে নিয়ে আসা হয়। সমীর খানদের মতো একাধিক আফগান ব্যবসায়ীরা সারা পৃথিবীতে এইভাবে আফগানি পণ্যের ব্যবসা করেছেন। প্রসঙ্গত 'Benazir Yakta Trading' নামক একটি ব্যবসায়ী সংস্থা আফগানি শুকনো ফলের

কারবারে ভারতের দায়িত্বে আছেন। এছাড়া পির নাজির তুর্কমেন নামক একজন আফগান জুয়েলারি ব্যবসায়ীর কথা জানা যায়, যিনি আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরিফের বাসিন্দা।[৩২] বর্তমানে দিল্লিতে থাকেন, নাজির তুর্কমেন ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউতে Ice Skating Ring নামক স্থানে একটি প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয় আফগান পণ্যদ্রব্যের বিক্রির উদ্দেশ্যে।

আফগানিস্তান থেকে আগত এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের একই ভাবলে ভুল হবে, সে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবে এঁরা সকলেই আফগানিস্তানের নাগরিক, কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে এঁদের তেমন সম্পর্ক নেই, এঁরা ভারত সরকারকে রীতিমতো ট্যাক্স দিয়েই এই সমস্ত ব্যবসার ছাড়পত্র পেয়েছেন। এই সমস্ত আফগান অভিবাসী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালাদের কোনও যোগসূত্র নেই। তবে যেহেতু এঁরা জন্মসূত্রে আফগান এবং কর্মসূত্রে কলকাতাতে এসেছেন জীবিকা নির্বাহের জন্য, তাই নিজেদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে 'কাবুলিওয়ালী' (The Kabuliwalee) নামকরণের মধ্যে দিয়ে কলকাতার বাঙালি সমাজে বিশেষ পরিচিতি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কাজেই কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নামের সঙ্গে যে একাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, যে কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সাম্প্রতিককালে অনলাইনের মাধ্যমে কাবুলিওয়ালা নামকরণে বিভিন্ন সংস্থা ভারতবর্ষে আফগানি পণ্যের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। আধুনিকতা এবং যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'কাবুলিওয়ালা' নামেই চলছে এই সমস্ত ব্যবসা, যেমন 'Kabuliwala' এবং 'Kabul fruit & Nuts Consortia' নামের সংস্থা দুটি সারা ভারতে আফগান পণ্যের ব্যবসাতে প্রতক্ষভাবে সংযুক্ত আছে।[৩৩]

সূত্র: কলকাতায় কাবুলিওয়ালী নামক সংস্থা আফগানী পণ্যের প্রদর্শনী থেকে গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা, ২২.০২.২০২০)।

৪.৪. কলকাতায় বিকল্প আফগান পণ্যের চাহিদা ও বিপণনে কাবুলিরা

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্প এবং বর্তমানে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের কথা মনে এলেই অজান্তেই চলে আসে তাঁদের আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের কথা। এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কাজু, কিশমিশ, আখরোটের মতো আফগানি শুকনো ফল ছিল জগদ্‌বিখ্যাত। তবে আফগানরা শুধুই যে আফগানিস্তানের শুকনো ফলের আমদানি করতেন তা নয়। কলকাতাতে তাঁরা বিকল্প পণ্যের যোগানদার হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এক্ষেত্রে আফগান 'মশলার' ব্যবসা ছিল অন্যতম। আফগানরা বিকল্প ব্যবসা হিসাবে কলকাতার বড়ো বড়ো রেস্তোরাঁগুলিতে নিয়মিত মশলা যোগানের ব্যবসা করতেন। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বিকল্প পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কলকাতার রেস্তোরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ রেস্তোরাঁগুলিতে আফগান পদ বানানোর কাজে আফগান

মশলার প্রয়োজন হয়। মশলার একান্ত চাহিদা তাঁদের বিপণনের ক্ষেত্রে জোয়ার এনেছিল। এ প্রসঙ্গে কলকাতার সল্টলেকের কাফিলা রেস্তোরাঁর কথা উলেখযোগ্য।[৩৪] এই কাফিলা রেস্তোরাঁর থিমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আছে কাবুলিওয়ালাদের দেশ। খাবারের মেনু থেকে অন্তরসজ্জার নকশা, রেস্তোরাঁতে বাজতে থাকা সুর সবেতেই আফগান ছোঁয়া। রেস্তোরাঁর মালিকের থেকে জানা যায়, এই রেস্তোরাঁতে যে সব খাবারের চাহিদা বেশি, তাঁর বেশিরভাগ তৈরি হয় আফগানিস্তান থেকে নিয়ে আসা মশলা থেকে। যেমন 'আফগান কলমি', 'দেয়াজে মশলুক', 'কান্দাহারি লাহাম', 'কিধনু গোস্ত' ইত্যাদি। কাজেই আফগান খাবারের বানানোর ক্ষেত্রে উপকরণ হিসাবে আফগান মশলার চাহিদা কলকাতায় খুব বেশি।[৩৫]

সিআইটি রোডে আফগানি রেস্তোরাঁর মালিকের নাম জাকির হুসেন। তিনি বলেন অনেকে আফগানিস্তনের শুকনো ফলের চাহিদার কথা বলছেন ঠিকই, তবে আফগানি পদ রান্নার জন্য যে সমস্ত মশলার প্রয়োজন হয় তা আসে সরাসরি আফগানিস্তান থেকে। তবে এই মুহূর্ত আফগানিস্তানের যা অবস্থা তাতে করে মশলা নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে, কাজেই বোঝাই যাচ্ছিল জাকির হুসেন আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক সমস্যার কথা বোঝাতে চাইছিলেন। তিনি বলছিলেন আফগানিস্তান থেকে সরাসরি মশলা নিয়ে আসা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দিতে হবে। শেষবারে যা মশলা নিয়ে আসা হয়েছিল তা বড়জোর দু-মাস চলবে। সুতরাং অনুমান করা যাচ্ছে আফগান মশলার অভাবে কলকাতার বাজারে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। আফগানিস্তান থেকে ভারতে মশলা আমদানি ব্যবসাতে জড়িত বড়বাজার অঞ্চলের হামিদ রাজা সাহেব বলেছেন আফগানিস্তান থেকে নিয়ে আসা মশলা শুধুমাত্র রেস্তোরাঁয় নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।[৩৬] এই মশলা কলকাতার বাজারে রীতিমতো পাইকারি হারে বিক্রি হয় এবং বড়বাজারে অনেক ব্যবসাদার এই ব্যবসার সঙ্গে নিযুক্ত আছেন। বিশেষত আফগানিস্তানে অশান্তি পরিবেশ যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকে মশলার দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ফলে বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা এই মশলা গুদামজাত করে রেখেছেন অসময়ে অতি লাভজনক লাভে বিক্রি করবেন বলেই। একসময়ে আফগান খাবারের জন্য

জাকারিয়া স্ট্রিটের দোকানগুলি ছিল বিখ্যাত। বর্তমানে জাকারিয়া স্ট্রিটে হোটেলের কর্মচারি রহিম সিদ্দিকি বলেন আফগান মশলার অভাবে আমরা অনেক রকমের খাবার প্রস্তুত থেকে বিরত আছি, কারণ এত মশলার যোগান দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।[৩৭] সুতরাং খুব স্বাবভাবিকভাবে অনুমান করা যায় আফগান মশলার একটা বড়ো চাহিদা আছে কলকাতাতে। আফগান মশলা ব্যবসায়ী রসিদ সাহেবে বলেন আমরা কান্দাহার থেকে অনেক রকমের মশলা ভারতে নিয়ে আসি, তারপর সেখান থেকে ছোট ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন রাজ্যে নিয়ে যান। কলকাতা এবং দিল্লিতে এই মশলার চাহিদা অনেক বেশি। বিশেষত বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আফগানি মশলা কেনার আগ্রহ বেশি। কলকাতার যে সমস্ত কাবুলিওয়ালা আছেন তাঁদের একটা অংশ এই মশলা কলকাতার বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করে থাকেন। কাজেই আফগান মানেই যে শুধুমাত্র শুকনো ফলের ব্যবসাতে নিযুক্ত তা নয়, কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের কাছে শুকনো ফল বিক্রির পাশাপাশি মশলার ব্যবসা ছিল অর্থ উপার্জনের অন্যতম একটি মাধ্যম। কলকাতার বিপণনে এই মশলার ব্যবসা কাবুলিওয়ালাদের অর্থনীতিকে অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে সে কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

১৯ শতকের প্রথামর্ধে যে সমস্ত আফগান ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার বিষয় লক্ষ করা গিয়েছিল প্রথম থেকেই। তবে সময়ের সঙ্গে তাঁদের মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে। কারণ কলকাতার বাজারে যে ধরনের পণ্য দ্রব্যের চাহিদা আছে, কাবুলিওয়ালারা সে সবের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালারা যেহেতু ভিন্নমুখী পেশার সঙ্গে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেননি, তাই তাঁদের আর্থিক জীবনে অনাটন ছিল। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আফগানরা নিত্য নতুন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে তাঁদের আর্থিক জীবনে এই উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে সচ্ছলতা আসতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আফগানিস্তানে গিয়ে তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেছেন ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের সূত্রপাত অতি প্রাচীনকাল থেকেই আছে। যা মহাভারত

থেকে শুরু করে বর্তমানে কবি গুরুর লেখা কাবুলিওয়ালা গল্পের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে। কাজেই দুটি দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করে তুলতে হবে নতুন করে।[৩৮]

৪.৫. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ

কোনও জাতির সামাজিক ইতিহাস লুকিয়ে থাকে সেই জাতির প্রাত্যহিক জীবন চর্চায়, বসবাস এবং কথপোকথনে। এই কলকাতা মহানগরীর প্রতিবেশীদের দিকে নজর দিলেও তাঁদের পরিচয় সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা উঠে আসে। তাই কলকাতার কাবুলিওয়াদের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের দিকে আলোকপাত করলে এমন অনেক বহুবর্ণ চিত্র উঠে আসে। কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত আফগান কাবুলিওয়ালাদের সমাজজীবন সম্বন্ধে কলকাতার সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তবে সুদূর আফগানিস্তান থেকে আসা আফগান জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানারকমের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। যাঁর মধ্যে সমাজ জীবনের চিত্রটি বেশ বড়ো আকারে ধরা পড়ে। তবে আফগানদের বর্ণময় জীবনের সঙ্গে যখন কলকাতার বৈচিত্র্যময় জনজীবনের মিলন হয়েছে তখন আফগানদের মধ্যে মিশ্রসমাজ জীবনের চিত্র ফুটে ওঠে। অভিবাসনের স্বাভাবিক নিয়মের বেড়াজালের মধ্যে পড়ে বিদেশি জনগোষ্ঠী হিসাবে আফগানরা যখন কলকাতায় নিজেদেরকে অভিযোজিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তখন তাঁদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবন ধারার মধ্যে প্রকাশিত হয় প্রাত্যহিক জীবনের যাপনের নানা অধ্যায় যা একদিকে যেমন বর্ণময় অন্যদিকে তেমনই বৈচিত্র্যময়।

ঔপনিবেশিক সময়পর্বে আফগানরা যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন তাঁদের সামাজিক জীবন বা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার তেমন কোনও চিত্র পাওয়া যায় না। কারণ প্রথমদিকে তাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন নিজেদের আর্থিক সংকটের সম্মুখ সমরে পড়ে। কাজেই স্থায়ীভাবে বসবাসের কোনও ভাবনা চিন্তা ছিল না। ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের রহমত এবং সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ’ গ্রন্থের অন্যতম চরিত্র জাম্বাজ সহ অন্যান্য কাবুলিওয়ালারা ছিল যাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৩৯] কিন্তু সময়ের সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যেই একটা অংশ কলকাতাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেন। যাঁরা মূলত উনিশ শতকের শুরুর দিকে কলকাতাতে আসতে শুরু করেন।

এঁদের মধ্যে কাবুলিওয়ালাদের সংগঠনের নেতা আমির খান এবং তাঁর পরিবার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমনকি আমির খানের মতো এমন অনেক কাবুলিওয়ালা কলকাতাতে বসবাস করছেন যাঁদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম কলকাতাতেই রয়ে গেছেন। তবে উনিশ শতকের চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকের পর থেকে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবনে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনশীলতার মধ্যে কাবুলিওয়ালাদের স্থায়ীভাবে বসবাস এবং পারিবারিক জীবনের শুরুর বিষয়টি লক্ষ করা যায়। কাজেই কলকাতার সমাজ জীবনের সঙ্গে কাবুলিওয়ালারা অজান্তেই জড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। ফলে তাঁদের জীবনে শুরু হয় আরেকটি নতুন প্রজন্মের পথা চলা। যাঁদের পারিবারিক জীবনে বিবাহ, জন্ম-মৃত্যু, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি কলকাতার জনজীবনের সঙ্গে মিলে যায়।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালাদের পারিবারিক জীবনের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁদের একটা বড়ো অংশ কলকাতা শহরে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করতেন, যাঁরা মূলত নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই থাকতেন। কলকাতার সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে এঁদের খুব একটা যোগাযোগ থাকত না। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই এঁরা সীমাবদ্ধ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। কলকাতার হাতে গোনা কয়েকটি অঞ্চলে 'খানকোঠি' গুলি ছিল। আফগানিস্তান থেকে আসার পরে এই সব 'খানকোঠি' গুলিতে তাঁরা একসঙ্গে বসবাস করতেন।[৪০] যাঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কলকাতায় বসতি গড়েছেন। তবে ঔপনিবেশিক পরবর্তী সময়ে বিশেষত বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে স্থায়ীভাবে যে সমস্ত কাবুলিরা কলকাতাতে পাকাপাকি বাসস্থান গড়েছিলেন। তাঁদের পরিবারগুলিতে আফগান ঘরানার বৈশিষ্ট্য ক্রমশ ক্ষীণ হতে শুরু করেছিল এবং কলকাতার সামাজিক জীবনের প্রভাব তাঁদের মধ্যে এতটাই পড়েছিল যে, আফগান পরিবারগুলি ক্রমশ ছোটো হয়ে আসতে শুরু করেছিল। কাবুলিওয়ালাদের পারিবারিক জীবনে এই পরিবর্তনশীলতার মূল কারণ ছিল কাবুলিরা যেহেতু রাষ্ট্রীয় নিয়মের বেড়াজালে পড়ে আফগান মহিলাদের ভারতে নিয়ে আসতে পারতেন না, কাজেই তাঁরা যখন একে একে কলকাতাতে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন তখন কলকাতার আফগান সমাজে সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটতে শুরু করল। এই মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব থেকে কাবুলিওয়ালারা কিছুতেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না।

৪.৫.১. কাবুলিওয়ালাদের সমাজে মহিলাদের অবস্থান

আফগানিস্তানের ইতিহাসে নারীদের অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীদের অবস্থা এবং তাঁদের অধিকার বরাবরই একটা বিতর্কিত বিষয়। তবে আফগান নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য তেমন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, তা নয়। আফগান শাসকদের মধ্যে অনেকেই নারী স্বাধীনতা এবং আফগান মহিলাদের উন্নয়নের জন্য কয়েকটি দশক কাজ করে গেছেন। তবে এই কাজে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন তাঁরা, কারণ আফগান সমাজে ধর্মীয় নেতারা নারীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বাঁধার সৃষ্টি করেছেন। ফলে কোনও সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করলে বাঁধার সৃষ্টি করেছেন। ১৯৬০ এর দশকে আফগান নারীরা দেশের রাজনীতি তথা সমাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৪১] তবে ১৯৯২ সালের পর থেকে আফগানিস্তানে নারী স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ হতে শুরু হয় এবং নারীরা আবার চলে যেতে থাকে গৃহের অন্তরমহলে। তবে উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশে আফগান নারীরা যখন অভিবাসীত হয়েছেন তখন তাঁরা আশ্রিত দেশগুলিতে নিজেদের মতো করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন, তবে সেখানেও তাঁরা নানারকমের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কলকাতাতে আফগান কাবুলিওয়ালাদের পরিবারের মহিলাদের কথা উল্লেখযোগ্য। যাঁরা কলকাতার মতো উদার সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শে এসেও নিজেদেরকে আবৃত রেখেছেন আফগানদের রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার মধ্যে।

কলকাতার আফগান কাবুলিওয়াদের সমাজে মহিলাদের অবস্থান নিয়ে নানা রকমের অভিমত আছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে আফগানরা যখন কলকাতায় আসতে শুরু করেন তখন তাঁদের সঙ্গে পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতেন না বিভিন্ন রকমের বাধ্যবাধকতার কারণে। কাজেই কলকাতায় বৈবাহিক জীবনের সূত্রপাতের মধ্যে দিয়ে তাঁদের পরিবারকেন্দ্রিক জীবন-যাপন শুরু হয়। এর ফলে আফগান পরিবারগুলিতে মহিলাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও সেই সংখ্যাটি যথেষ্ট কম ছিল বলে মনে হয়। তবে আফগান পরিবারের মেয়েদের সচরাচর খুব একটা চোখে পড়ে না, কারণ গৃহের অন্তরমহলে থাকতে এঁরা বেশি পছন্দ করেন। অনেকে মনে করেন এর পিছনে মূল কারণ হল, আফগান রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার, এছাড়া ধর্মীয় কিছু

নিয়মনীতির বাঁধানিষেধ তো আছেই।[৪২] ইসলাম ধর্মের নীতি ও আদর্শ আফগান পরিবারের মেয়েরা মেনে চলার চেষ্টা করেন। তাই সাধারাণত পর্দার আড়ালে তাঁদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটে যায়। তবে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে এমন অনেক পরিবার আছেন, যাঁরা পরিবারের নানা রকমের কাজে বাইরে আসেন।

আফগান পারিবারে পুরুষরা সাধারণত গৃহের কর্তা। টাকা রোজগার থেকে সংসারের ব্যায়ভারের দায়িত্ব তাঁদের উপরেই বর্তায়। মহিলারা গৃহকত্রীর ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়, তবে আফগান মহিলারাও সাংসারিক জীবনের নানান রকমের দায়িত্ব তাঁরা পালন করে থাকেন। আফগান পরিবারগুলির মধ্যে যাঁদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা স্বচ্ছল নয়, সেই সমস্ত পরিবারের মেয়েরা গৃহের অন্তরমহলে নানা রকমের হাতের কাজ করে বাড়ির কর্তাকে সহায়তা করেন। তবে সময়ের সঙ্গে আফগান মহিলাদের অবস্থার কিছুটা বদল ঘটতে দেখা যায়। কারণ নতুন প্রজন্মের আফগানরা নিজেদেরকে কলকাতার আর্থ-সামাজিক জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে পূর্বের মতো সাংসারিক জীবনের বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তাঁরাও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছেন। বর্তমানে কলকাতায় এমন অনেক আফগান পরিবার আছে, যাঁদের দেখলে চেনার উপায় নেই যে তাঁরা আফগানিস্তানের নাগরিক।[৪৩]

ভারতবর্ষে আফগান পাঠানদের সংগঠনের নেত্রী ইয়াসমিন নিগার একজন উল্লেখযোগ্য নেত্রী। তিনি খান আব্দুল গফফর খানের একনিষ্ঠ ভক্ত লালাজান খানের কন্যা।[৪৪] এই লালাজান ছিলেন বাদশা খানের অত্যন্ত কাছের, বাদশা খান লালাজান খানের উপরে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সারা ভারতে যত পাঠান আছে তাঁদেরকে একত্রিত করে সংঘবদ্ধ করার। ইয়াসমিন নিগার খানের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর পিতা লালা জানের মৃত্যুর পরে ভারতে পাশতুন জনগোষ্ঠীর সংগঠনের নেতা নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। তখন সারা ভারতের আফগান পাঠানদের মধ্যে অনেকেই তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে চাননি শুধুমাত্র মহিলা হওয়ার কারণে। তবে তিনি বিরোধী মতকে উপেক্ষা করে নেতৃত্বের পদ দখল করেছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ আফগানদের মতামত নিয়ে।[৪৫] কাজেই এই ঘটনার থেকে অনুমান করা যায় কলকাতায় আফগান পরিবারে নারীদের অবস্থান কেমন ছিল।

৪.৫.২. কাবুলিওয়ালাদের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সামাজিক জীবনের অঙ্গ হিসাবে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অভিবাসনের মধ্য দিয়ে আসা বিদেশি জনগোষ্ঠীর বিবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হল শিক্ষার সুযোগ এবং স্বাস্থ্যের অধিকার। আফগান কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা ছিল অত্যন্ত গুরুতর। উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে যখন কাবুলিওয়ালারা কলকাতায় আসতে শুরু করেন তখন তাঁদের শিক্ষা বিষয়ক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। ঔপনিবেশিক নথিপত্র থেকে যতটুকু জানা যায়, যে সব কাবুলিরা কলকাতাতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিলেন নিরক্ষর। তাঁরা লিখতে এবং পড়তে জানতেন না।[৪৬] আসলে আফগানিস্তানের সাক্ষরতার হার নিম্নগামী হওয়ার কারণে সেই সময়ে যাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ অংশ ছিল নিরক্ষর। লেখাপড়া না জানার কারণে বারবার নানা রকমের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সে কথা কলকাতা পুলিশের নথিতে ফুটে ওঠে। কলকাতার আফগান সংগঠনের নেতা জনাব আমির খান সাহেব বলেন ‘খানদের (আফগান কাবুলিওয়ালা) মধ্যে প্রায় কেউ লেখাপড়া জানেন না। কাজেই বাইরের লোকজনের সামনে তাঁরা খুব একটা কথা বলতে চান না, নিজেদের দেশের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে তাঁরা পছন্দ করেন।[৪৭]

তবে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র সামান্য বদল ঘটতে দেখা যায়। যাঁরা মোটামুটি কলকাতার দ্বিতীয় প্রজন্মের আফগান জনগোষ্ঠীদের পর্যায়ভুক্ত। এঁদের প্রথম প্রজন্ম আফগানিস্তান থেকে অভিবাসীত হলেও, অনেকেই কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন এবং পরিবার পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সমস্ত আফগান পরিবারের সন্তানরা যাঁরা আমির খানের (বর্তমানে ৫৩ বছর বয়স) সমবয়সী। তাঁরা কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিতে যে সমস্ত মসজিদ এবং মক্তব আছে সেখানেই পড়াশুনা করতেন। প্রসঙ্গক্রমে আমির খানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আমির খান ছেলেবেলাতে কাশিপুর অঞ্চলে ঝিলরোড সংলগ্ন একটি মসজিদের ওস্তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তিনি স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন তাঁর বাল্যকালের এই শিক্ষাগুরু হাফিজ মহম্মদ সৈয়দ সাহেব তাঁকে এবং আরও

কয়েকজন আফগান পরিবারের শিশুদের শিক্ষা দিতেন। এখান থেকেই তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং উর্দু ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের তালিম নিতেন।[৪৮] বাল্যশিক্ষা শেষ করার পাশাপাশি সরকারি প্রাথামিক বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনা করতে শুরু করতেন। তবে বেশিরভাগ অংশের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম ছিল মসজিদ ও মাদ্রাসা। কাজেই পরিবারের থেকে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শিক্ষা পাঠের রেওয়াজ ছিল কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে।

তবে আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতিসাধন হতে দেখা যায় তৃতীয় প্রজন্মের কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে। এঁদের বেশিরভাগ অংশ মূলত নবীন প্রজন্মের আফগান। যাঁদের অধিকাংশ কলকাতাসহ তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে জন্মগ্রহণ করেছে। যাঁরা আফগানিস্তানে কখনও যাননি। এঁরা নিজেদেরকে আফগান হিসাবে মনেও করেন না। কলকাতায় শৈশব থেকে কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে উপনীত হয়েছেন। এইসব কাবুলিওয়ালারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নতুন নতুন পেশার দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছেন। সময়ের সঙ্গে কলকাতার পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাঁরা। কলকাতায় এমন অনেক কাবুলিওয়ালাদের পরিবার আছেন যাঁরা ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাতে কর্মরত। অনেকে লেখাপড়া শিখে মাইক্রোফিনান্সের মতো কাজে নিযুক্ত হতে শুরু করেছেন। এছাড়াও দেখা গেছে আফগানিস্তান থেকে অনেকেই কলকাতায় এসেছেন শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের কারণে। তাই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আফগান অভিবাসী ছাত্রদের দেখতে পাওয়া বিরল দৃশ্য নয়।[৪৯]

কলকাতার বৈদেশিক অভিবাসীত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আর্মেনিয়ান, চিনা, জিউস ইত্যাদি পরিবারগুলির বাচ্চাদের পড়াশুনোর জন্যে যেমন নির্দিষ্ট স্কুল আছে, পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা আছে, আফগান কাবুলিওয়ালাদের সন্তানদের জন্য তেমন কোনও সুযোগ সুবিধার কথা জানা যায় না। তাঁদের পড়াশোনোর জন্য নেই কোনও স্কুল বা কলেজ। ফলে কিছু পরিবারের সন্তানরা আধুনিক লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে ঠিকই, তবে স্কুল ছুটদের সংখ্যা বেশি। প্রাথামিকের গণ্ডি অতিক্রম করতে না করতেই তাঁদের খুঁজতে হয়েছে নিদিষ্ট কাজ। কারণ কলকাতার বুকে অধিকাংশ আফগান পরিবারগুলির

অর্থনৈতিক জীবনে খুবই করুণ দশা। কাজেই কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাবুলিওয়ালাদের উন্নয়নের কাজে এগিয়ে এসেছেন, আবার কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ দেখা গেছে। তবে এইসব আফগান পরিবারগুলি নাগরিকত্বের একাধিক সমস্যার কারণে সরকারি স্কুলে পড়াশোনোর সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শিক্ষা বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গে পূর্বে বামফ্রন্ট সরকারের নীতি এবং বর্তমানে তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন নীতি অনেক আফগান পরিবারকে স্কুলমুখী করে তুলেছে, বিশেষত সর্বশিক্ষা (২০০১) অভিযানের মতো কার্যক্রম দরিদ্র আফগান পরিবারগুলির শিশুদের শিক্ষার পথকে উন্মুক্ত করেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আফগান অভিবাসী জনগোষ্ঠীর অভিবাসনের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। এই সমস্ত কারণগুলির মধ্যে অন্যতম একটি প্রধান কারণ ছিল আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চরম দুর্দশা। কলকাতায় আফগান পরিবারগুলিতে এমন অনেক সদস্য আছেন যাঁরা শুধুমাত্র চিকিৎসার কারণে কলকাতাতে এসেছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কলকাতায় যে সমস্ত কাবুলিওয়ালা আছেন তাঁদের পরিবারের কেউ কঠিন রোগে অসুস্থ হলে চিকিৎসার কারণে কলকাতার আফগান পরিবারগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন। আবার এমন অনেক আফগান আছেন যাঁরা চিকিৎসার কারণে নিয়মিত কলকাতায় এসে কাবুলিওয়ালাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সারা ভারত পাশতুন জনগোষ্ঠীর নেত্রী ইয়াসমিন নিগার খান বলেন ‘আফগানিস্তান থেকে অনেকেই কলকাতাতে আসেন চিকিৎসার জন্য। এঁদের মধ্যে অনেকেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেই আসেন।’ ইয়াসমিন তাঁদের চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান থেকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন এবং সাহায্য করেন।[৫০]

এছাড়া কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলি তাঁরা ব্যবহার করেন। শারীরিক সমস্যায় সরকারি হাসপাতালে তাঁরা অনেকেই নিয়মিত চিকিৎসা করান। তবে এক্ষেত্রে অনেক সময় একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের। যাঁরা এ দেশে বসবাসের সঠিক প্রমাণপত্র দেখাতে পারেন, চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হতে হলেও, সমস্যা তাঁদের যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কলকাতাতে বসবাস করেও বাসস্থানের জন্য সঠিক প্রমাণপত্র যোগাড় করতে পারেননি। তবে ভারত সরকার অভিবাসীত আফগান পরিবারগুলিকে

অলিখিতভাবে আশ্রয় দেওয়ার ফলে নানা রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। যাঁর মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ফলে তাঁরা যখন শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হন, তখন কলকাতার হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে থাকেন। এছাড়া কলকাতার আফগান পরিবারগুলিতে মহিলাদের জন্য কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে মাতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আছে সেগুলি তাঁরা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের টিকা প্রদান থকে শুরু করে আফগান পরিবারের শিশুদের পোলিও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা আছে।[৫১]

সাম্প্রতিককালে ওয়াজির নামের একজন আফগান তাঁর বছর ছাব্বিশের ছেলে আজিমকে কলকাতায় নিয়ে চলে এসেছেন চিকিৎসার কারণে। কারণ তাঁর সন্তানের শরীরে বাসা বেধেছে মারণ রোগের। কাবুলের বাসিন্দা ওয়াজির তাঁর ক্যান্সার আক্রান্ত ছেলেকে নিয়ে করাচি হয়ে ভারতে এসেছেন। কারণ কেমোথেরাপির জন্য সেখানে উন্নত পরিকাঠামো নেই। কাজেই ভারতে এসে প্রথমে দিল্লি তারপর ভেলোরে গেছেন চিকিৎসার জন্য। কিন্তু সেখানে কোনও 'ডেট' না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। এদিকে কাবুলের চিকিৎসকরা জানিয়ে দিয়েছেন খুব দ্রুত চিকিৎসা শুরু না করা গেলে বিপদ আরও বাড়বে। এদিকে ভিন দেশে থাকা এবং খাওয়ার খরচ অনেক। তাই ওয়াজির কী করবে যখন ভেবে পাচ্ছিলেন না। সেই সময়ে কাবুলের একজন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কলকাতার কাবুলিওয়ালারা ওয়াজির সাহেবকে কলকাতায় চলে আসতে অনুরোধ করেন এবং কলকাতার কাবুলিদের সহযোগিতায় কলকাতাতেই শুরু হয় আজিমের চিকিৎসা। কলকাতার ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডঃ গৌতম মুখপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় অবশেষে রুবি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয়। এই সময় ওয়াজিরের পরিবারকে মানসিক এবং আর্থিক দু-ভাবেই তাঁদের সাহায্য করেছিলেন কাবুলিওয়ালারা।[৫২]

তবে কাবুলিওয়ালারা স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক সময় সরকারি সুযোগ সুবিধা না পেয়ে সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য অনেকেই আবার ঝাড়ফুঁক, তুকতাক এবং বিভিন্ন প্রকারের ভেষজ ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উপরে বিশ্বাস রাখেন। এই ধরনের চিকিৎসার দিকে আফগান কাবুলিওয়ালাদের যাওয়ার মূল কারণ ছিল অল্প খরচ এবং অন্ধবিশ্বাস। তবে

এই দু'য়ের মাঝে পড়ে আফগান কাবুলিওয়ালারা অনেক সময় নিজেদের বিপদ ডেকে আনেন। কারণ এই ধরনের চিকিৎসায় রোগ থেকে সাময়িক স্বস্তি পেলেও, যেহেতু এই পদ্ধতির মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি অনেক কম তাই অনেক সময়ে তাঁরা বিপদে পড়েন।

৪.৫.৩. কাবুলিওয়ালাদের অঞ্চলগত বিভাজন

আফগানিস্তানের অভিন্ন প্রদেশ আসা মিশ্র উপজাতির আফগান পাঠানদের মধ্যে একাধিক অঞ্চলগত বিভাজনে বিভক্ত থাকলেও, কলকাতার কাবুলিওয়ালদের মধ্যে এই তারতম্য ছিল না বললেই চলে। কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে এঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। প্রত্যেকেই নিজের নিজের চাহিদা মতো ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান খুঁজে নিয়েছেন। তবে বসবাসের ক্ষেত্রে উপজাতিগত সমস্যা না থাকলেও অঞ্চলগত তারতম্য আছে। কলকাতা শহরের কাবুলিওয়ালারা নানা রকমের বাণিজ্যিক সুবিধা থেকে জীবিকা নির্বাহের পথ প্রশস্ত করার কারণে নিউ মার্কেট, এসপ্ল্যানেড, মেটিয়াব্রুজ, কলুটোলা, ইকবালপুর, পার্ক সার্কাস, জাকারিয়া স্ট্রিট, চাঁদনি চক, ফেয়ার্স লেন, বড়ো বাজারের মতো জায়গাগুলিতে পাকাপাকি ভাবে জমিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যাচ্ছেন। তবে মফসস্‌লের থেকে শুরু করে জেলার শহরগুলিতে যেমন কাকিনাড়া, টিটাগড়, ডায়মণ্ড হারবার, কৃষ্ণনগর, সিউরি, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িসহ একাধিক অঞ্চলগুলিতে বেশ কিছু কাবুলিওয়ালা বসবাস করেন।[৫৩] যাঁরা মূলত মহাজনি কারবার থেকে নানা রকমের ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকেন। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ ভাড়া বাড়িতে থাকেন, এঁদের স্থায়ী বাসস্থান নেই বললেই চলে। মফসস্‌লের কাবুলিওয়ালারা নানা রকমের সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। বিভিন্ন ধরনের মরসুমি ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে অস্থায়ী দোকান স্থাপন করে নিজেদের জীবকা নির্বাহ করেন। এর সঙ্গে আছে আরও একাধিক রকমের সমস্যা। গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করার সুবাদে পারিপার্শ্বিক এবং এলাকাভিত্তিক সমস্যার মধ্যদিয়ে এঁদের জীবন কাটাতে হয়। এক্ষেত্রে যেমন চাঁদা আদায়ের জুলুম, সুদের ব্যবসার টাকা অনাদায় সব কিছুতেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেটা শহরাঞ্চলের কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা অনেকটা কম। কাজেই কাবুলিওয়ালাদের অস্তিত্ব রক্ষায় অঞ্চলগত বিভাজন তাঁদের অর্থনৈতিক জীবন থেকে সমাজ জীবনের উপরে গভীর প্রভাব ফেলে।[৫৪]

৪.৫.৪. কাবুলিওয়ালাদের জন্ম বৃত্তান্ত, নাগরিক সমস্যা ও মৃত্যু

কাবুলিওয়ালাদের জন্ম বৃত্তান্ত, নাগরিক সমস্যা এবং মৃত্যু এই সবগুলি কলকাতার নগর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অবিচ্ছিন্নভাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত আফগান জনগোষ্ঠী ভারতে এসেছিলেন তাঁদের কাছে নাগরিক জীবনের নির্দিষ্ট কোনও প্রমাণপত্রের প্রয়োজন ছিল না। এমনকি আফগানিস্তান থেকে ভারতে আগমনের প্রয়োজনে নিজেদের ভিসা বা পাসপোর্ট কিছুই ছিল না। কারণ ঔপনিবেশিক আমলে অধিকাংশ আফগান পায়ে হেঁটে বা পরবর্তীকালে ট্রেনে করেই পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে এসেছেন।[৫৫] তাছাড়া তখন ভারতে আসার জন্য প্রমাণ পত্রের তেমন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবে পরবর্তীসময়ে এই সমস্ত প্রমাণ পত্রের অভাবে নানা রকমের সমস্যাতে পড়তে হয়েছে কাবুলিওয়ালাদের। কারণ সময়ের সঙ্গে বিদেশিদের ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নাগরিকত্বের প্রমাণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে অভিহিত হয়। অথচ এমন অনেক কবুলিওয়ালা ঔপনিবেশিক আমল থেকে কলকাতায় ছিলেন যাঁদের নাগরিকত্বের মতো ন্যূন্যতম কাগজপত্র ছিল না, এমনকি অনেকের ভারতে থাকার নিদিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও, ভারত সরকারের নাগরিকত্বের নিয়ম অনুযায়ী নতুন করে নাম নথিভুক্ত করাননি।[৫৬] কাজেই অনেকেই কলকাতাতে বছরের পর বছর অতিবাহিত করার পরেও তাঁদের জন্ম সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড কিছুই তৈরি করতে পারেননি, ফলে তাঁরা প্রমাণ করতে পারে না যে তাঁরা কোনও দেশের নাগরিক। তাই সবসময় একটা আতঙ্কের মধ্যেই তাঁদের দিন কাটে।

কাবুলিওয়ালাদের পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বললে জানা যায় সমস্যার গোড়ার কথা, আসলে সেই সময়ে বেশিরভাগ আফগানদের পরিবারগুলিতে সন্তান-সন্ততিরা বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করতেন।[৫৭] ফলে জন্ম সালের কোনও সরকারি প্রমাণপত্র তাঁরা জোগাড় করতে পারতেন না। সুতরাং এই সমস্ত সমস্যার জাঁতাকলে পড়ে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা নাগরিকত্ব হীনতায় ভুগে চলেছেন দিনের পর দিন। ব্যক্তিজীবন থেকে সমাজ জীবনের অভিঘাতে জড়িয়ে পড়লে সামাজিক হেনস্থার সম্মুখীন হয়ে আজও নিজেদেরকে 'আফগান' হিসাবেই কলকাতার লোকসমাজে নিজেদের পরিচয় দেন। দীর্ঘদিন ভারতে থাকার দরুণ, এমনকি কয়েক প্রজন্ম ভারতে থাকার পরেও

নাগরিকত্বহীনতা এঁদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। তবে সাম্প্রতিককালে যাঁরা আফগানিস্তান থেকে এদেশে এসেছেন তাঁদের এমন ধরনের সমস্যা নেই। নিদিষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে তাঁরা কলকাতাতে আসেন জীবিকা নির্বাহের তাগিদে, আবার ভারতে থাকার আইনত সময়সীমা ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই দেশে ফিরে যান।

কলকাতার কাবুলিওয়ালারা শহর কলকাতার নাগরিক জীবনে যতই নস্টালজিক ভাবমূর্তি বহন করে চলুক না কেন, জন্মস্থানের সঠিক পরিচয়পত্রের অভাবে অনেককিছু থেকেই তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। কলকাতার কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের প্রেসিডেন্ট মি. আমির খান সাহেব বলেন, ভারতবর্ষের স্থায়ী নাগরীকত্বের প্রমাণপত্র না থাকার জন্য এই সমস্ত কাবুলিওয়ালারা অনেকেই আজকাল এখানেই প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। তবে এক্ষেত্রেও সেই একই সমস্যা। তিনি আরও বলেন কলকাতাতে দীর্ঘদিন থাকার পরেও অনেকের কোনও স্থায়ী বাসস্থান নেই। কারণ জমি কেনা-বেঁচা এবং বাড়িঘর স্থাপনের জন্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের দরকার পড়ে সে সবের অভাব কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে রয়ে গেছে। ফলে আফগানরা কলকাতায় দীর্ঘদিন বসবাস করেও শুধুমাত্র প্রমাণের অভাবে তাঁরা স্থায়ী বাসস্থান গড়ার দিকে এগোতে পারছেন না।[৫৮]

এই সমস্ত আফগান জনগোষ্ঠী যাঁরা কয়েক প্রজন্ম কলকাতাতে থাকতে থাকতেই নিজেদেরকে কলকাতার অংশ হিসাবে মনে করেন। ফলে কলকাতার প্রতি তাঁদের টান আছে৷ কারণ তাঁরা কখনও আফগানিস্তানে যাননি, এমনকি চোখেও দেখেনি। আমির খান বলেন, শিশু বয়সে চাচার সঙ্গে কলকাতাতে এসেছিলেন। তিনি আর নিজের দেশে ফিরে যাননি। বর্তমানে এখানেই পড়াশোনো, সংসার, জীবিকা-নির্বাহ সবকিছুই এই কলকাতাতে। তাই কলকাতাকে নিজের দ্বিতীয় মাতৃভূমি বলে মনে করেন।[৫৯] আমির খানের মতো এমন অগণিত কাবুলিওয়ালা। তাঁরা জানেন স্বদেশে আর হয়তো ফেরা হবে না, এখানেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করতে হবে। তাই কলকাতায় তাঁরা সাধারণ বাঙালিদের সঙ্গে মিলেমিশেই বসবাস করে চলেছেন।

আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে যাঁরা কলকাতাতে চিরস্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছেন, তাঁদের অনেকের মৃত্যু হয়েছে কলকাতাতেই। কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে অধিকাংশ ইসলাম

ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে ইসলামি প্রথা অনুযায়ী তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় কলকাতার কবরস্থানগুলিতে। ২ নং, মহেন্দ্র রায় লেনে ট্যাংরার কাছে গোবরা নামক কবরস্থানে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের একাংশের দাফন করা হয়। সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে দিয়ে সেকথা জানা যায়। সুস্মিতা দেবীর কাবুলিওয়ালা স্বামী জাম্বাজের পিতাও কলকাতাতে এসেছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে, অর্থাৎ সুস্মিতার শ্বশুরের মৃত্যুর পরে কলকাতার এই গোবরা কবরস্থানে তাকেও শায়িত করা হয়েছিল।[৬০] কলকাতার কবরস্থানগুলিতে কাবুলিওয়ালাদের শেষকৃত্যের জন্য কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। আমির খানের কথা অনুযায়ী তাঁর চাচার মৃত্যুর পরে তাঁকে কলকাতার মাটিতেই কবরস্থ করা হয়েছিল। কাজেই কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় তাঁরা কলকাতাকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন।

৪.৫.৫. কাবুলিওয়ালাদের বিবাহ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত

এম.কে.এ সিদ্দিকি তাঁর 'মুসলিম অফ ক্যালকাটা' গ্রন্থে কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালাদের বিবাহ বৃত্তান্ত সম্পর্কিত বিষয়ে ছোট্ট পরিসরে খানিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন আফগান কাবুলিওয়ালারা কলকাতায় আগমনের সময়ে তাঁদের পরিবারের কোনও আফগান মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতেন না, কারণ সেই বিষয়ে নাকি খোদ আফগানিস্তান সরকারের নিষেধাজ্ঞা ছিল।[৬১] সিদ্দিকির এই উক্তির সমর্থনে তেমন কোনও উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, কলকাতার আফগান কাবুলি পরিবারগুলিকে লক্ষ করলে খুব সহজে ধরা পড়ে আফগান মহিলাদের অনুপস্থিতের কথা। কলকাতাতে আফগান পরিবারগুলি যে সমস্ত মহিলাদের দেখা যায়, তাঁদের বেশিরভাগ অংশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম পরিবারের মেয়েরা। কারণ কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে একাংশ প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে ভারতীয়দের সঙ্গে। ১৯৩৯ সালের কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগের কয়েকটি নথিপত্র থেকেও আফগানদের সঙ্গে ভারতীয়দের প্রণয়সূত্রের কিছু চিত্র উঠে আসে। এছাড়া আরও অনেক উপসঙ্গ থেকেও কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিবাহ বৃত্তান্তের বিভিন্ন দিক উঠে আসে।[৬২]

কলকাতাতে যত আফগান আছে তাঁদের মধ্যে বেশীরভাগ অংশ কলকাতার হিন্দি ও উর্দুভাষী পরিবারগুলির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা গেছে। এর সম্ভাব্য কারণ হল ভাষা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালারা দীর্ঘদিন কলকাতায় বসবাস করতে করতে হিন্দি ভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটে এবং উর্দু ভাষার সঙ্গে তাঁদের পূর্ব পরিচিতি তো ছিলই। খুব স্বাভাবিক কারণে কলকাতার হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে, যা প্রণয়সূত্র পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তবে হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালি পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে তাঁদের যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তা বলা যায় না। কারণ এমন অনেক কাবুলিওয়ালা আছেন যাঁরা বাঙালি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, যদিও তার সংখ্যা খুবই কম। এ প্রসঙ্গে ‘কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ’ বইয়ের লেখিকা সুস্মিতা বন্দোপাধ্যায় নিজেই তাঁর বড় প্রমাণ।[৬৩] তবে কলকাতার বৃহত্তর অন্যান্য বিদেশী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের তেমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

তবে সাম্প্রতিককালে তৃতীয় প্রজন্মের আফগান পরিবারের মেয়েরা আফগান পুরুষতান্ত্রিক ঘরানা ভেঙে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।[৬৪] যার ফলস্বরূপ কলকাতায় এমন অনেক আফগান পরিবার আছেন যাঁরা নিজেদের আফগান হিসাবে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক, কারণ তাঁদের জন্ম থেকে শুরু করে বড় হওয়া পর্যন্ত সবকিছু কলকাতায়। তাই তাঁরা বিবাহের ক্ষেত্রে পুরনো দিনের নিয়ম নীতি ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা শুরু করেছেন। বিবাহের ক্ষেত্রে কলকাতার আফগান পরিবারগুলি দিল্লি, মুম্বাই, আসাম, উত্তর প্রদেশসহ একাধিক প্রদেশে বসবারকারী আফগান পরিবারগুলির সঙ্গে বিবাহ সম্পাদন করছেন। আবার ঠিক এর উল্টোটাও ঘটছে।[৬৫]

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সমাজ জীবনে বৈবাহিকসূত্র যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ বৈবাহিকসূত্রের মাধ্যমে কাবুলিওয়ালারা অনেকেই কলকাতাতে তাঁদের বসতি স্থাপন পাকা করতে পেরেছেন, বিবাহের সূত্র ধরে কাবুলিওয়ালাদের যে নতুন পরিচয় নির্মাণ হয়েছে, এই পরিচয়ের উপরে ভিত্তি করে জমিজামা, বাড়িঘরের উপরে তাঁদের মালিকানা তৈরি হয়েছে এবং একইসঙ্গে সামাজিক সম্মান তৈরি হয়েছে। ১৯৩৯ সালে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের নথি থেকে জানা

যাচ্ছে কাবুলিওয়ালাদের বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক তথ্য। এই প্রসঙ্গে আবদুর রহমান নামক একজন কাবুলিওয়ালার কথা জানা যায়, যিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে কলকাতাতে আসেন। পরে মেটিয়াব্রুজের ধানখেতি নামক অঞ্চলে গফফর খান নামক একজনের বাড়িতে ভাড়া থাকাকালীন স্থানীয় একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহের পরে আবদুর রহমান এই বাড়িতেই সংসার পাতেন এবং একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন, যাঁর নাম খায়ের খান। আবদুর রহমান তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রকে নিয়ে জীবনের বাকি সময়টা মেটিয়াব্রুজেই কাটিয়ে দিয়েছেন। আব্দুর রহমান নিজে পেশায় ছিলেন সুদের ব্যবসায়ী এবং তাঁর পুত্র খায়ের খান খিদিরপুর ডকে মিস্ত্রির কাজে নিযুক্ত।[৬৬]

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বৈবাহিক জীবনের উপরে আলোকপাত করতে গিয়ে তাঁদের বৈবাহিক নিয়ম-রীতি কেমন ছিল সেই বিষয়েও দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। প্রথমেই বলা যেতে পারে কলকাতার মিশ্র-সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এসে কাবুলিওয়ালাদের সামাজিক নিয়ম-রীতিতে অনেকটা বদল এসেছিল। সুদূর আফগানিস্তানে বৈবাহিক রীতি-নীতির ক্ষেত্রে বেশ কিছু নির্ধারিত নিয়ম-রীতি আছে। এর মধ্যে অন্যতম হল বিবাহের পূর্বে পাত্রী পক্ষকে পণ দেওয়ার রীতি। পাত্রপক্ষকে বিবাহকার্য সম্পন্ন করার সময়ে পাত্রীপক্ষকে পণ প্রদান না করলে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয় না। সোজা কথায় নিন্দনীয় হলেও আমাদের দেশে সমাজে এখনও যেমন পণপ্রথার প্রচলন আছে, আফগানিস্তানে এই প্রথার প্রচলন থাকলেও, আমাদের দেশের ঠিক একেবারে বিপরীত। সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লিখেছেন, আফগানিস্তানে নারী স্বাধীনতা ভূ-লুণ্ঠিত হলেও, শুধুমাত্র এই একটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিবাহের সময়ে তাঁদের একটা মর্যাদা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরে পাত্রী এক বছরের জন্য বাব-মায়ের বাড়িতেই থাকেন এবং ওই একবছর সমস্ত ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পাত্র পক্ষকে বহন করতে হয়।[৬৭] আমির খানের বক্তব্য অনুযায়ী ইসলামি বৈবাহিক রীতি অনুযায়ী ভারতবর্ষে বিবাহপূর্বে যেমন কন্যা পক্ষকে 'দেন-মোহর' (আর্থিক উপঢৌকন) প্রদান করতে হয়, আফগানিস্তানে তারই প্রতিরূপ মাত্র।[৬৮] সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "কাবুলে বাবা-মায়েরা নিশ্চিত তাঁদের কন্যা সন্তানকে বিক্রি করে।" এছাড়াও বিয়ের পরে পাত্রী যখন শ্বশুর বাড়িতে আসেন তখন তার গায়ে চিনি ছিটিয়ে, আকাশের দিকে বন্দুকের টোটা ফাটিয়ে বধূবরণ করার

রেওয়াজ আছে আফগানিস্থানে।[৬৯] এমন একাধিক নিয়ম নীতির মধ্যে দিয়ে আফগানিস্তানে বৈবাহিক কার্য সম্পন্ন হয়।

আফগানিস্তানে বিবাহের ক্ষেত্রে এই ধরনের নিয়ম-নীতির ব্যবহার থাকলেও কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে এই ধরনের নিয়ম নেই বললেই চলে। আসলে কোনও দেশের সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবন নির্ভর করে সেই দেশের সামাজিক অবস্থার উপরে। তাই কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের রেওয়াজ নেই বললেই চলে। মি. আমির খান বলেন আমাদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে এই সব নিয়ম বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে কলকাতাতে বেশিরভাগ আফগান পরিবার এসব নিয়মের উর্দ্ধে ভাবতে শিখছেন। আসলে এই বিষয়গুলি খানিকটা ব্যক্তিগত সংস্কৃতির উপরেই অনেকটা নির্ভর করে'। তবে এই সমস্ত নিয়ম-কানুন কিছুটা কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে থাকলেও সময়ের সঙ্গে অনেকটা শিথিল হয়েছে। আমির খান সাহেব মনে করেন আফগানিস্তানের বৈবাহিক ব্যবস্থার চিত্র কলকাতাতে কিছু পরিবার মেনে চলতে চাইলেও, তা খুব একটা প্রকাশ্যে আসে না। কারণ আফগানরা সবসময় তাঁদের নিজেদের সমাজ-জীবনকে খানিকটা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে বদ্ধপরিকর।[৭০]

৪.৫.৬. কাবুলিওয়ালাদের সামাজিক কর্মকাণ্ড ও অপরাধ প্রবণতা

কোনও জনগোষ্ঠীর সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং অপরাধ প্রবণতার মধ্যে রয়ে যায় সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যেও এই অপরাধ প্রবণতার মধ্যে দিয়ে তাঁদের পরিচয়ের একটা কালো দিক ফুটে ওঠে। কলকাতাতে যে সমস্ত আফগান কাবুলিওয়ালার বসবাস আছে, তাঁরা খোদ কলকাতার বুকেই নানান রকমের সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং সমাজসেবামূলক কাজের মধ্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত কাবুলিওয়ালারা কলকাতায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সামাজিক কর্মকাণ্ডের তেমন কোনও প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র পেশাগত জীবনে জীবিকা অর্জনের পথকে সুনিশ্চিত করা। তবে সময়ের সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের কলকাতাতে স্থায়ী বসবাসের সম্ভাবনা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে ততই জড়িয়ে

পড়েছে একাধিক সামাজিক কর্মকাণ্ডে। তবে তাঁদের এই সামাজিক কর্মকাণ্ড একদিকে যেমন আলোকিত অধ্যায় অন্যদিকে অপরাধ প্রবণতার অন্ধকার দিকটিও বেরিয়ে আসে।

কাবুলিওয়ালারা কলকাতার নাগরিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয় বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে। যেমন রক্তদান শিবিরের আয়োজন, বন্যাত্রাণে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য প্রদান, বস্ত্র বিতরণের মতো সামাজিক সেবামূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। 'খোদাই-খিদমৎগার' নামক সংগঠনের নেতা আমির খান সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী, কলকাতার কাবুলিওয়াদের একাংশকে নিয়েই খান আব্দুল গফফর খান এবং গান্ধিজীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ২০১২ সালে খোদাই-খিদমৎগার পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। এই প্রসঙ্গে আমির খান বলেন রক্তদান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা বলতে চাই আমরা যাঁরা পাখতুন (কলকাতার আফগান) তাঁরা সবসময় ভারতের পাশে আছি। ভারত সরকার যেন আমাদের প্রতি একটু সহনশীল হয়।[৭১] এছাড়া অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যে ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গ যখন বন্যা কবলিত অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, তখন কলকাতার কাবুলিওয়ালারা সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। সংগঠনের নেতা আমির খান ও তাঁর সহযোগী কাবুলিওয়ালারা পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাতে বন্যা কবলিত মানুষের সাহায্যার্থের জন্যে অর্থ সাহায্য তুলে দিয়ে নজির সৃষ্টি করেছিলেন। আফগান কাবুলিওয়ালারা এই ধরনের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিজেদের যেমন একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন।[৭২] অন্যদিকে তেমনই কলকাতার বুকে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

কাবুলিওয়ালারা 'অল ইন্ডিয়া জিরগা-ই-হিন্দ' সংগঠনের মাধ্যমে ইয়াসমিন নিগার খানের সহযোগিতায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে কলকাতার কাবুলিওয়াদের একটি অংশকে একত্রিত করেছিলেন। যাঁরা রক্তদান শিবির, গরিব শিশুদের বস্ত্রদানের মতো সেবা কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইয়াসমিন নিগার খান ১৯৯৮ সালে তিনিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রিলিফ ফান্ডে' তৎকালীন মুখমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাতে অর্থ সাহায্য প্রদান করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন ধরনেরর সংগঠনের মধ্য দিয়ে বস্ত্রদানের মতো সামাজিক কাজকর্মে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। ইয়াসমিন নিগার খানের নেতৃত্বে

কলকাতার কাবুলিওয়ালারা এইভাবে সারা বছর নানারকমের কাজকর্মের মধ্যে নিযুক্ত থাকতেন।[৭৩]

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সমাজ জীবনের মধ্যে অন্যতম কালো অধ্যায় ছিল অপরাধ প্রবণতা। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কাবুলিওয়ালাদের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করতে গেলে বারে বারে ফিরে আসে এই প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাবুলিওয়ালা গল্পের মধ্যে রহমত নামের কাবুলিওয়ালার মধ্যেও আমরা অপরাধ প্রবণতার একটি দিক লক্ষ করতে পারি। যিনি সুদের টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে জড়িয়ে পড়েন অপরাধ প্রবণতায়।[৭৪] বর্তমানে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যেও একই ধরণের প্রবণতা আছে। জীবন যাপনের তাগিদে মাঝে মাঝেই এঁরা জড়িয়ে পড়েছেন নানা রকমের সমস্যায়। ১৯০১ সালে হিতবাদী পত্রিকাতে দেখা যায় একজন কাবুলিওয়ালা সুদের টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে জড়িয়ে পড়ছেন সমস্যায়। 'হিতবাদী'তে এই ঘটনার উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে ব্রিটিশ ভারতে কাবুলিওয়ালারা সুদের কারবারির কারণে জড়িয়ে পড়ছেন সমস্যায়।[৭৫] সুতরাং কাবুলিওয়ালা গল্পের রহমতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেভাবে দেখাতে চেয়েছিলেন বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যেও এই দৃশ্য বিরল নয়।

কাবুলিওয়ালাদের অপরাধ প্রবণতার আরও ভয়াবাহ দৃষ্টান্ত দেখা মেলে সুদের ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই। উনবিংশ শতকে সুদের টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে কাবুলিওয়ালারা রীতিমতো জবরদখল এবং ঘাতকের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৭৬] টাকা আদায়ের জন্যে আফগান কাবুলিওয়ালারা নানা রকমের পন্থা অবলম্বন করতেন কখনও দেনাদারের কর্মক্ষেত্রগুলিতে তাঁরা হানা দিতেন। অনেক সময় কাবুলিওয়ালারা দেনাদারদের বাড়িতে পর্যন্ত চলে যেতেন এবং বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন এবং জোরপূর্বক টাকা আদায়ের চেষ্টা করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না টাকা আদায় করতে পারতেন। এছাড়া টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত আক্রমণ তো লেগেই থাকত।[৭৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কাবুলিওয়ালাদের এই ধরনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন মুখ্যসচিব ভারত সরকারের সচিবকে চিঠি লেখেন কাবুলিওয়ালাদের

সংযত হওয়ার জন্য। কারণ অনেক সময় কাবুলিওয়ালারা চড়া সুদে টাকা আদায়ের পথে নেমেছিলেন, যা ছিল আইন বিরুদ্ধ।[৭৮]

১৯৫০ সালে বেশ কিছু আফগান জনগোষ্ঠীকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের মধ্যে সৈয়দ মহম্মদ খান, গোলাম সিদ্দিকি, আজিজ খান নামের আফগানদের কথা জানা যায়। এঁরা প্রত্যেকেই আফগানিস্তানের বাসিন্দা, ভারত সরকারের Under the Foreigners Order অনুযায়ী সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৮ সালে একটি ট্রেনে চড়ে রাধিকাপুর ভায়া হয়ে দিনাজপুর থেকে সৈয়দপুরের (রংপুর জেলা) দিকে এই সমস্ত আফগানরা যাচ্ছিলেন, সেখানেই সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের মধ্যে সৈয়দ মহম্মদ খানের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা, কাশ্মীর আজাদি পত্রিকা এবং সরকারি গোপন নথি পাওয়া যায়। সৈয়দ খান বিহারের পূর্ণিয়া জেলাতে ভারত ইউনিয়ান (Indian Union) এর বিরুদ্ধে কাশ্মীর আজাদির পক্ষে টাকা সংগ্রহ করছিলেন, ফলে তাঁকে B.M.P.O Act অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয় এবং ভাগলপুর জেলে পাঠানো হয় পাকিস্তানের গুপ্তচর সন্দেহে। সৈয়দ মহম্মদ খানের কাছ থেকে পুলিশ উদ্ধার করেন মুজাহিদিন কাশ্মীর জিন্দাবাদ, ইসলাম জিন্দাবাদ, আজাদ কাশ্মীর জিন্দাবাদ, মদত-কি-আন্দাজের মতো পত্র-পত্রিকা।[৭৯]

তবে কাবুলিওয়ালাদের অপরাধ প্রবণতা শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক কালপর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, পরবর্তী সময়েও তাঁদের অপরাধ প্রবণতার প্রতিচ্ছবি বারে বারে ফুটে ওঠে। কলকাতার আফগানরা সুদের ব্যবসার কারণে সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার ঘটনা সাম্প্রতিক সময়েও দেখা যায়। প্রায়শই কাবুলিওয়ালারা সুদের ব্যবসার কারণে একাধিক সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন। এর ফলে থানা, পুলিশ, কোর্ট-কাছারি ইত্যাদি তাঁদের জীবনে লেগেই থাকে। কলকাতার বুকে এমন অনেক কাবুলিওয়ালা আছেন যাঁরা কলকাতায় বিবাহ সম্পন্ন করে আফগানিস্তানে পরিবার নিয়ে চলে গেছেন এবং কখনই আর কলকাতাতে ফিরে আসেননি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই সব নারীদের পরবর্তীকালে আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মেয়েরা কাবুলিওয়ালাকে ভালোবেসে বিবাহ করে জড়িয়ে পড়েছে জীবনযুদ্ধে। অনেক সময় কাবুলিওয়ালারা কোনও অপরাধ না করেও, অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন। শুধুমাত্র সন্দেহের উপরে ভিত্তি করে

তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে সংকট। ফলে কপালে জোটে মার, অপবাদ এবং বিনা কারণে থানা পুলিশের অত্যাচার। ২০১৯ সালে কলকাতা থেকে বেশ কিছু আফগান কাবুলিওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার করা গেছে বেশ কিছু নগদ টাকা এবং পাশতু ভাষাতে লেখা একটি খাতা। কলকাতার পুলিশের গোয়েন্দারা মনে করছেন এঁদের সঙ্গে পাকিস্থানের যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে, তাই তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[৮০]

সারণি: ৪.২. ১৯৫০ সালে পশ্চিম দিনাজপুর থেকে গ্রেপ্তার আফগান নাগরিকদের তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	আফগানিস্তানের ঠিকানা	পশ্চিম দিনাজপুর আগমন
১.	খান তরানাই	কার্টোয়াজ, গজনী, আফগানিস্তান	২৫.০৭.১৯৫০
২.	সুলতান মহম্মদ খান	কার্টোয়াজ, গজনী, আফগানিস্তান	২৫.০৭.১৯৫০
৩.	গুলাম সিদ্দিকি খান	হুকুমাত আনদার, আফগানিস্তান	২৫.০৭.১৯৫০
৪.	আজিজ খান	-------------	২৫.০৭.১৯৫০
৫.	সৈয়দ মহম্মদ খান	--------------	২৫.০৭.১৯৫০

সূত্র: IB File No-236/1939 (16) Afghan National West Dinajpur

এছাড়া কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে সুদের ব্যবসায়ী রহমান খান এবং পির মহম্মদ খানদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় তাঁদের উপরে অনেক সময় বিনা কারণে আক্রমণ নেমে আসে। অনেকেই এমন আছেন যাঁরা কাবুলিওয়ালাদের থেকে টাকা ধার নিয়ে আসল টাকাটুকু ফেরত দিতে চান না, টাকা চাইলে বরং ভয় দেখানো হয়। কলকাতার কাবুলিওয়ালা জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন অনেক ঘটনার অবতারণা আছে, যেখানে প্রমাণিত হয়েছে কাবুলিরা হয়ত কোনও অপরাধ করেননি, তবুও তাঁদের থানা পুলিশের চক্রের মধ্যে পড়তে হয়েছে।[৮১] আসলে বিদেশি জনগোষ্ঠী হওয়ার কারণে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন তাঁদের সবসময় হতে হয়।

ইয়াসমিন নিগার খানের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা,
গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা, ১৫.০৯.২০২১)

সংগঠন গড়ে স্বজাতির মুখে হাসি ফোটালেন কাবুলিওয়ালা

সব্যসাচী সরকার

আমির খানের সংগঠনের কর্মকর্তারা ,
গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা, ২২.০৪.২০১৮)

৪.৬. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের পর্যালোচনা

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের কোনও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের ইতিহাস সেভাবে না পাওয়া গেলেও, রাজনৈতিক দিক থেকে কাবুলিওয়ালারা ছিলেন অত্যন্ত সচেতন সেই বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষের মূল রাজনৈতিক আঙিনা থেকে তাঁরা সর্বদা নিজেদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন সবসময়। ঔপনিবেশক আমলে কলকাতার অন্যান্য অভিবাসীত জনগোষ্ঠীদের মতো আফগান কাবুলিওয়ালারা ব্রিটিশদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পারেননি, কারণ প্রথম থেকেই ব্রিটিশদের সঙ্গে তাঁদের বৈরতা ছিল। একইসঙ্গে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর আফগানরা ক্রমশ ভারতের জাতীয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কাবুলিওয়ালাদের মধ্যেও সেই প্রভাব এসে পড়ে। তাই তাঁরা আগ্রাসী রাজনীতি থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে আনেন। পরবর্তীকালে আফগানরা যখন ভারতবর্ষে অভিবাসীত নাগরিকের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হতে শুরু করেন, তখন থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি ছেড়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ভারতবর্ষের আফগানদের নিয়ে নিজেদের সংঘবদ্ধ করার জন্য সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীতা অনুভব করেন। এই কাজে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। এই সংগঠনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে, নিজেদের সমস্যা সমাধানের অবিরত চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। জীবিকার সমস্যা, নাগরিকত্ব,

ভোটাধিকার ইত্যাদি সব দাবি নিয়ে কাবুলিওয়ালারা খানিকটা সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের এই সংঘবদ্ধ প্রয়াস ভারতবর্ষের বুকে জাতীয় রাজনীতিতে তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে না পারলেও, নিজেদের দাবিদাবা, চাহিদা ও সমস্যার কথা দেশের জাতীয় ভারতের জাতীয় রাজনীতির নেতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

৪.৬.১. কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক চেতনার উৎস

ঔপনিবেশক আমলে ভারতবর্ষে আফগানদের রাজনৈতিক ভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল খান আব্দুল গফফর খানের (সীমান্ত গান্ধি) আদর্শকে সামনে রেখে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে খান আব্দুল গফফর খান সীমান্তের স্বাধীনতার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন এরপরে আইন অমান্য আন্দোলন থেকেই গান্ধিজির একনিষ্ঠ সেবকে পরিণত হন, সেই সময় থকে গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং 'খোদা-ই-খিদমদগার' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সীমান্তের পাঠানদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে শুরু করেন।[৮২] সীমান্তের পাঠানদের মধ্যে তিনি মহাত্মা গান্ধির আদর্শের যে বীজ বপন করেছিলেন, তা অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষে বসবাসরত আফগানদের মধ্যে। খান আব্দুল গফফর খানের তৈরি 'খুদা-ই-খিদমদগারে'র আদর্শ (ঈশ্বরের সেবক) শাখা কলকাতার আফগান জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

কাবুলিওয়াদের কলকাতা আগমনের শুরুর দিকে তাঁদের রাজনৈতিক সচেনতার চিত্র পরিলক্ষিত হলেও, পরবর্তীকালে তা অনেকটা কমে আসে। বিশেষত ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর থকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব তৈরি হয়, যদিও এর পিছনে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিশেষভাবে দায়ী ছিল। কারণ তখন থেকেই অভিবাসীত জনগোষ্ঠী হিসাবে তাঁরা গণ্য হতে শুরু করেন। তবে বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের পর থেকে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে আবার নতুন করে রাজনৈতিক জাগরণ শুরু হয়। এই সময়ে কলকাতাসহ সারা ভারতে অবস্থিত পাখতুন সম্প্রদায়কে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে নিজেদের সমস্যা, দাবিদাবা ইত্যাদি নিয়ে ভারত সরকারের কাছে অনুনয়ের সঙ্গে নিজেদের কথা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়।

৪.৬.২. কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক সংগঠন ও নের্তৃবর্গ

খান আব্দুল গফফর খান ছাড়া ভারতের রাজনীতিতে আফগান পাঠানদের সক্রিয় অংশগ্রহণের তেমন কোনও চিত্র বেশ বিরল। তবে ১৯৬৫ সালের পর থেকে আফগান পাঠানদের একটা অংশ অনুভব করেন সারা ভারতে যত আফগান জনগোষ্ঠী আছেন তাঁদেরকে একত্রিত করতে হবে এবং তাঁদের সামনে সীমান্ত গান্ধির আদর্শের কথা তুলে ধরতে হবে।[৮৩] মূলত এই উদ্যোগ থেকেই সংগঠন স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। এই সময়ে খান আব্দুল গফফর খানের পালিত পুত্র লালজান খানের কথা জানা যায়। যিনি সীমান্ত গান্ধির অন্যতম সহযোগী হিসাবে কাজ করেছিলেন পাখতুনিস্তান নিয়ে আন্দোলনের সময় থেকে। যিনি একাধারে যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন অন্যদিকে ছিলেন সীমান্ত গান্ধির দক্ষ সহযোগী। কাজেই সীমান্ত গান্ধি লালাজান খানকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন ভারতে বসবাসরত পাঠানদের সুসংগঠিত করে নেতৃত্ব প্রদান করতে।[৮৪] সেই থেকেই লালাজান খান ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পাঠানদের একত্রিত করার কাজে মনোনিবেশ করেন এবং সীমান্ত গান্ধির আদর্শ সামনে রেখে 'খোদা-ই-খিদমদগার' প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত কী হবে তাঁর জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শুরু করতে উদ্যত হন।

ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে লালজান খানের নেতৃত্বে ভারতের পাঠানরা ক্রমশ একত্রিত হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে লালাজান খানের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তিনি ১৯৪৯ সালে 'পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ' নামক একটি সংগঠন স্থাপন করেন, সেটি কলকাতার রাজমোহন স্ট্রিট থেকে পরিচালিত হতে থাকে।[৮৫] এই সংগঠন আব্দুল গফফর খানের 'খোদা-ই-খিদমদ্গার' আদর্শকে সামনে রেখেই স্থাপিত হয়েছিল। যাঁরা ভারতের অভিন্ন প্রদেশের আফগান পাঠানদের একত্রিত করে কলকাতা থেকে সংগঠন পরিচালনা করতে থাকেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে ভারতে বসবাসকারী আফগানরা নিজেদের সুবিধা এবং অসুবিধার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। লালজান খানের নেতৃত্বে 'পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ' সংগঠন পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে পাঠানদের কথা শুধু তুলে ধরেননি ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তাঁদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তার প্রসঙ্গ।

লালজান খানের জন্ম আফগানিস্তানের জালালাবাদ জেলার নুরগুল অঞ্চলের লোলাম গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছিল সৈয়দ জান। আব্দুল গফফর খানের সাহচর্যে এসেই তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪৯ সালে 'পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের' প্রতিষ্ঠালগ্নে লালজান খান এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৮৬] এই সময়ে তাঁর সদর দপ্তর ছিল কলকাতাতায়। ভারতে আফগান জনগোষ্ঠীদের নিয়ে তৈরি এই সংগঠন কলকাতায় স্থাপিত হওয়ার ফলে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের কার্যক্রমের সমস্ত কর্মসূচি কলকাতা থেকে সারা ভারতে পরিচালিত হতে থাকে এবং একত্রিত হতে শুরু করে আফগানরা। এরপর শুরু হয় সদস্য সংগ্রহের কর্মসূচি এবং সাংগঠনিক বিস্তারের কাজ।[৮৭] এই কাজে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা লালাজান খানকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করেন। কাজেই লালাজানের নেতৃত্বে কাবুলিওয়ালারা ভারত সরকারের কাছে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে, কাবুলিওয়ালাদের এই সংগঠনের কথা স্বীকার করে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে মর্যাদা দেওয়া হয়। এমনকি কাবুলিওয়ালারা সরকার পক্ষকে ভারতের বিভিন্ন স্থানের পাঠানদের আর্থ-সামাজিক সমস্যার কথা বোঝাতে সক্ষম হন।

'পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দে'র সারা ভারতে দলীয় কার্যলয়গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিমবঙ্গে। এই কার্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচি পশ্চিমবঙ্গ শাখার অন্তর্গত কলকাতা থেকেই পরিচালিত হত। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সংগঠনের শাখা বিস্তার করেছিল ১৯৬৬ সালের ২০ জানুয়ারি, লালজান খানের থেকে প্রাপ্ত একটি চিঠি থকে তা জনা যায়। এই সময়ে 'পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দের' সদর দপ্তর প্রথমে কলকাতা ৯/১১ রাজমোহন স্ট্রিট থেকে পরিচালিত হতে থাকে, ১৯৬৭ সালে এই দপ্তর স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসে, ৮/২ কলুটোলা স্ট্রিটে। তার পর থেকে যতদিন পর্যন্ত লালজান খান এই সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত ভারতের পাঠানদের নিয়ে তৈরি এই সংগঠন এগিয়ে যায়। তাঁর সময়ে পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ সংগঠন পূর্ণ শক্তিতে এগিয়ে যায়। লালাজান খানের নেতৃত্বে ভারতের পাঠানরা দিল্লির কেন্দ্রীয় সরাকারের সঙ্গে সেতুবন্ধ করতে যে সক্ষম হয়েছিলেন তা কাবুলিওয়ালাদের পরবর্তী রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে

ফুটে ওঠে।[৮৮] ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতে যে সমস্ত আফগান পাঠান ভারতে এসেছিলেন জীবন-জীবিকার তাগিদে তাঁদের কাছে লালাজান খান ছিলেন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। অবশেষে ১৯৯৬ সালে ২রা মে লালাজান খান পরলোক গমন করেন। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ইতি ঘটে। তিনি এই স্বল্প সময়ে আফগান পাঠান যাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস করছিলেন তাঁদের শেখাতে পেরেছিলেন কীভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে লড়াই করে যেতে হয়।[৮৯]

১৯৯৬ সালে ২রা মে লালাজান খানের মৃত্যুর পরে 'অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দে'র সাধারণ সম্পাদক কে হবেন তাই নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। তবে মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে এই সংগঠনের নেতা হবেন তাঁর কন্যা ইয়াসমিন নিগার খান।[৯০] তবে লালাজান খান মৃত্যু পরবর্তী সময়ে এই সংগঠনের নেতা নির্বাচন নিয়ে ভারতের পাঠানদের মধ্যে বিবাদ দেখা যায়। এমনকি এই সংগঠনের কার্যালয় কলকাতার পরিবর্তে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন আফগান পাঠানদের একাংশ। ইয়াসমিন নিগার খানের কথা অনুযায়ী তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে ভারতের পাঠানদের মধ্যে একটা অংশ ধর্মীয় গোঁড়ামিকে উপলক্ষ করে তাঁর নেতৃত্বকে মেনে নিতে চাননি, তাঁদের যুক্তি ছিল কোনও মহিলার নেতৃত্বে তাঁরা চলতে পারবেন না। অথচ ইয়াসমিন নিগার খান বাল্যবয়স থেকেই পিতা লালাজান খানের সঙ্গে বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে সংগঠনের কাজকর্মের দেখাশোনা করতেন। ফলে আফগান পাঠানদের বৃহৎ অংশ ইয়াসমিন নিগার খানকে সভাপতি নির্বাচিত করেন।[৯১]

১৯৯৬ সালে ৭ই জুন, কলকাতার রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডে 'মুসলিম ইনস্টিটিউট' হলে সারা ভারতের পাঠানরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন গান্ধিজী (করমচাঁদ গান্ধি) এবং বাদশা খানের (আব্দুল গফফর খান) আদর্শকে সামনে রেখে 'অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ' সংগঠনের সভানেত্রী হিসাবে সময়ে ইয়াসমিন নিগার খান পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ১৯৯৬ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন ইয়াসমন নিগার খান। ইয়াসমিন নিগার খান সংগঠনের দায়িত্ব হাতে নিয়ে তাঁর দপ্তর স্থাপন করেন, ৮/২ মৌলানা শাখওয়াত

আলি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, যদিও বর্তমানে অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ সংগঠনের কার্যক্রম তাঁর নিজ বাসভবনে ৪/১ করিম হাসান লেন, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০৭১ থেকে পরিচালিত হতে থাকে।[৯২]

ইয়াসমিন নিগার খানের নেতৃত্বে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেন কলকাতার পাশতুন জনগোষ্ঠীর মানুষরা, যাঁরা কাবুলিওয়ালা হিসাবেই প্রসিদ্ধ। প্রসঙ্গত সারা ভারতসহ কলকাতায় অবস্থিত যত কাবুলিওয়ালা দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশই আফগানিস্তানের পাশতুন জনগোষ্ঠীর। ইয়াসমিন নিগার খান সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েই এই সমস্ত কাবুলিওয়ালাদের একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং একইসঙ্গে তাঁদের সমস্যার কথা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন ভারত সরকারের কাছে। এছাড়া তিনি কলকাতার কাবুলিওয়াদেরকে নিয়ে নানা রকমের সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কলকাতাতে যে সমস্ত কাবুলিওয়ালাদের বসবাস ছিল তাঁদের নিত্য দিনের সমস্যা থেকে শুরু করে আগামীতে তাঁর কী পদক্ষেপ করবে সেদিক দিয়ে সূদর প্রসারী চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন। আফগানিস্তান এমন একটি দেশ যেখানে ঔপনিবেশিক আমল থেকে সমকালীন সময় পর্যন্ত সমস্যাতে জর্জরিত। ফলে যখনই আফগানিস্তানে সমস্যা দেখা দিয়েছে তখনই ভারত তথা কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের উপরে নেমে আসে নানা রকমের অপবাদ, অভিযোগ ইত্যাদি। আর ঠিক এই সময়ে সমস্যার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন ইয়াসমিন নিগার খান। তিনি সাধারণ জনমানস থেকে শুরু করে সংবাদ মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক অবস্থান কি। ফলে এইরকম হাজার সংকটময় মুহুর্তে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করে জানিয়ে দিয়েছেন একাধিক সময়ে আফগানিস্তানে ঘটে যাওয়া ঘটনাতে কাবুলিওয়ালা তথা পাশতুন জনগোষ্ঠীর কী বক্তব্য।

অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের সভাপতি হিসাবে তিনি শুধুমাত্র কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পাশেই থাকেননি, যে সমস্ত আফগানরা সাম্প্রতিককালে কলকাতাতে এসেছেন তাঁদের জীবন-জীবিকা, বাসস্থান, প্রশাসনিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন করেছেন, এমনকি যে সমস্ত আফগান পরিবার চিকিৎসার জন্য

কলকাতাতে আসেন তাঁদেরকে উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্থ, বাড়ি ভাড়া ইত্যদিতে এই সংগঠন ছিল অত্যন্ত তৎপর।[৯৩] তবে ইয়সামিন নিগারের সময়ে এই সংগঠনের বহর খানিকটা ছোট হয়ে আসে, লালাজান খানের সময়ে যেভাবে সারা ভারতে এই সংগঠন পাঠানদের একতাবদ্ধ করে একটা জনভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছিল, ইয়াসমিনের সময়ে তা হয়ে ওঠেনি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আফগানদের মধ্যে যাঁরা কলকাতাতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিলেন নিরক্ষর, ফলে এঁদের মধ্যে অনেকেই অতর্কিতে নানারকমের সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। তখন এই সংগঠনের সদস্যদের মিলিত কার্যক্রমে সমস্যার সমাধান করে থাকেন। এছাড়া মিস ইয়াসমিন নিগার খান প্রতিবছর বার্ষিক অধিবেশনে সমস্ত কাবুলিওয়ালাদেরকে একত্রিত করে সারা বছরের কাজমর্মের রূপরেখা ঠিক করেন। তাঁর উদ্যোগে যে সমস্ত আফগান কাবুলিওয়ালারা সাম্প্রতিকসময়ে কলকাতাতে আসেন তাঁদের জন্য সদস্যপদ গ্রহণের পথ খোলা থাকে। পুরনোদের সদস্যপদ নবিনীকরণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের আইন মোতাবেক কোনও সোসাইটির রেজিস্ট্রেশনের যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম মেনে ‘অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ’ নতুন করে সংগঠনকে সরকারের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৯৪]

ইয়াসমিন নিগার খান তাঁর নিজের দক্ষতায় এই সংগঠনের কার্যক্রমকে উচ্চ সীমায় নিয়ে গেছেন। তাঁর বাবা লালাজান খানের ফেলে যাওয়া সংগঠনকে আরও মজবুত করতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছেন, তবে সম্পূর্ণ করতে পারেননি। কারণ কলকাতার মধ্যে এমন অনেক কাবুলিওয়ালা আছেন যাঁরা তাঁর নেতৃত্বকে মেনে নিতে চাননি, কারণ হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করেন এই সংগঠন সবসময় কাবুলিওয়ালাদের পাশে থাকেন না। এমনকি কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে ইয়াসমিন তেমন কিছু গঠনমূলক কাজ করেননি। অধিকাংশ সময়ে নিজেদের পরিবারের মধ্যেই নেতৃত্বকে রাখার চেষ্টা করেছেন। কলকাতার বেশকিছু কাবুলিওয়ালার সঙ্গে কথা বলে জানা যায় তাঁরা নাকি ইয়াসমিন নিগার খানের কথা জানেন না। তবে একথা ঠিক যে ইয়াসমিন নিগার খান তিনি নিজেকে আফগান পাঠান ও কাবুলিওয়ালাদের নেত্রী হিসাবে মনে করলেও, তাঁর কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কলকাতার সমগ্র পাঠান জাতিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসতে তিনি সক্ষম

হননি। এমনকি পরবর্তী সময়ে তাঁরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে কলকাতার বহু কাবুলি একমত হতে পারেননি। ফলে এই সংগঠন যে খুব সফলভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল সে কথা বলা যায় না।

অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের বর্তমান সভানেত্রী ইয়াসমিন নিগার খান, গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা, ১৫.০৯.২০২১)

খোদাই খিদমদগার (ভারত পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ) সংগঠনের নেতা আমির খান, গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা, ২২.০৪.২০১৮)

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করতে গেলে আর একটি সংগঠনের কথা উল্লেখ করতে হয়। যার নাম হল ‘ভারত পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ’ যা খান আব্দুল গফফর খানের ‘খোদা-ই-খিদমদ্গার’ সংগঠনের অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়েছিল। আমির খান নামক এক কাবুলিওয়ালা পরিবারের সন্তানের হাত ধরে। এই সংগঠনের জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। আমির খান ছিলেন সীমান্ত গান্ধির (আব্দুল গফফর খানে) একনিষ্ঠ ভক্ত। সীমন্ত গান্ধির স্মৃতি ও আদর্শকে সামনে রেখে এই সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনটি তিনি কলকাতাতে বসবাসরত কয়েকজন কাবুলিওয়ালাকে নিয়ে স্থাপন করেন। আমির খান হলেন দ্বিতীয় প্রজন্মের কাবুলিওয়ালা, আমির খানের বাবা ছিলেন ইয়ার মহম্মদ খান, যিনি আফগানিস্তান থেকে কলকাতাতে এসেছিলেন ঊনিবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। আমির খান কলকাতার কাশিপুর অঞ্চলে শৈশব জীবন কাটিয়েছেন তাঁর পরিবারের সঙ্গে, পড়াশোনা করেছে কলকাতাতে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠে আসে কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে গঠিত সংগঠনের কথা। তিনি কলকাতাতে বসবাস করতে করতে বুঝেছিলেন কাবুলিওয়ালাদের সমস্যার কথা। তাই

সেই অনুপ্রেরণা থেকেই নির্মাণ করেছিলেন 'ভারত পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ' নামক একটি সংগঠন। যার অন্য নাম 'খোদাই-খিদমদগার'।

আমির খানের প্রচেষ্টায় নির্মিত এই সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেছিল কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের একাংশ। যাঁরা এই সংগঠনের নাম নথিভুক্ত করেছিলেন তাঁদের সকলকে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটা করে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়। মধ্য কলকাতার একটি হোটেলে বসে আমির খান বলছিলেন প্রায় ৭০ বছর ধরে আফগানরা কলকাতাতে বসবাস করেও তাঁদের নিদিষ্ট কোনও পরিচয় তৈরি হয়নি। তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এই সংগঠনের স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন 'এবার আমাদের একটা পরিচয় চাই', তাই এই সংগঠনের প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করেছি। তিনি আরও বলেন আমাদের তৈরি 'ভারত পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দে'র সংগঠন পূর্বভারতে বিস্তার লাভ করেছে, পূর্বভারতের এই সংগঠনের সদর দপ্তর কলকাতা এবং আসামের শিলং এ। এই সংগঠনের মাধ্যমে আমির খান সারা ভারতে পাখতুন জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁদের ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। একইসঙ্গে তুলে ধরেছিলেন কাবুলিওয়াদের মূল সমস্যাগুলিকে।[৯৫] সাম্প্রতিককালে কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকায় একজন পাখতুন জনগোষ্ঠীর মানুষ খুন হয়। ফলে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। এমনিতে কলকাতার বুকে কাবুলিওয়ালা জনগোষ্ঠী সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকন। তাঁর উপরে এই ঘটনা ঘটার পরে তাঁদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়। এছাড়া প্রায়ই পুলিশের উপদ্রব এই জনগোষ্ঠীর উপরে লেগেই থাকে।

আমির খানের প্রচেষ্টায় 'ভারত পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দে'র মাধ্যমে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের একত্রিত করে যাতে তাঁদের নিরাপত্তা দেওয়া যায় তাঁর প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই সংগঠনের কর্মকর্তা আমির খানের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি মৌখিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বলা হয় 'ভারত পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের' যে সদস্যরা কলকাতাতে বসবাস করেন তাঁদের প্রত্যেককে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি পরিচয় পত্র প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে যাঁরা যে অঞ্চলে বসবাস করেন, সেই অঞ্চলের মধ্যে নিদিষ্ট থানাতে একই পরিচয়পত্রের প্রতিলিপি জমা থাকবে। যাতে কাবুলিওয়ালারদের কোনও সমস্যা দেখা

দিলে পুলিশ খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।[৯৬] আমির খানের তৈরি এই সংগঠন কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের একাধিক সমস্যায় পাশে থাকার চেষ্টা করেন। এছাড়া কাবুলিওয়ালারা যখনই কোনও সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন নেতা হিসাবে আমির খান সবসময় পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমির খানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির যোগাযোগের কথাও উঠে আসে। পশ্চিমবঙ্গে যখন যে সরকার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছেন সেই সরকারকে শুভেচ্ছাপত্র পাঠিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন কাবুলিওয়ালারা। এছাড়া এই সংগঠনের পক্ষ থেকে বাৎসরিক রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গে বন্যা বিপর্যয়ের দিনগুলিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করার দৃষ্টান্ত দেখা যায়।[৯৭]

তবে আমির খানের তৈরি এই সংগঠনের কার্যক্রমে কলকাতার সমগ্র কাবুলিওয়ালারা একত্রিত হননি। ফলে সংগঠনের সার্বিক সাফল্য তেমন ভাবে আসেনি। ফলে তাঁর এই উদ্যোগ সাময়িকভাবে আলোড়ন তৈরি করলেও স্থায়ীভাবে কলকাতার বুকে কোনও ছাপ রাখতে পারেনি। আমির খান যে পদ্ধতিতে 'ভারত পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ' সংগঠন তৈরি করেছিলেন, তাঁর নিদিষ্ট কোনও রূপরেখা ছিল না। এমনকি ছিল না কোনও স্থায়ী কমিটি, যাঁরা এই সংগঠনের কার্যক্রমকে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। ঠিক একইভাবে একটা সময়ের পরে আমির খান নিজেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তিনি বলেন "এই সংগঠন পরিচালনা করতে গিয়ে আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, দিতে হয় অনেকটা সময়। আমি নিজে দরিদ্র মানুষ, নিত্য কাজ করে খেতে হয়। আমি কলকাতার খানদের বলেছি, এভাবে আমার পক্ষে সংগঠন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাঁরা যদি আমাকে মাস মাইনের ব্যবস্থা না করেন। এত বলার পরেও যখন কোনও কাজ হল না, শেষে আমি এই দায়িত্ব থেকে অনেকটা সরে এসেছি। তাই বর্তমানে সংগঠন আছে ঠিকই তবে কার্যক্রমের উদ্যোগ আর আগের মতো নেই।"[৯৮] সুতরাং আমির খানের কথা থেকে পরিষ্কার উঠে আসে সংগঠনের সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা। তাই সংগঠন খুব বেশিদিন তাঁর কার্যক্রমকে যে ধরে রাখতে পারেনি সে কথা পরিষ্কার উঠে আসে।

এছাড়া সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাখতুনদের ছোট ছোট সংগঠনের কথা জানা যায়, যেগুলি সবটাই খান আব্দুল গফফর খানের 'খোদা-ই-খিদমদ্গারে'র অনুকরণে,

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শ ও চিন্তাধারা মহাত্মা গান্ধি ও সীমান্ত গান্ধির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। তবে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে তাঁদের কোনও প্রতক্ষ যোগাযোগ নেই। একমাত্র লালাজান খান ও ইয়াসমিন নিগার খানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'অল ইন্ডিয়া পাখতুন 'জিরগা-ই-হিন্দ' এবং আমির খানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'ভারত পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ' সংগঠন ছাড়া। এই দুই সংগঠন ও তাঁদের নেতৃবৃন্দ ছাড়া কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিষয় নিয়ে আর কোনও পাখতুন নেতৃত্বের কথা উঠে আসে না। তবে উভয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের নিজেদের সংগঠনের বিষয়ে সফলতার কথা বললেও, অন্য সংগঠনের সফলতার বিষয়ে একমত নন, বরং একে অপরের উপরে শুধুই দোষারোপ করে গেছেন। কাজেই নেতৃবৃন্দের এই দ্বন্দ্বের কারণে সংগঠনের কার্যকলাপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ফলে কাবুলিওয়াদের সার্বিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনকি এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিসরে তাঁরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন।

সারণি: ৪.৩. কলকাতার পাখতুন জনগোষ্ঠীর সংগঠন ও নেতৃবৃন্দ

ক্রমিক সংখ্যা	সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা	সংগঠনের নাম	পদাধিকারী
১.	লালাজান খান	অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ	সভাপতি
২.	ইয়াসমিন নিগার খান	অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ	সভানেত্রী
৩.	আমির খান	ভারত পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ/ খোদাই খিদমদগার	সভাপতি

সূত্র: গবেষক নিজে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন

৪.৬.৩. কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (১৯৪৭-২০১৬)

আফগান কাবুলিওয়ালাদের কলকাতায় দীর্ঘদিন বসবাস করার সুবাদে তাঁদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিকটা খুব অল্প পরিসরের ফুটে উঠেছে। কলকাতার শান্তিপ্রিয় জনগোষ্ঠী হিসাবে কাবুলিওয়ালারা রাজনীতি থেকে নিজেদেরকে দূরত্ব রেখেই চলতেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে কাবুলিওয়ালারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হলেও তাঁদের কিছু চাহিদা অনেক সময় তাঁদের রাজনীতির আঙিনায় টেনে নিয়ে গেছেন। অভিবাসীত

জনগোষ্ঠী রূপে যে স্বাভাবিক চাহিদাগুলি মানুষের মধ্যে থাকে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যেও তা ছিল। ফলে তাঁদের জীবন-জীবিকা, বাসস্থান, ভোটাধিকার, নাগরিকত্ব এবং সর্বোপরি নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষে অনেক সময় প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করেও, তাঁরা পরোক্ষভাবে নিজেদের দাবি-দাবা এবং চাহিদাগুলিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন।

কাবুলিওয়ালারাদের রাজনৈতিক সত্তার জাগরণের ক্ষেত্রে ১৯৪৯ সালে লালাজান খানের নেতৃত্ব 'পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ' নামক সংগঠনটি সারা ভারতের পাখতুন জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। লালাজান খান ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তাঁর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চিঠিপত্র থেকে। ১৯৬৬ সালে ১১ জানুয়ারি ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী লালাবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে লালজান খান 'পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ' সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মাধ্যমে শোক জ্ঞাপন করে চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠির প্রত্যুত্তরে ১৯৬৬ সালে ২০ জানুয়ারি প্রফুল্ল চন্দ্র সেন পাশতুন সংগঠনের নেতা লালাজান খানকে তাঁর চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেন।[৯৯]

এছাড়া লালজান সম্পর্কিত চিঠিপত্র থেকে উঠে আসে পাখতুন জনগোষ্ঠীর বিষয়ে একাধিক তথ্য। যেখান থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি ধরা পড়ে এবং একইসঙ্গে উঠে আসে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক পরিবৃত্তের ইতিহাস। ঠিক এমনই একটি চিঠির প্রসঙ্গ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । লালজান খান ১৯৬৭ সালের ১৫ ই আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখার্জীকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবল উপলক্ষে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠির প্রত্যুত্তরে অজয় মুখার্জি ১৯৬৭ সালের ১৭ আগস্ট লালজান খান সহ 'অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের' সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন এবং যেখানে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন।[১০০] কলকাতার কাবুলিওয়ালারা বছরের নিদিষ্ট দিনগুলিতে যখন নানা রকমের উৎসব-অনুষ্ঠানে মেতে উঠতেন, অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানাতেন। ঠিক এমনই

একটা ঘটনার কথা জানতে পারা যায় লালাজান খানের আর একটি একটি ঠিঠি থেকে। ‘অল ইন্ডিয়া জিরগা-ই-হিন্দের’ পক্ষ থেকে ১৯৬৯ সালের ১৫ আগষ্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত কাবুলিওয়ালারা কলকাতাতে একটি বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন করেছিলেন। এই অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধান অতিথি হিসাবে। জ্যোতি বসু এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁর শুভেচ্ছা পাঠিয়ে শ্রী প্রমোদ দাশ গুপ্তকে পাঠিয়েছিলেন অধিবেশনের প্রধান অতিথি হিসাবে।[১০১] সুতরাং লালজান খানের প্রচেষ্টায় ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কলকাতার পাখতুন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সেতুবন্ধ গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। লালাজান খান চেষ্টা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না করেও পরোক্ষভাবে কাবুলিওয়ালারা সংগঠনের কথা নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে দিতে। তাঁর এই অ-রাজনৈতিক কূটনীতির মধ্যে যে সর্বময় রাজনৈতিক প্রয়াস অনুভব করা গিয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন থেকে জ্যোতি বসু পর্যন্ত সকলেই কাবুলিওয়ালাদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং কাবুলিওয়ালাদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন নিয়মিত।

লালজান খানের মৃত্যুর পরে ভারতের পাখতুন জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক যোগাযোগ স্তব্ধ হয়ে যায়নি। লালাজান খানের কন্যা ইয়াসমিন নিগার খান ‘অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ’ সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে আরও প্রাসারিত করেছিলেন। ইয়াসমিন নিগার খানের উদ্যোগে কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের সর্বপ্রথম প্রয়াস ছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানের পাখতুন জনগোষ্ঠীর বসবাসের নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। এই প্রসঙ্গে ১৯৯৬ সালের ২ জুলাই আল ইন্ডিয়া ‘পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ’ সংগঠনের সভাপতি হিসাবে ভারতবর্ষের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেছিলেন। এই স্মারকলিপিতে তিনি জানিয়েছিলেন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশনামা জারি করে বলা হয়েছে ১৯৫২ সালের ১৫ অক্টোবরের পরে যে সমস্ত পাখতুন জনগোষ্ঠীর মানুষ ভারতবর্ষে এসেছেন তাঁদের সকলকে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১০২] যদি তাঁরা এই নির্দেশ অমান্য করেন তবে তাঁদেরকে ‘পাকিস্থানি’

অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। এই মর্মে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই নির্দেশনামা দেখিয়ে বিহারের পাখতুন জনগোষ্ঠীর উপরে পুলিশি অত্যাচার শুরু করেছে।[১০৩]

ইয়াসমিন নিগার খান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে আরও জানিয়েছিলেন এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত পাখতুন জনগোষ্ঠীর মানুষরা আছেন তাঁরা সকলেই খান আব্দুল গফফর খনের সন্তানসম। এঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা ভারতে সংসার জীবনের শুরু করেছেন, আছে সন্তান সন্ততি। পাখতুনরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় থেকেই লড়াই করে আসছেন, তাই নতুন করে তাঁদের যদি আবার পাকিস্থানে যেতে বাধ্য করা হয় খান আব্দুল গফফর খানের সেই বিখ্যত উক্তি ‘নেকড়ের মুখে ফেলে দেওয়া’ (পাকিস্থানি) কথার পুনরাবৃত্তি হবে। তাই ভারতের পাখতুন জনগোষ্ঠীসহ কলকাতার কাবুলিওয়াদের ভারতে বসবাসের জন্য গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁরা কৃতজ্ঞ থাকবে ভারতের প্রতি। ইয়াসমিন নিগার খান এ প্রসঙ্গে ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে লেখেন “ভারতে বসবাসের জন্য কোনও চরমপত্র প্রাদান করছি না, আমি ভারতের সমস্ত পাখতুনবাসীর হয়ে অনুরোধ করছি মাত্র”।[১০৪]

পাখতুন জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের জন্য ইয়াসমিন নিগার খান ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের কাছে ছুটে বেড়িয়েছেন। চিঠি পাঠিয়েছেন একাধিক নেতৃবৃন্দের কাছে। এমনই একটি চিঠির কথা থেকে জানা যায়, যেখানে আফগানদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত লোকসভার ফরওয়ার্ড ব্লকের বিজয়ী সাংসদ চিত্ত বসুকে তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। চিত্ত বসু আফগানদের সমস্যার কথা শোনার পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে ১০ অক্টোবর ১৯৯৬ সালে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন।[১০৫] যেখানে আফগানদের উপরে যেভাবে পুলিশি আক্রমণ হচ্ছে সেই বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। একইসঙ্গে জানিয়েছিলেন ভারতের পাখতুন জনগোষ্ঠীর মানুষ সংখ্যালঘু, অথচ সরকার তাঁদেরকে পাকিস্থানি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইছেন, যাঁর সঙ্গে পাখতুনদের কোনও যোগসূত্র নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯৯৭ সালে ৭ই জুলাই একটা পত্রের মাধ্যমে সাংসদ চিত্ত বসুকে জানিয়েছিলেন এই ব্যাপারে তিনি উপযুক্ত ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন।[১০৬]

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক চেতনার দিকটি আরও প্রকাশ্যে আসে ২০০৩ সালে। কারণ এই সময়ে পুলিশের পক্ষ থেকে ভারতের পাখতুন জনগোষ্ঠীর উপরে পুনরায় শুরু হয় ধরপাকড়ের পালা। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কেন্দ্র সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই নির্দেশ কার্যকরী করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনামাতে জানানো হয়েছে ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবরের পরে যে সমস্ত বিদেশি নাগরিক ভারতে বসবাস করছেন তাঁদের সকলকে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এই মর্মে ভারতের পাখতুন জনগোষ্ঠী অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখন কলকাতার কাবুলিওয়ালা এবং ভারতের পাখতুন জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সাংসদ সোমনাথ চ্যাটার্জিকে সমস্যার ব্যপারে (CPIM) বিস্তারিত জানানো হয়। সোমনাথ চ্যাটার্জি ২০০৩ সালের ৭ই এপ্রিল তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রী এল. কে আদবানিকে কলকাতাসহ সারা ভারতের পাখতুন জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার কথা লিখে পত্র প্রেরণ করেন।[১০৭] সেখানে সোমনাথ চ্যাটার্জি উল্লেখ করেন-

> ১৯৯৬ সালে ২ জুলাই এবং ৯ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ও সাংসদ চিত্ত বসু ভারতের পাখতুন জনগোষ্ঠী নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তাই আদবানিজি আপনি যদি কলকাতার পাখতুন জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার বিষয়টি একটু সহনুভূতীর সঙ্গে বিবেচনা করেন, তাহলে পাখতুনরা গভীর অনিশ্চয়তার জীবনের হাত থেকে মুক্তি পাবে।[১০৮]

এইভাবে ইয়াসমিন নিগার খানের উৎসাহে 'অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ' কলকাতাসহ সারা ভারতের পাঠানদের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৯৮ সালে ১৯ মে একটা চিঠি থেকে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন পুলিশ ও তথ্যসংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টচার্য কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।[১০৯] এছাড়া লালাজান খানের সঙ্গে বহু আগে থেকেই সি পি আই এম নেতা মহম্মদ সেলিমের গভীর সম্পর্ক ছিল। পরে যখন ইয়াসমিন নিগার খান এই সংগঠনের নেত্রী পদে বসেছিলেন তখন বার বার তাঁদের সমস্যা নিয়ে মহম্মদ সেলিম সাহেবের

নিকটে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহম্মদ সেলিম তাঁদের সমস্যা গুরুত্ব সহকারে শুনতেন। তিনি নিজে থেকেই সবসময় কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পাশে থেকেছেন। ২০০৩ সালে 'অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের' অফিস ছিল ৯, এলিয়ট লেন, কলকাতা- ১৬ যেটি তৎকালীন সময়ে মহম্মদ সেলিমের নির্বাচন ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত ছিল।[১১০] অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হলেন, তখন তাঁর সঙ্গেও ইয়াসমিন নিগার খানের সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি মমতা বন্দোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা। ২০১২ সালে ১৫ মে ইয়াসমিন নিগার খান যখন সামাজিক উন্নয়ন এবং মহিলাদের উন্নতির জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেছিলেন।[১১১] এইভাবে ভারতের পাখতুন জনগোষ্ঠী এবং কলকাতার কাবুলিওয়ালারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে কাবুলিওয়ালারা জনসংখ্যায় কম থাকার কারণে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি বলে মনে করা হয়।

কলকাতার কাবুলিওয়ালা থেকে শুরু করে যত সংখ্যক পাখতুন নেতৃবৃন্দ কলকাতাতে ছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি এবং প্রয়াসের মধ্যে বারে বারে ফুটে ওঠে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি তাঁদের দুর্বলতার কথা। খান আব্দুল গফফর খান পরবর্তী যে সমস্ত পাখতুনরা কলকাতাতে ছিলেন তাঁরা যে কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ফলে তাঁরা যখনই কোনও সমস্যায় পড়েছেন, ছুটে গেছে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের কাছে। লালজান খান থেকে শুরু করে ইয়াসমিন নিগার খান পর্যন্ত সকলেই ভরসা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নেতাদের উপরে। একটা ছোট্ট ঘটনা থেকে এই বিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা উঠে আসে। ভারত সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে ইয়াসমিন নিগার খান যখন চিঠি লিখছেন, তখন তিনি স্পষ্টভাবে সেই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে-

> "If there is any sympathy for the Muslims in India by any Political Party, it is the Communists. They can be relied on for help".[১১২]

পরবর্তী সময়ে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নানারকমের কার্যক্রমের মধ্যে বামপন্থার প্রতি তাঁরা যে আস্থাশীল তা তাঁদের নানারকমের কার্যক্রমের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

কলকাতার কাবুলিওয়ালদদের মধ্যে বাপপন্থী রাজনীতির যে প্রভাব পড়েছিল তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে তাঁদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা, পশ্চিমবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতির কারণে যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তখনই কলকাতার কাবুলিওয়ালারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।[১১৩] জ্যোতি বসু যখনই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তখনই কাবুলিওয়ালারা ছুটে গেছেন হাসপাতালে, এমন অনেক তথ্য কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে উঠে আসে। ভারত পাখতুন 'জিরগা-ই-হিন্দে'র প্রেসিডেন্ট আমির খান বলেন শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসু কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তাঁর কাছে সমস্যা নিয়ে যখনই কাবুলিওয়ালারা ছুটে গেছেন তখনই তাঁদের তিনি সাহায্য করেছেন। 'অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের' সভাপতি ইয়াসমিন নিগার খান বলেছেন জ্যোতি বসুর সঙ্গে তাঁর সংগঠনের সম্পর্ক ছিল খুব ভালো। তিনি বারবার সাহায্য করেছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ আছে। তবে ইয়াসমিনের আক্ষেপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি কলকাতার কাবুলিওয়াদের প্রতি আরও একটু সহানুভূতিশীল হতে পারতেন তাহলে তাঁরা কৃতজ্ঞ থাকতেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি তাঁদের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একবার দেখা করে তাঁদের অভাব অভিযোগ এবং সমস্যার কথা শুনে তাঁদের জনগোষ্ঠীর জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তাহলে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতেন।[১১৪]

Bengal Form No. 403 (O).
INDIA DRIVING LICENSE (WEST BENGAL)
FORM D.

অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের প্রথম সভাপতি লালজান খানের ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্রতিলিপি, গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা, ১৫.০৯.২০২১)

কলকাতার পাখতুন জনগোষ্ঠীর পরিচয় পত্র, গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা, ১৫.০৯.২০২১)

৪.৬.৪. কাবুলিওয়ালাদের ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক আবেদন

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম আর একটি প্রধান দিক হল তাঁদের ভোটাধিকার প্রাপ্তি। কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। ভারত সবসময় আফগানিস্তানের নাগরিকদের নাগরিকত্ব প্রদানে সহানুভূতিশীল থেকেছেন। ফলে কলকাতার কাবুলিওয়ালদের মধ্যে যাঁরা ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে কলকাতায় বসবাস করেছেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ অংশ ভারতের ভোটাধিকার পেয়েছেন। তবে অনেকেই এমন আছেন যাঁরা এখনও পর্যন্ত ভোটাধিকার পাননি, যাঁরা এখনও নাগরিকত্বের সমস্যায় ভুগছেন। আমির খানের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে যাঁরা কলকাতাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এবং কলকাতায় সংসার জীবন শুরু করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড এমনকি জন্মগত শংসাপত্রে তেমন কোনও সমস্যা নেই।[১১৫]

কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে আবার অনেকেই আছেন যাঁরা বহু আগে কলকাতাতে এলেও, তাঁরা ভারতবর্ষে বসবাসের মতো তেমন কোনও প্রমাণপত্র জোগাড় করতে পারেননি। কারণ তাঁদের কলকাতাতে আগমনের শুরুর দিকে ভারতে প্রবেশের জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেননি। পরে ভারতে নাগরিকত্ব আইন পাশ হয়ে যাওয়াতে তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলে

আরও জানা যায় তাঁদের মধ্যে অনেকের ভোটাধিকার না থাকার অন্যতম কারণ আগেকারদিনে কাবুলিওয়ালাদের অনেকেই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করতেন, তখনকার দিনে হাসপাতাল, নার্সিংহোমের ব্যবস্থা ছিল না।[১১৬] বাড়িতে জন্মগ্রহণ করার ফলে স্বাভাবিক ভাবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই জন্মের শংসাপত্র জোগাড় করতে পারেননি। পরবর্তীতে এই সমস্ত প্রমাণপত্রের অভাবে বাসস্থান ও ভোটাধিকারের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেতে তাঁরা নানা রকমের সমস্যার মধ্যে পড়েছেন।

কলকাতায় বর্তমানে আনুমানিক ৬০০০ এর মতো কাবুলিওয়ালার বসবাস করছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে কলকাতায় বসবাস করছেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের কাবুলিওয়ালারা বেশিরভাগ কলকাতা পৌরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোটাধিকার লাভ করেছেন। তাঁদের সকলের আছে ভোটদানের প্রমাণপত্র। এঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা কলকাতাসহ কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোটদানকারী। প্রতিটি নির্বাচনে তাঁরা ভোটদান করে থাকেন। আমির খান থেকে দাদগুল খান, ইয়াসমিন নিগার খান থেকে পির মহম্মদ খান, আব্দুল্লা খান থেকে গুল মহম্মদ খান এমন হাজার হাজার কাবুলিওয়ালার বসবাস কলকাতায় আছে, যাঁরা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা, যাঁরা নির্বাচন এলে ভোট প্রদান করেন এবং নির্বাচিত করেন জনপ্রতিনিধি। তবে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে ভোট প্রদানের অধিকার থাকলেও, নির্বাচন নিয়ে তাঁদের তেমন কোনও মাথা ব্যাথা থাকে না। কাজেই কলকাতার কাবুলিওয়ালা জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে তেমন কোনও জনপ্রতিনিধির খোঁজ পাওয়া যায় না, যিনি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়।

কলকাতার কাবুলিওয়ালারা কলকাতায় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মিটিং মিছিলে যোগদান করলেও বৃহৎ প্রেক্ষিতে তাঁদের মধ্যে কোনও নেতৃবর্গের নাম উঠে আসে না। যদি কোনও কাবুলিওয়ালা রাজনৈতিক মিটিং মিছিলে যোগদান করে থাকেন তা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত, এখানে কাবুলিওয়ালাদের সংগঠন ভিত্তিক যোগদানের তেমন প্রয়াস নেই। তবে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের নথি থেকে একটা জনসভার কথা জানা যায়, যেখানে কাবুলিওয়ালাদের একটা অংশ সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন বহুবছর আগে। ১৯৬৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতার মনুমেন্ট ময়দানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভার উদ্যোক্তা ছিলেন আব্দুল গফুর খান (ফ্রন্টিয়ার গান্ধি) রিলিজ কমটি।[১১৭] কলকাতা

পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী সভাটি ৪.৩০ মিনিট থেকে ৫.৫৫ মিনিট পর্যন্ত সভাটি চলেছিল। সভাতে পঞ্চাশজন মতো লোক জোগদান করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ১৫ জন ছিল আফগান কাবুলি পাঠান। এই সভাতে সভামুখ্য হিসাবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের (All India Forward Bloc) এম.এল.এ হেমন্ত কুমার বসু, এবং প্রধান বক্তা ছিলেন শিবনাথ ব্যানার্জি। এছাড়া অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বলশেভিক পার্টির (Bloshevik Party of India) শ্রী বরদা মুকুট মনি এবং সোশালিস্ট দলের (Socialist Party) পদম সিংহ সহ আরও কয়েকজন নেতৃবৃন্দ উক্ত সভাতে ভাষণ দিয়েছিলেন। এই সভা সংগঠিত হওয়ার মূল কারণ ছিল সীমান্ত গান্ধিকে অন্যায়ভাবে পাকিস্তানের জেলে আটকে রাখাকে কেন্দ্র করে।[১১৮]

সীমান্ত গান্ধি পাকিস্তানের জেলে আটকে রাখার সময়ে তাঁর উপরে পাকিস্থান সরকার বর্বরোচিত অত্যাচার চালায়। তাই কলকাতার কাবুলিওয়ালারা উক্ত জনসভা থেকে ভারত সরকারকে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য। যাতে পাকিস্থান সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করা যায়। আনুমানিক সন্ধ্যা ছ'টার সময়ে সভাকার্য শেষ হওয়ার পরে উক্ত নেতৃবৃন্দসহ কাবুলিওয়ালাদের ৩০ জনের একটি মিছিল সার্কাস অ্যাভিনিউ মুখে রওনা হয়। এরপর চৌরঙ্গি, পার্কস্ট্রিট এবং লোয়ার সার্কুলার রোড হয়ে মিছিলটি পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশানারের অফিসের দিকে যায়। সার্কাস এভিনিউ ও লোয়ার সার্কুলার রোডে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। অবশেষে মিছিলটি সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শেষ হয়ে যায়।[১১৯]

৪.৭. পর্যবেক্ষণ

কাবুলিওয়ালাদের কলকাতায় আগমনের সঙ্গে তাঁদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের কথা উঠে আসে। ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালারা যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন পেশা হিসাবে তাঁরা শুকনো ফল বিক্রেতা, পুরনো কাপড়ের ব্যবসা এবং সুদের ব্যবসার মতো পেশা গ্রহণ করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতেন। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক জীবনে বেশ খানিকটা পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল। ফলে পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁরা নতুন পেশার দিকে নিজেদের যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের কাবুলিওয়ালদের মধ্যে পেশা পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। তাঁরা ব্যবসার ক্ষেত্র প্রসারিত করেছিলেন

এবং সরে আসতে চেয়েছিলেন পারিবারিক পুরনো পেশা থেকে। ফলে মাইক্রোফিনান্স, হোটেল ব্যবসা, স্থায়ী দোকানে এমনকি চাকরি বাকরির দিকে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। একইসঙ্গে কলকাতায় কাবুলিওয়ালাদের সমাজ জীবনের বেশ কিছু চিত্র উঠে আসে। যেমন কাবুলিওয়ালাদের পারিবারিক জীবন, কাবুলিওয়ালাদের সমাজে মহিলাদের স্থান, শিক্ষা-দীক্ষা, জন্ম-বৃত্তান্ত, বিবাহ ইত্যাদি দিকের কথা উঠে আসে। যেখানে লক্ষ করা যায় কলকাতার মতো সমাজ ব্যবস্থায় বসবাস করার পরেও তাঁদের সমাজের যে মৌলিক আচার আচরণ ধরে রেখেছিলেন সে কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

কলকাতাতে কাবুলিওয়ালাদের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের কথাও উল্লেখযোগ্য ভাবে উঠে আসে। যেখানে দেখা যায় কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না করেও, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে একেরারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি। তাঁরা নিজেদের মধ্যে সভা-সমিতি এবং সংগঠন স্থাপন করে তাঁদের নিজেদের দাবি-দাওয়াকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ফলে অল ইন্ডিয়া ‘পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ’, ‘খোদাই-খিদমদগার’, ‘ভারত পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ’ এর মতো সংঠনের কথা উঠে আসে। একইসঙ্গে কলকাতার নাগরিক জীবনে তাঁদের ভোটাধিকারের সমস্যা, রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশের সমস্যা এবং রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার মতো অবস্থা তাঁদের সমস্যার মধ্যে ফেলতে বাধ্য করেছে। এছাড়া নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সমস্যার কারণেও কাবুলিওয়ালারা কলকাতাতে রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েন।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য: *সন তারিখে কলকাতার ইতিহাস,* (কলকতা, অনন্য প্রকাশন, ১৯৯১)

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *কাবুলিওয়ালা,* (বিশ্বভারতি, সাধনা প্রত্রিকা, ১২৯৯)।

৩. I.B File No- *236/39(16B) Foreigners Afghan National- Afghan National Entering into India via Punjab.*

৪. সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী: *সীমান্তের অন্তরালে,* (কলকাতা, জয়ঢাক প্রকাশনা, ২০১৭),পৃ. ২৪।

৫. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] : *সাক্ষাৎকার*। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৮.০৩.২০১৯)।

৬. H William Warner: *The Kabuliwalas: Afghan moneylending and the credit cosmopolis of British India, c 1880-1947,* (New Delhi, Economic and Social History Review, Sage Publication, 2020)পৃ.পৃ ১৮৪-১৮৭

৭. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদগার, সভাপতি, কলকাতা] :*প্রাগুক্ত।*

৮. *Census of India*, 2011, পৃ.৭৪।

৯. H. William Warner: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৮৬।

১০. *Indian Nots and News, proposed Kabuli colony, Times of India, 2nd Octobor 1911,* পৃ.৪।

১১. *Danik Basumati:* 20 October, 1919.

১২. IB File No: *236/39(16, 16C, 16B, 16E)* এর ফাইল গুলি দেখুন, এখানে আফগানদের কাজের ধরণ কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তা উল্লেখ পাওয়া যায়, নতুন পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁরা কীভাবে পেশা পরিবর্তন করছেন তাঁর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১৩. ওয়ালি মহম্মদ খান [৫২, আফগান ব্যবসায়ী, কলকাতা , নিউ মার্কেট]: *সাক্ষাৎকার*। *সা*ক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন গবেষক নিজে, (১৫.০৩.২০২২)।

১৪. H William Warner: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৮৬।

১৫. *তদেব,* পৃ. ১৯১।

১৬. *তদেব।*

১৭. *Bengal Money Lenders Act 1933 & 1940.*

১৮. NAI File No: *5/1/1949, (Foreigners I section, 1949, Ministry of Home Affiers Government of India.*

১৯. H. William Warner: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৮৬।

২০. দিন মহম্মদ দরবেশ [২৬, হুসেন এন্ড গারমেন্টেসের কর্মচারী, ময়দান লেন, কলকাতা]: সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন গবেষক নিজে, (১৭.০৯.২০২১)।

২১. *আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৫।*

২২. *তদেব।*

২৩. কলকাতার বসবাসরত একাধিক কাবুলিওয়ার উপরে সমীক্ষা করার পরে উঠে আসে প্রসঙ্গ। গবেষক (আনিসুল হক) নিজে ক্ষেত্র সমীক্ষা (১১.০২.১৬ থেকে ৬.১১.২২ সাল পর্যন্ত) করেছেন কাবুলিওয়ালাদের উপরে। সেখান থেকে এই তথ্য উঠে আসে। এছাড়া বিস্তারিত জানতে দেখুন- নাজিয়া আফরিন: *কাবুলিওয়ালার খোঁজে,* (ঢাকা, বিনিউজ

টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২০১৫)। আরও জানতে দেখুন- Moaka Najib and Najesh Afroz: *Kabul to Kolkata,* (কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে তথ্য চিত্র ও ছবি প্রদর্শনী, ২০১৫)।

২৪. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] :*প্রাগুক্ত।*

২৫. জাফর খান [৪২], আমির খান [৪০] আকবর খান [৫২] এঁরা সকলেই আফগানিস্তানের মুসাখেল প্রদেশের বাসিন্দা, বর্তমানে কলকাতার পার্ক সার্কাসের সৈয়দ আমির আলি এভিনিউতে বসবাস করেন। এঁরা সকলেই ব্যবসায়ী, তবে এঁদের বক্তব্য অনুযায়ী এঁরা সুদের ব্যবসা করেন না, তাই নিজেদের কাবুলিওয়ালা হিসাবে পরিচয় দিতে চান না: *সাক্ষাৎকার।*

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন গবেষক নিজে (১২.০৯.২০১৯)

২৬. রসিদ খান [৪৭, শুকনো ফল এবং কার্পেট ব্যবসায়ী, কান্দাহার]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে (১৮.১২.২০১৬)। সাধারণত শীতের শুরুতে কলকাতার বাণিজ্য মেলাগুলি শুরু হয়, এই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা তাঁদের দেশের পণ্য নিয়ে কলকাতাতে আসেন প্রাচার এবং বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে। রসিদ খান এমনই একজন ব্যবসায়ী, যিনি আফগান পণ্য নিয়ে কলকাতার মেলাগুলিতে প্রতি বছর অংশগ্রহণ করেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন- *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৯ই জানুয়ারি, ২০১৬। *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৯ এ ডিসেম্বর, ২০১৫।

২৭. *তদেব।*

২৮. *তদেব।*

২৯. *Hindusthan Times, 30 August, 2021*

৩০. মিঃ সমীর খান [২৭, ব্যবসায়ী, কাবুল]: *সাক্ষাৎকার*। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন (আনিসুল হক) গবেষক নিজে (২২.০২.২০২০)। এই সমীর খান সহ তাঁর সঙ্গে আরও তিনজন সহযোগী আফগান পণ্যের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন কলকাতাতে The Kabuliwalee নামের একটি প্রদর্শনীতে। এখানে আফগান শুকনো ফল, গহনা, কার্পেট, সুগন্ধি দ্রব্য নিয়ে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা।

৩১. *তদেব।*

৩২. পির নাজের তুর্কমেন [৩১, মাজার-ই-শরিফ, জুয়েলারি ব্যবসায়ী, আফগানিস্তান]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৬.০২.২০২০)

৩৩. *https://www.clusterpulse.org/other_web/kabuliwala/about_us.htm.*

৩৪. *আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন, ২৮ নভেম্বর, ২০২২।*

৩৫. *তদেব।*

৩৬. *তদেব।*

৩৭. রহিম সিদ্দিকি [৫২, হোটেল কর্মচারী, জাকারিয়া স্ট্রিট]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে (১৯.১১.২০১৯)।

৩৮. *Speech by Prime Minister at the Parliament of Afghanistan December 25, 2015.*

৩৯. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: *কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ,* (কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৮)।

৪০. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] : *প্রাগুক্ত।* বিস্তারিত জানতে দেখুন IB File No: 236/1939 , Afghan National North 24 Parganas. এখানে কাবুলিওয়লাদের গৃহকে খানকোঠি বলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে ১৯৩৯ সালে কাবুলিওয়ারা উত্তর চব্বিশ পরগাণার কাকিনাড়া অঞ্চলে ইছাক সরদার কোঠী নামক একটি গৃহে বসবাস করতেন।

৪১. মোঃ ফজলুল হক: আফগানিস্তানের ইতিহাস ১৭৪৭-১৯৭৮, (রাজশাহী, পাপিয়া সুলতানা, মার্চ ২০১৭), পৃ. ২৫৭।

৪২. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] : *প্রাগুক্ত।*

৪৩. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: *কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ,* (কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৮)

৪৪. *Instrument of Declaration by Miss Yesmin Nigar President All India Pakhtoon Jigra-e-Hind, Registrar of Assurance Calcutta U/87(8) III,* Date 18th August, 1996.

৪৫. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৪.০৯.২১)।

৪৬. I.B File No: *236/39(16, 16c, 16B) Foreigners Afghan National* এ আফগাদের শিক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়।

৪৭. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] : *প্রাগুক্ত।*

৪৮. হাফিজ মহম্মদ সৈয়দ [৬৮, কাবুলিওয়ালা আমির খানের বাল্যকালের শিক্ষক, কলকাতা, কাশীপুর] : *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৮.০৩.২০১৯)

৪৯. তদেব।

৫০. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস

এভিনিউ]: *প্রাগুক্ত।*

৫১. *তদেব।*

৫২. প্রথম আলো: *কোলকাতার বন্ধ কল্লোলিনি,* (বাংলাদেশ, ঢাকা, ১০ এপিল, ২০১৭)।

৫৩. I.B IB File: 236/1939, Afghan National in North 24 Parganas, Mednipur, Jalpaiguri, Siliguri ফাইলগুলিতে বিস্তারিত দেখুন।

৫৪. তোরবাজ মহম্মদ খাঁ [৪৮, আফগান ব্যবসায়ী, পূর্ব মেদিনীপুর]: *সাক্ষাৎকার*। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। ১৬.০৪.২২।

৫৫. নাজিয়া আফরিন: *কাবুলিওয়ালার খোঁজে,* (ঢাকা, বিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২০১৫)।

৫৬. I.B File No- *236/39(Past-A) Registration of Foreigners- Engagement in Connection with Afghan National in Mednipore.*

৫৭. Nazes Afroz & Moska Najib: *From Kabul to Kolkata of Belonging, Memories and Identity*, (Kolkata, 22th March, 2015).

৫৮. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] :*প্রাগুক্ত।*

৫৯. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] :*প্রাগুক্ত।*

৬০. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: প্রাগুক্ত, পৃ.২৭। এছাড়া বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন নাজেস আফরোজ, বিবিসি নিউজ সাংবাদিক, কাবুলিওয়ালাদের তথ্যচিত্র নির্মাতা, কলকাতা] *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে (৭.১২.২০১৬)।

৬১. M.K.A Siddique: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৫।

৬২. I.B File No: *236/1939, Afghan National in Menipore.* এছাড়া বিস্তারিত জানতে দেখুন- সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৪, শ্রী রমানাথ বিশ্বাস: *আফাগানিস্থান* , (কলকাতা, কোরক, প্রথম সংস্করণ ১৯৪৩), পৃ.পৃ. ৯০-৯৫, পান্থজন:*কাবুলের পথে পথে,* (কলকাতা, আনন্দ, ২০০৯),পৃ. পৃ. ১৫৯-১৬১।

৬৩. *তদেব।*

৬৪. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] : *প্রাগুক্ত।*

৬৫. I.B File No*: 236/1939, Afghan National in Menipore.*

৬৬. I.B File No: *236/1939, Afghan National in Calcutta.*

৬৭. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৪।

৬৮. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] : *প্রাগুক্ত।*

৬৯. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৪।

৭০. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] : *প্রাগুক্ত।*

৭১. খান আব্দুল গফফর খানের খোদা-খিদমদ্গার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন- Lester Kurtz: *The khudai khidmagar Movement 1933-1937*, (International Centure of Nonviolent Conflitc, 2009) পৃ. ৪-৮। ঋষি দাস: *বাদশা খান,* (কলকাতা অশোক প্রকাশনা, ১৯৫৯) পৃ. ৮৯। Mukulika Banerjee: *The pathan Unarmed Oppotion & Memory in the North West Frontier,* (United kingdom, Oxford University Press, 2000), sana Haroon: *Frontier of Faith Islam in indo afgan Boderland* , (United kingdom, C. Hurst & co, 2007). সীমান্ত গান্ধি খান আব্দুল গফফর গানের আদর্শে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের একত্র করে মিঃ আমির খানের নেতৃত্বে কাবুলিওয়ালারা খোদাই-খিদমদগার নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন। এই সংগঠনের নেতা ছিলেন আমির খান। আমির খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিষয়টি উঠে আসে।

৭২. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] : *প্রাগুক্ত।* আমির খানের থেকে প্রাপ্ত চিঠিপত্র এবং উদ্ধারকৃত কিছু ছবি থেকে জানা যায় ১৯৯৯ সালে কলকাতায় আমির খানের সংগঠন খোদা-ই-খিদমদ্গার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ তহবিলে অর্থ সাহায্য প্রদান করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাতে।

৭৩. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: *প্রাগুক্ত।* ইয়াসমিন নিগার খানের থেকে প্রাপ্ত চিঠিপত্র এবং উদ্ধার হওয়া কিছু ছবি থেকে জানা যায় ১৯৯৪ সালে অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ তহবিলে অর্থ সাহায্য প্রদান করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাতে। (১৪.০৯.২০২১)।

৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *প্রাগুক্ত।*

৭৫. *The Hitavadi: 18 January, 1901.*

৭৬. NAI File No: *102 The Kabul Pest, The Englishmen, Dated 8 April, 1903.*

৭৭. H. William Warner: *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬।

৭৮. তদেব: পৃ. ১৫৮।

৭৯. I.B File No: *236/1939, Afghan National in Dinajpur.*

৮০. সুনন্দ ঘোষ: *পাক যোগ ঘিরে গোয়েন্দা নজরে কাবুলিওয়ালা,* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ জুলাই ২০১৯).

৮১. IB File No*: 236/39 (16, 16C, 16B, 16E)* এর ফাইল গুলি দেখুন, এখানে সুদের টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে কাবুলিওয়ালাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যার মধ্যে তাঁদের পড়তে হয়। এছাড়া এই বিষয়ে আমির খান সহ কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের একাংশের মতামতো প্রায় একই। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে এই তথ্য উঠে আসে। ক্ষেত্র সমীক্ষা পর্যালোচনা করেছেন গবেষক নিজে।

৮২. খান আব্দুল গফফর খানের খোদা-খিদমদ্গার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন: *প্রাগুক্ত।* Lester Kurtz: প্রাগুক্ত,পৃ. ৪-৮।

৮৩. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: *প্রাগুক্ত।*

৮৪. *The Times of India, 17 August, 2021.*

৮৫. *Instrument of Declaration by Miss Yesmin Nigar President All India Pakhtoon Jigra-e-Hind, Registrar of Assurance Calcutta U/87(8) III, Date 18th August, 1996.* এছাড়া বিস্তারিত জানতে দেখুন- *Hindustan Times, 17 August, 2021.*

৮৬. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: *প্রাগুক্ত।* মিস ইয়াসমিন নিগার খানের থেকে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, সংবাদ পত্রের খবর এবং বিভিন্ন ছবি থেকে উদ্ধার হওয়া তথ্য।

৮৭. *তদেব।*

৮৮. *তদেব।*

৮৯. *Letter of G. Sha (Royal Afghan Embassi, Delhi) to the Lala Jaan Khan, All India pakhtoon-Jirga-E-Hind, Calcutta, Date 30th 1957.*

৯০. Instrument of Declaration by Miss Yesmin Nigar President All India Pakhtoon Jirga-e-Hind: *প্রাগুক্ত।*

৯১. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: *প্রাগুক্ত।*

৯২. ১৯৯৬ সালে *All India Pakhotoon Jirga-e-Hind* এর সভানেত্রী ইয়াসমিন নিগার খানের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা চিঠিপত্র থেকে অনেক অজানা তথ্য উঠে আসে। এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন গবেষক নিজে, (১৪.০৯.২০২১)।

৯৩. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: *প্রাগুক্ত।*

৯৪. *Certificate of Registration of the Societies' 'All India -Pakthoon-Jigra-e-Hind' West Bengal Act XXVI of 1961 (SL No-77119 of 2010-2011)*

৯৫. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] : *প্রাগুক্ত।*

৯৬. খবরের শিরোনাম 'সংগঠন গড়ে স্বজাতির মুখে হাসি ফোটালেন কাবুলিওয়ালারা'। সংবাদপত্রটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সংগঠন খোদাই-খিদমদ্গার সম্পর্কিত খবর এবং সংগঠনের সভাপতি আমির খানের থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। প্রকাশিত এই সংবাদপত্র আমির খানের থেকে গবেষক সংগ্রহ করেছেন। (১৮.০৩.২০১৬)।

৯৭. *তদেব।*

৯৮. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] : *প্রাগুক্ত।*

৯৯. *Letter of Prafulla Chandra Sen (Chief Ministar of West Bengal) to the Lala Jaan Khan, All India Pakhtoon-Jigra-E-Hind,* Calcutta, Date 20th January, 1966

১০০. *Letter of Ajay Kumar Mukherjee (Chief Minister of West Bengal) to the Lala Jann Khan, All India Pakhtoon Jigra-E-Hind,* Calcutta, Date 17th August, 1967.

১০১. *Letter of shri Jyoti Basu (Deputy Chief Minister of West Bengal) to the Lala Jaan Khan, Genral Sectretary, All India Pakhtoon Jigra-E -Hind.* Date 11th August, 1969.

১০২. *Letter of Indrajit Gupta (Home Minister, Govt, of India) of the Shri Chitta Basu (MP, New Delhi),* Delhi, Date 7th July, 1997.

১০৩. *তদেব।*

১০৪. *All India Pakhtoon Jirga-e-Hind* এর পক্ষ থেকে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তাকে পাঠানো চিঠিতে এই বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। *Letter of Indrajit Gupta (Home Minister, Govt, of India) of the Shri Chitta Basu (MP, New Delhi),* Delhi, Date 7th July, 1997. এছাড়া মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: থেকে চিঠির প্রতিলিপি গবেষক নিজে সংগ্রহ করেছেন, (১৪.০৯.২০২১)।

১০৫. *Letter of Chitta Basu (Member of Parliament, Lok Sabah) to the President of All India Pakhtoon Jigra-e-Hind.* Calcutta, Date 11th October, 1996.

১০৬. *তদেব।*

১০৭. *Letter of Somnath Chaterjee (Leader, CPI(M), Lok Sabha) of the Shri L.K Advani (Hon'ble Deputy Prime Minister, Government of India) and copy to Md. Salim, (Minister of Minorities Development and Welfare Department) and Ms, Yesmin Nigar Khan (President: All India Pakhtoon Jirga-e-Hind),* New Delhi, Date 7th April, 2003.

১০৮. *Letter of Indrajit Gupta (Home Minister, Govt, of India) of the Shri ChittaBasu (MP, New Delhi),* Delhi, Date 7th July, 1997.

১০৯. *তদেব।*

১১০. *Letter of Buddhadeb Bhattacharjee (Minister: Home (Police) Information & Cultural Affairs Department, West Bengal) of the Miss Yesmin Nigar Khan (All India pakhtoon Jirga-e-Hind President),* Calcutta, Date 19th May, 1998.

১১১. *Letter of Md.Salim (Ministar -in- Charge Minoritie's Department and Welfare Department, West Bengal) of the Shri Somnath Chaterjee (MP, New Delhi),* Calcutta, Date 2nd April, 2003.

১১২. *Letter of Mamta Banerjee (Chief Minister, West Bengal) to the Ms. Yesmin Nigar Khan (President, All India Jigra-E-Hind),* Calcutta Date 15th July, 2012.

১১৩. *Letter of Yesmin Nigar Khan (President of All India Pakhtoon Jigra-e-Hind) to the Indrajit Gupta, (Home Minister, India, New Delhi),* Date 2nd July, 1996.

১১৪. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: থেকে চিঠির প্রতিলিপি এবং চিত্র গবেষক নিজে সংগ্রহ করেছেন, (১৪.০৯.২০২১)।

১১৫. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: প্রাগুক্ত। এবং আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] : *প্রাগুক্ত।*

১১৬. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা] : *প্রাগুক্ত।*

১১৭. IB File: *File No- 1500/34 (Dup) Khan Abdul Gaffar frontier Gandhi.*

১১৮. *তদেব।*

১১৯. *তদেব।*

পঞ্চম অধ্যায়

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ এবং ধর্মীয় জীবনের পর্যালোচনা

কোনও জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, সেই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের লালন করা মূল্যবোধ। সমাজবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টেইলর মনে করেন মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাস এবং জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল সংস্কৃতি। যার মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, সামাজিক মূল্যবোধ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু, উৎসব, পার্বন, শিল্পকর্ম, শিক্ষা, সামর্থ্য, অভ্যাস সহ সবকিছুই সংস্কৃতির আওতাভুক্ত। বস্তুত সংস্কৃতি একটি আজন্মলালিত ঐতিহ্যিক অস্তিত্ব যা চলমান কিন্তু সব সময় দৃশ্যমান নয়, তবে অনুভব করা যায়।[১] আবার কোনও জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে সংস্কৃতি, কারণ 'ঐতিহ্য'কে নবরূপে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবনেও ঠিক একইভাবে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের দ্বৈত সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবন। ঐতিহ্যকে রক্ষা করার তাগিদে তাঁরা একদিকে যেমন নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস অনুভব করছেন, অন্যদিকে আবার কলকাতার কয়েকশ বছরের নিজেস্ব যে সাংস্কৃতিক পরিসর রয়েছে তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চলার চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে মিশ্র-সংস্কৃতির ভাবধারা ফুটে উঠেছে। যা তাঁদের তিন প্রজন্মের জীবনের উপরে গভীর প্রভাব ফেলেছে। ফলে তাঁদের বাড়িঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, পারিবারিক সংস্কৃতি, বিনোদন এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে আফগান সংস্কৃতির প্রভাব একেবারে বিলীন না হলেও, কলকাতার প্রভাব এসে পড়ায় আফগান সত্তা খানিকটা ম্লান হতে শুরু করেছে।

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পাশাপাশি ধর্মীয় জীবন অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এঁদের কয়েক প্রজন্ম কলকাতায় বসবাস করার ফলে ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। ধর্মীয় আচার-আচরণ, প্রার্থনাস্থল, এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে একাধিক কার্যাকলাপের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। যেখানে আফগান সত্তার প্রকটতা

পরিলক্ষিত না হলেও, তাঁদের ধর্মীয় চেতনায় ইসলামকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার প্রবণতা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। যা উক্ত এই আধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

৫.২. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়

কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের উপরে আলোকপাত করলে সর্বপ্রথম উঠে আসে আফগানিস্তানে ফেলে আসা সংস্কৃতির কথা। শুরুর দিকে কাবুলিওয়ালারা যখন কলকাতাতে আসতে শুরু করেছিলেন তখন তাঁরা নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বহন করার চেষ্টা করতেন, যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মধ্য দিয়ে খানিকটা উপলব্ধি করা যায়। তাঁদের সাংস্কৃতিক এই পরিমণ্ডল আফগানিস্তান থেকেই মাতৃপ্রদত্ত আহরণ। তবে কলকাতার সংস্পর্শে আসার পর থেকে তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনে কিছুটা পরিবর্তন আসে। ফলে কাবুলিওয়ালদের মধ্যে মিশ্র-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটতে শুরু করে। এই মিশ্র-সংস্কৃতির ছাপ আরও গভীর হতে শুরু করে যখন থেকে কাবুলিওয়ালারা পাকাপাকিভাবে কলকাতাতে বসবাসের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বিশেষত যখন থেকে কাবুলিদের মধ্যে অনেকেই কলকাতায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা করতে শুরু করেন।

কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে এই মিশ্র-সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে তাঁদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ভাবধারা লক্ষ করা গিয়েছিল। যার প্রভাব এসে পড়েছিল কাবুলিওয়ালাদের উত্তর-প্রজন্মের উপরে। যাঁরা নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে বর্তমানে কলকাতায় আফগান ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পথে, শুধুমাত্র পারিবারিক কিছু নিয়ম-কানুন এবং আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া। কাজেই কাবুলিওয়ালারা কলকাতায় তাঁদের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে নিজেরা লালন-পালন করতে পারলেও, কলকাতার সামগ্রিক পরিমণ্ডলে বিশেষ কোনও ছাপ ফেলতে পারেননি, বরং কালের নিয়মে সামাজিক জীবনের বেশকিছু নিয়ম-রীতি বর্জন করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও নিজেদের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার এই অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে কাবুলিওয়ালারা তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়িঘর, খাওয়া-দাওয়া, আসবাবপত্র, ভাষা ইত্যাদিতে এখনও আফগান ছাপ রেখে চলেছেন, যা

তাঁদের পুরানো ঐতিহ্যকে এখনও বহন করে। এর ফলস্বরূপ এঁরা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যতটা আফগান পরিচয়ে পরিচিতি পেয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি 'কাবুলিওয়ালা' পরিচয়ে শহর কলকাতার নাগরিক জীবনে ছাপ রেখে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রহমত নামের কাবুলিওয়ালার মধ্যে আফগান সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ফুটে ওঠে, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই রহমতের মধ্যে দিয়ে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। রহমত কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন জীবিকা নির্বাহের তাগিদে যা 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে বারবার ফুটে ওঠে। বরাবরই কাবুলিওয়ালাদের জীবন নিয়ে কলকাতার সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা আকর্ষণ চিরকাল রয়ে গেছে। আবার একইভাবে কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে একাধিক প্রশ্নও থেকে গেছে। তবে একথা ঠিক কলকাতাতে দীর্ঘদিন বসবাস করার সুবাদে কলকাতার সাধারণ মানুষের সঙ্গে এঁদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কারণ কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে আফগানরা অভিযোজন করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আফগান ব্যবসায়ী দাদগুল খান এবং ইউসুফ খান (কলকাতায় বসবাসকারী) যথার্থই বলেছেন যে 'ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির চেয়ে কলকাতা আমাদের কাছে অনেকটা বেশি নিশ্চিন্ত বলে মনে হয়, এখানে আমাদের যথেষ্ট নিরাপত্তা রয়েছে। তাই কলকাতাতে বসবাস করতে আমাদের কোনও অসুবিধা হয় না।'[২] তাঁরা আরও বলেন- 'কলকাতার মানুষের মধ্যে রয়েছে অন্যরকমের মহানুভবতা, এখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ আমাদের যেমন সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছেন, তেমনি আমাদের নিজেদের সংস্কৃতিকে লালন-পালন করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই কলকাতার সাধারণ মানুষের সঙ্গে একত্রে বসবাস করার ক্ষেত্রে তেমন কোনও সমস্যা হয় না। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকা-পয়সা এবং লেনদেন ঘটিত যে সমস্ত ছোটোখাটো সমস্যা দেখা দেয় পুলিশ প্রশাসনের মধ্যস্থতায় রফা হয়ে যায়। ব্যক্তিগত কোনও আক্রোশের মুখে পড়তে হয় না।' অধিকাংশ কাবুলিওয়ালারা মনে করেন কলকাতা থাকার মতো জায়গা দিয়েছে, এখানে বেঁচে থাকা এবং জীবিকা নির্বাহ করার পথও রয়েছে, তাই কলকাতার মতো জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও এঁরা যেতে চান না। মি. আমির খান সাহেবের কথায় জানা যায়, কাশিপুর

এলাকা সবচেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে কাবুলিওয়ালাদেরকে। একসময় কাশিপুর অঞ্চলে আফগানদের অবাধ বিচরণ ছিল।[৩] কাবুলিওয়ালাদের ফেলে যাওয়া ভাঙা ঘরের ভগ্নাংশ বর্তমানে কাশিপুর অঞ্চলে গেলে চোখে পড়ে।

৫.২.১. কাবুলিওয়ালাদের পরিবার ও পারিবারিক সংস্কৃতি

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে পারিবারিক সংস্কৃতি এবং পরিবার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালাদের আগমনের একেবারে শুরুর দিকে তাঁরা দলবদ্ধভাবে কলকাতাতে আসতেন শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা নির্বাহের কারণে। বছরের নিদিষ্ট সময়ে তাঁরা বাণিজ্যিক পসড়া সাজিয়ে কলকাতার দিকে অগ্রসর হতেন এবং নিদিষ্ট সময়ে আবার দেশে ফিরে যেতেন। যেমনটি আমরা 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রহমতকে দেখতে পেয়েছি। তবে বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে কাবুলিওয়ালাদের জীবনে বেশ কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই সময় থেকে কাবুলিওয়ালাদের একটা বড় অংশ যাঁরা কলকাতায় পাকাপাকিভাবে বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেন। পূর্বের মতো প্রতি বছর তাঁরা আফগানিস্তানে ফিরতে চাইতেন না, বরং আফগানিস্তান থেকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কলকাতাতে নিয়ে আসার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। এর ফলে কলকাতাতে কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এরই সঙ্গে বাড়তে থাকে স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিবারের সংখ্যা, যার ফলশ্রুতি কলকাতায় আফগান জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবারের ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করে।[৪]

বিশ শতকের শুরুতেই কলকাতার বুকে আফগানদের পারিবারিক জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, সেখানে তাঁরা গোষ্ঠীবদ্ধ বা দলবদ্ধভাবে একসঙ্গে অনেকেই বসবাস করতেন। তবে সময়ের অগ্রগতিতে একই পরিবারের একাধিক সদস্য যখন কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়েছেন, তখন তাঁরা আগের মতো দলবদ্ধভাবে বসবাস না করে, পরিবারের নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে শুরু করেন এবং তখনও পর্যন্ত কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পারিবারিক জীবনের তেমন কোনও প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় না। কারণ তখনও পর্যন্ত আফগানিস্তান থেকে কাবুলিওয়ালারা নিজেদের পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে

নিয়ে আসতে পারতেন না।[৫] কাজেই আগমনের শুরুর দিকে পারিবারিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র সে ভাবে প্রকাশ পেত না।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে একটা অংশ আফগানিস্তানে ফিরে না গিয়ে কলকাতাতে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন। কারণ এঁদের মধ্যে অনেকেই কলকাতায় বিবাহের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত করেন।[৬] কাজেই কলকাতার উপকণ্ঠে তাঁরা নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যায় এবং ক্রমশ কলকাতার সঙ্গে নিজেদেরকে একাত্ম করার চেষ্টা চালিয়ে যান। যদিও বিবাহ পরবর্তী সময়ে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই স্ত্রী-পরিজনদের নিয়ে আফগানিস্তানে ফিরে গেলেও, বেশিরভাগ অংশ থেকে গেছেন কলকাতায়, যাঁরা কখনই আর আফগানিস্তানে ফিরে যাননি। তাঁরা কলকাতার সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে পারিবারিক জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন।[৭] কাজেই কলকাতার মধ্যে এমন অনেক কাবুলিওয়ালাদের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা নিজেরা কখনই আফগানিস্তানকে চোখেই দেখেননি, কারণ তাঁদের জন্ম থেকে শুরু করে বড় হওয়া প্রত্যেকটি পর্যায়ের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে কলকাতা।[৮]

সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা 'দেশে বিদেশে'[৯] এবং সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ'[১০] গ্রন্থ সহ একাধিক উপাদান থেকে আফগানিস্তানের সমাজ জীবন এবং পারিবারিক জীবনের খণ্ড খণ্ড কিছু জীবনচিত্র উঠে আসে। যা থেকে অনুমান করা যায় আফগানিস্তানের সামাজিক জীবনের সঙ্গে কলকাতার তথাকথিত সমাজ জীবন কতটা ভিন্নাত্মক। আসলে কোনও অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মানুষ যখন দেশান্তরিত হয়ে অন্যদেশে নতুন করে নিজেদের জীবন শুরু করেন, তখন অনেকটা পালটে যায় তাঁদের জীবন যাপনের ধরণ। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস লক্ষ করা গিয়েছিল। কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য তাঁরা অনেকটা বদলে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন নিজেদেরকে। এমনকি প্রত্যেক মুহূর্তে অভিযোজনের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা করে গেছেন। তবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কাবুলিওয়ালাদের পরিবারগুলি মিশ্র-সংস্কৃতির সংমিশ্রণে

সংগঠিত হয়েছিল। ফলে তাঁদের পারিবারিক চেতনা ও সংস্কারগুলিতে যে একেবারেই আফগান সংস্কৃতি ছিল না সে কথা বলা চলে না।

কলকাতাতে বসবাসরত আফগান কাবুলিওয়ালাদের পারিবারিক জীবনের উপরে আলোকপাত করলে দেখা যায়। পরিবারগুলি সাধারণত ছোট পরিবার। স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা এবং সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে গঠিত ছোট্ট পরিবারগুলি দেখেই কলকাতার পরিমণ্ডলের ছাপ পরিস্ফুট হয়। আফগান পরিবারগুলিতে পরিবারের প্রধান কর্তা পুরুষ, তিনিই সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালন করেন। আফগান সমাজে মহিলারা সাধারণত গৃহকর্ত্রী হিসাবেই রয়ে গেছেন, কাজেই গৃহের অন্তরমহলে তাঁরা বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে থাকেন। সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে আফগান মহিলাদের মধ্যে প্রথমদিকে সচেতনতা না থাকার কারণে একাধিক সন্তানের জন্ম দিতেন। পরবর্তীকালে ভারত সরকারের জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সচেতনা বৃদ্ধির ফলে আফগানদের মধ্যে এই প্রবণতা কমে আসে। যেমনটা আমরা কলকাতার চিনা জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পাই। এছাড়া আফগান পরিবারগুলিতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন থাকার ফলে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানের জন্ম অধিক কাম্য বলে তাঁরা অনেকেই মনে করেন। ফলে কাবুলিওয়ালাদের মানসিকতার মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া কলকাতার কাবুলিওয়ালারা সকলেই প্রায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে ইসলামি নিয়ম-কানুন মেনে পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলি পালন করে থাকেন।[১১]

তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আফগান কাবুলিওয়ালাদের পারিবারিক জীবনে বেশ কিছুটা পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল। পূর্বের ন্যায় আফগানিস্তানের গোঁড়া সাংস্কৃতিক ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত করেছিলেন। ফলে পুরানো দিনের একাধিক নিয়ম-কানুন এবং এঁদের মধ্যে চলে আসা কুসংস্কারের অন্ধত্ব ঘুচে গিয়ে শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকেন। ফলে মাদ্রাসা, মক্তব, স্কুলের মাধ্যমে প্রাথামিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি শৈশবে পরিবারের কাছ থেকে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করেন, এক্ষেত্রে আফগান মায়েরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া কাবুলিওয়ালাদের কিছু কিছু পরিবারে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার ফলে তাঁরা পেশা নির্বাচনে অনেকটা আধুনিক হয়ে উঠেছে। আফগান পরিবারের মহিলাদের মধ্যে

পর্দা প্রথার প্রচলন থাকার কারণে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসার প্রবণতা খুব একটা দেখা যায় না।[১২]

কাবুলিওয়ালাদের পারিবারিক জীবনের অঙ্গ হিসাবে অবসর বিনোদনের বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে এসেছে। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা প্রাত্যহিক জীবনে তাঁদের নিত্য কর্মক্ষেত্র গুলি যাওয়ার পূর্বে নিজেদের জনগোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে কলকাতার জিশান, নিজাম, সাবিরের মতো হোটেলগুলিতে সকালের নাস্তা করেন। তারপর যে যার মতো কাজে বেরিয়ে যান, বিকালে ফিরে নিজেদের মধ্যে আড্ডাতে মেতে থাকেন। আবার কখনও কখনও কয়েকজন মিলে কাবুলিওয়াদের 'খানকোঠি' গুলিতে আড্ডাস্থল গড়ে তোলেন।[১৩] সেখানেই নিজেদের জনগোষ্ঠীর মানুষজনের সঙ্গে কেরাম বোর্ড খেলেন, চা পান করেন, গল্পগুজব করেন, অনেকেই আবার আফগানিস্তানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়ে নিয়োমিত আলাপ-আলোচনা করে থাকেন। ছুটির দিনগুলিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের একাংশ কলকাতার ময়দানে পরিবারের শিশুদের নিয়ে খেলাধূলা করতে আসেন। কাবুলিওয়ালাদের পরিবারগুলি এইভাবে কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে নিজেদের একত্রিত করার ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে কাবুলিওয়ালাদের পরিবারগুলির সঙ্গে কলকাতার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তেমন মেলামেশা করতে দেখা যায় না। এঁরা সাধারণত নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ জীবন-যাপন করার চেষ্টা করেন। তবে মাঝে মধ্যে কলকাতার ইরানি জনগোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়।[১৪]

কলকাতার আফগান পরিবারগুলিতে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা কলকাতা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কাবুলিওয়াদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক থেকে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন। ফলে একদিকে যেমন অভিন্ন প্রদেশের কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি নানান রকমের সুবিধা-অসুবিধায় একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। অনেক সময় আবার কলকাতাতে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিলে আত্মীয়তার সূত্র ধরে ভারতের অন্য প্রদেশে নতুন কাজ খোঁজার চেষ্টা করেন। তবে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে যাঁরা কলকাতাতেই শৈশব জীবন কাটিয়েছেন এবং পরপর কয়েক প্রজন্ম এখানেই জীবন অতিবাহিত করেছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়,

তাঁরা আফগানিস্তানে আর কখনই ফিরতে চান না কারণ তাঁরা অনেকেই আফগানিস্তানকে কোনদিন চোখেই দেখেননি। স্বাভাবিকভাবে তাঁদের দেশের প্রতি তেমন কোনও টান নেই বললেই চলে। মি. আমির খান বলেন- "আমি নিজে কলকাতায় জন্মেছি, এখানেই আমার পারিবারিক জীবনের সূচনা হয়েছে, আমার বাবা এবং চাচারা আফগানিস্তান থেকে এদেশে এসেছিলেন আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে। বর্তমানে আমার দুটি সন্তান যঁদের জন্ম এখানেই। তবে একথাও ঠিক আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিল যাঁরা অনেকেই কলকাতার সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে দেশে ফিরে গেছেন। তবে আমার পরিবার কলকাতাকে ভালোবেসে এখানেই থেকে গেছে। কলকাতার কাশিপুর অঞ্চল আমাদের আসল ঠিকানা। এখানেই আমাদের শৈশব থেকে কৈশরের বেড়ে ওঠা দিনগুলি কেটেছে। তিনি আরও বলেন আল্লাহ'র (ইষ্ট দেবতা) কাছে দোয়া করি কলকাতায় যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাতে পারি।"[১৫]

৫.২.২. কাবুলিওয়ালাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন ও সাজসজ্জা

কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আফগান কাবুলিওয়ালাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়কে বিশেষভাবে বহন করে। সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ হিসাবে তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য, প্রসাধনের ব্যবহার এবং তাঁদের সাজসজ্জার ইতিবৃত্তের মধ্যে আফগান সত্তার পরিচয় মেলে। তাই কাবুলিওয়ালাদের কথা মনে এলে প্রথমেই ফুটে ওঠে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের রহমতের প্রতিচ্ছবি।[১৬] রহমত নামের কাবুলিওয়ালা যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন কবিগুরু রহমতের পরিহিত পোশাকের সুন্দর বিবরণ দিয়েছিলেন। যা দেখে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ায়াদের পোশাক সংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণিত রহমতের সাজসজ্জার সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালাদের পোশাক পরিচ্ছদের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, তাতে আফগানিস্তানের প্রচলিত পোশাকের ঐতিহ্যকে বহন করে।

আফগানিস্তান দেশটিতে যেহেতু বিভিন্ন উপজাতির বসবাস, তাই তাঁদের পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তবে আফগানিস্তানের সমস্ত উপজাতির

পোশাক বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, তা হল ঢিলেঢোলা সালোয়ার পাজামা। বাংলাতে যেটা পাঞ্জাবি-পায়জামা হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই ধরনের পোশাক আফগানিস্তানে খুবই জনপ্রিয়। তাই ঔপনিবেশিক আমলে যে সমস্ত কাবুলিওয়ালা কলকাতায় এসেছিলেন তঁদের সকলের পরনে এই সালোয়ার-পায়জামা পরিধানের প্রবণতা লক্ষ করা যেত। যদিও আফগানদের এই পোশাক বাঙালির পাজামা-পাঞ্জাবির মতো একই রকমের নয়। আফগানদের পোশাক নির্মাণের মধ্যে নিজস্ব ঘরানা রয়েছে, যা বানানোর জন্য বেশ কয়েক মিটার কাপড়ের প্রয়োজন হয়। এছাড়া মাথায় পাগড়ি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, চোখে সুরমার ব্যবহার ছিল ব্রিটিশ আমলের কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পোশাক-পরিচ্ছদের অন্যতম পরিচিত অঙ্গ। কলকাতার রাস্তাঘাটে এই ধরনের পোশাক বেশে কাউকে দেখতে পেলেই ধরে নিতে অসুবিধে হত না এরা আফগান কাবুলিওয়ালা।

বিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ **১৯৩৯** সালে কলকাতার আফগান পুরুষদের পোশাক বলতে পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের ঢিলে কামিজ, এই ঢিলে 'সালোয়ার' ছিল তাঁদের অন্যতম প্রধান পছন্দের পোশাক। যা তাঁরা ঘরে-বাইরে উভয় ক্ষেত্রে পরিধান করতেন। তবে যখন বাইরের কাজে বেরোতেন তখনও তাঁরা এই ধরনের পোশাক ব্যবহার করতেন। আফগানদের পরিহিত এই সমস্ত সালোয়ার-কামিজগুলি ছিল একাধিক রঙের। তবে যখন কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় উৎসবে তাঁরা অংশগ্রহণ করতেন তখন তাঁদের পোশাকের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যেত। তখন শিরওয়ানি টাইপের উজ্জ্বল রঙের বস্ত্র পরিধান করতেন। এই শিরওয়ানি গুলির উপরে জরির কাজ করা মখমলের ওয়েষ্টকোর্ট পরিধানের সঙ্গে জরির কুল্লার পাগড়ি ছিল বাধ্যতামূলক। অনেকে আবার মাথায় টুপির ব্যবহার এবং কাঁধে বা মাথায় একপ্রকারের 'লুঙ্গি' বা 'শাল' জাতীয় পরিধান নিয়ে বেড়াতেন।[১৭] যেগুলি আড়ে-বহরে দেড় মিটার মাপের এক চৌক বস্ত্র খণ্ড, যা সাধারণত 'লুঙ্গি' নামেই পরিচিত। আফগানিস্তানে এই জাতীয় পোশাককে Patoo (লুঙ্গি বা শাল জাতীয় চাদর) নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।[১৮]

ঔপনিবেশিক আমলে আফগান কাবুলিওয়াদের সঙ্গে কোনও আফগান মহিলা কলকাতায় আসতেন না, যা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবে আফগান কাবুলিওয়ালারা

কলকাতায় সংসার জীবন শুরু করলে, তাঁদের পরিবারের মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ২০১৫ সালে নাজেস আফরোজ এবং মোসকা নজিবের কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ হলে সেখানে আফগান মহিলাদের পোশাক- পরিচ্ছদের বর্ণনা দিতে গিয়ে নাজেস সাহেব দেখিয়েছেন সুলতান খান নামের এক কাবুলিওয়ালা তাঁর মায়ের অর্ধশতাব্দী পুরানো একটি পোশাক দেখাচ্ছিলেন। এই ছবি থেকে কাবুলিওয়ালাদের পরিবারের মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়।[১৯] এমনিতে আফগানিস্তানের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা গৃহে 'ঘাগরা চেলির' মতো পোশাক পরিধান করেন, মাথায় কালো রঙের দোপাট্টা যা ঘোমটার মতো করে তাঁরা ব্যবহার করেন। মহিলারা যখন বাড়ির বাইরে যান সকলেই প্রায় 'বোরখা' বা 'হিজাব' পরিধান করেন।[২০] আফগান পরিবারের শিশুরা একটু বড় হওয়ার পরে সালোয়ার পাজামা পরার অভ্যেস করে ফেলেন। শিশুরা পারিবারিক পোশাক রীতিতে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তবে যাঁরা স্কুল এবং পাঠশালাতে পড়াশোনা করেন তাঁরা স্কুলের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করেন।[২১]

বিংশ শতকের প্রথম দিকে যে সমস্ত আফগানরা কলকাতাতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একটা অদ্ভুদ আফগান সংস্কৃতি বেঁচে ছিল। কলকাতার রাস্তায় দেখলেই এঁদের চেনা যেত। এঁদের চেহারা এবং পোশাক-পরিচ্ছেদের মধ্যে আফগান সংস্কৃতি চোখে পড়ত। মূলত ৮০ -র দশক পর্যন্ত পোশাক ছিল তাঁদের একমাত্র পরিচিতি। গায়ে সালোয়ার-কুর্তা, মাথায় টুপি বা পাগড়ি, মুখে দাড়ি, রুক্ষ চোখ ইত্যাদি। যেমনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মধ্যে দেখা যায়।[২২] তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পোশাক পরিধানের মধ্যে নানা রকমের বৈচিত্র্য আসতে শুরু করেছিল। তবে বর্তমান সময়ে আফগানদের পোশাকের ধরণ ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। কারণ কলকাতায় দীর্ঘদিন বসবাসের সুবাদে পোশাক-পরিচ্ছদ আর আগের মতো নেই। কলকাতার সাধারণ মানুষের মতো পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁরাও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এখন কলকাতার রাস্তায় হঠাৎ করে দেখলে আফগানদের চেনার উপায় নেয়।[২৩]

বিংশ শতকের আশির দশকের পর থেকে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের দেখা যাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল কলকাতাতে তাঁদের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসতে শুরু করেছিল।

এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ফিরে যাচ্ছিলেন নতুন কাজের খোঁজে, আবার অনেকেই নিজেদের দেশ আফগানিস্তানে ফিরে যাচ্ছিলেন। কলকাতাতে কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা কমে যাওয়ার পিছনে উপরের কারণগুলি যেমন অপরিহার্য, তেমনি কলকাতার রাস্তাঘাটে তঁদের দেখেও চিনতে না পারার কারণ ছিল। কারণ কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যগত পোশাক ধারণ করলেও সেই সংখ্যাটা ক্রমশ কমে আসছিল। কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে আফগানি পোশাক বহনের ক্ষেত্রে যেমন সমস্যা ছিল, তেমনি কর্মক্ষেত্রে সুবিধার কারণে কলকাতার পোশাক শৈলীতে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অফিস আদালত থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজকর্মের সুবিধার্থে আফগানি পোশাকের ব্যবহার কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে কমে আসতে শুরু করেছিল। এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছিল নবীন প্রজন্মের আফগানদের মধ্যে। কারণ কলকাতার নিত্য নৈমিত্তিক জীবন-জীবিকার সঙ্গে তালে তাল দিতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে বিকল্প পোশাক ভাবনা তৈরি হয়েছিল।

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সংগঠনের নেতা আমির খান সাহেবের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কলকাতায় কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে কলকাতার সাধারণ মানুষের মতো পোশাক পরিধান করেন। কারণ কর্মক্ষেত্রে কাজের সুবিধার কারণে কাবুলিওয়ারা এই ধরনের পোশাকে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অবশ্য তাঁরা যখন বাড়িতে এবং আড্ডার মেজাজে থাকেন তখন আফগানি সালোয়ার পরিধান করেন। সপ্তাহে ছুটির দিন বা রবিবারে দিনগুলিতে কলকাতার ময়দান প্রাঙ্গনে শয়ে শয়ে কাবুলিওয়াদের এই বেশে দেখা মেলে। যাঁরা সকলকেই প্রায় আফগানি সালোয়ার-পায়জামা পরিহিত অবস্থায় মাঠে চলে আসেন।[২৪] আফগান মহিলারা যাঁরা কলকাতাতে আছেন তাঁদের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে গেলে 'আল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের' সভানেত্রী ইয়াসমিন নিগার খান বলেন, আফগান মেয়েরা গৃহের অন্তরে মূলত ঢিলেঢলা সালোয়ার-কামিজ পরিধান করেন, মাথায় সর্বত্র একটি হিজাব জড়ানো থাকে। তবে ঘরের বাইরে অনেকেই বোরখা পরিধান করেন।[২৫]

কলকাতার কাবুলিওয়ালারা পোশাক বানানোর কাজে সাধারণত আফগানি দর্জিদের উপর নির্ভর করেন। তবে অনেক আফগান দর্জির অভাবে অ-বাঙালি দর্জিরা কাবুলিওয়াদের পোশাক বানানোর কাজ করে থাকেন। বড় বাজার, নিউমার্কেট, পার্ক সার্কাস, ইকবালপুর, জাকারিয়া স্ট্রিট সহ কলকাতার একাধিক অঞ্চলে আফগান কাবুলিওয়ালাদের পোশাক বানানোর কাজে দর্জির দোকানের খোঁজ পাওয়া যায়। জাকারিয়া স্ট্রিটের কাছাকাছি ময়দান লেনে 'হুসেন অ্যান্ড জেমস' নামক একটি দোকানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দোকানের মালিক আজম খান।[২৬] আজম খান আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের বাসিন্দা। তাঁর দোকানে আরও দুজন আফগান কর্মচারী কাজ করেন একজনের নাম দিন মহম্মদ দরবেশ অন্যজন শহিদুল্লাহ খান।[২৭] এড়াও আফগানিস্তানের পাকতিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা। দোকানের মালিক আজম খান কলকাতাতে বহুদিন ধরে কাপড়ের ব্যবসার কারবার করেন। এই দোকানে আফগান স্যুট ও সালোয়ারের কাপড় বিক্রির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পোশাক বানানোর কাজ করা হয়। কলকাতার মধ্যে এই দোকানটি আফগান পোশাক বানানোর কাজে বিখ্যাত হয়ে আছে, দোকানের মালিক খরিদ্দারের চাহিদা পুরোনের জন্যে আফগানি দক্ষ কারিগর নিয়োগ রেখেছেন। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে একটা অংশ এই দোকান থেকেই পোশাক বানিয়ে থাকেন। যেহেতু দোকানের দর্জিরা আফগানিস্তানের বাসিন্দা, সেহেতু আফগান পোশাক বানানোর ক্ষেত্রে এরা প্রচণ্ড দক্ষ। এছাড়া এই দোকানে আফগানিস্তান থেকে আসা রকমারি কাপড়ের সম্ভার আছে, কাজেই সারাবছর এখানে কাবুলিওয়ালাদের আনাগোনা লেগেই থাকে।[২৮] সুতরাং কলকাতাতে বসে আফগান কারিগরদের হাতে বানানো পোশাকের গুরুত্ব কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বের।

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ হিসাবে পোশাক-পরিচ্ছদের পাশাপাশি তাঁদের অন্যান্য সাজসজ্জার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। আফগান নারীদের মধ্যে এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। তবে শুধুই যে আফগান নারীর সাজসজ্জার তথ্য উঠে আসে তা নয়, একইসঙ্গে উঠে আসে কলকাতায় আফগান পণ্যের বাজারের প্রসঙ্গ। এই কথা জানা যায় আফগানিস্তানের 'মাজার-ই-শরিফ' থেকে আসা পির নাজের তুর্কমেন নামক এক আফগান গহনা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। ২০২০ সালে

কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে 'বাণিজ্য মেলা'য় (Trade Fair) তিনি অসংখ্য আফগানি গহনার পসড়া নিয়ে এসেছিলেন বিক্রির উদ্দেশ্য। এই মেলাতে সাধারণ বাঙালিদের সঙ্গে আফগান সমাজের মহিলাদের দেখা যায় কেনাকাটা করতে। পাঁচশো টাকা থেকে শুরু করে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যের আফগানি গহনা নিয়ে তুর্কমেন কলকাতা পাড়ি দিয়েছিলেন।[২৯]

এছাড়া পুর্বেই আলোচিত হয়েছে কলকাতার হ্যারিনসন স্ট্রিটে 'কাবুলিওয়ালী' (Kabuliwali) নামে একটি বিশেষ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কাবুল থেকে এসেছিলেন আফগান পণ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্য নিয়ে।[৩০] এই উদ্যোক্তাদের মধ্যে সমীর খান ছিলেন অন্যতম। যিনি আফগানিস্তানের কাবুলের বাসিন্দা, জাতিতে আফগানিস্তানের তাজিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ফেব্রুয়ারির শুরুতে কাবুল থেকে আফগানি পণ্যদ্রব্য নিয়ে কলকাতাতে এসেছিলেন। পরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই দলটি আফগান পণ্যের সমাহার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কলকাতাতে তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন পোশাক-পরিচ্ছদ, আফগানি গহনা, কার্পেট, শুকনোফল, এমনকি আফগানিস্তানের সুগন্ধিজাত দ্রব্য। যা ছিল তাঁদের আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। সমীর খানদের কাছে আফগানি পোশাকের যে সম্ভার ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল আফগানি পোশাকের সম্ভার। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যেই ছিল এই সম্ভার। এরা মূলত কলকাতার বুকে যে সমস্ত আফগান জনগোষ্ঠী বসবাস করছেন তাঁদের কাছে বিক্রি করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন।[৩১] পুরুষদের পোশাকের মধ্যে ছিল কাপড়ের উপরে ছোট ছোট কাঁচ বসানো জমকালো জ্যাকেট বা ওয়েস্ট কোর্ট, যা ছিল বিভিন্ন রংবেরঙের। মহিলাদের পোশাকের ক্ষেত্রে চেলি জাতীয় পোশাকের উপরে জরি ও কাঁচের কাজ করা পোশাক ছিল অন্যতম। গহনার মধ্যে অক্সিডাইসের (Oxidise) গহনার সম্ভার ছিল বেশি যেমন- হাতের চুড়ি, নাকছাবি (Nosepin), কোমরবন্ধনী, কানের দুল, গলার হার ইত্যাদি। এই গহনার চাহিদা শুধুমাত্র আফগান মহিলাদের সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতার মহিলাদের মধ্যেও। কাজেই তাঁরা অনুভব করেছিলেন কলকাতা যেহেতু কাবুলিওয়ালাদের সবচেয়ে পুরাতন পীঠস্থান, তাই আফগানি গহনার চাহিদা ও জনপ্রিয়তা কলকাতাতে রয়েছে। কাজেই এই ধরণের পণ্যদ্রব্য প্রদর্শনীর জন্য তাঁরা কলকাতাকে বেছে নিয়েছেন।[৩২]

সূত্র: আফগান নারীর পোশাক, কাবুলিওয়ালি প্রদর্শনী থেকে গবেষকের সংগ্রহীত, (কলকাতা, ২০.০২.২০২০)

সূত্র: আফগান গহনার সম্ভার, কাবুলিওয়ালি প্রদর্শনী থেকে গবেষকের সংগ্রহীত, (কলকাতা, ২০.০২.২০২০)

আফগান কাবুলিওয়ালাদের ব্যবহৃত প্রসাদনী দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে আফগান 'স্নো'-র কথা।[৩৩] এই আফগান স্নো সরাসরি কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, তবে আফগানদের কাছে এই প্রসাধনীর গুরুত্ব ছিল বিরাট। ১৯১৯ সালে ভারতে তৈরি এই প্রসাধনী ক্রিম ভারতে খুবই প্রচলিত ছিল। পণ্যটির নির্মাতা সংস্থার ম্যানেজার আরশাপ দালাল বলেন- শতাব্দী প্রাচীন প্রসাধনী পণ্যটি ছিল ভারতবর্ষের প্রথম সাজগোজের ক্রিম। এই ক্রিমের সঙ্গে আফগানিস্তানের শুচিশুভ্র সুরভি মাখা তুষারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিশ শতকের গোড়ায় রাজস্থানের ঝালোয়ার থেকে ইব্রাহিম সুলতানালি পাটানওয়াল নামের এক তরুণ এই আফগান স্নো বানানোর মধ্যে দিয়ে নিজের উদ্ভাবনী শক্তিকে তুলে ধরেছিলেন। সাবেক বিজ্ঞাপনে নারীর সৌন্দর্যের পবিত্রতম স্নিগ্ধতা, রোদে, ঝড়ে, ধুলোয় বর্ম হিসাবে পরিচিত এই স্নো। সংস্থার মালিকের কাছ থেকে শোনা যায় ভারতবর্ষে বিদেশি পণ্য বয়কটের দিনে এই আফগান 'স্নো'কে ছাড় দিয়েছিলেন গান্ধিজী।[৩৪] ভারতে আফগানি নাম নিয়ে প্রচলিত প্রসাধনীর জনপ্রিয়তা অনেক সময় মনে করে দেয় আফগান কাবুলিওয়ালাদের প্রসঙ্গ। কলকাতার যে সমস্ত কাবুলিওয়ালা আছেন তাঁদের কাছে এই

'আফগান স্নো' কথা জিজ্ঞেস করলে অনেকেই স্বীকার করেন, তাঁদের মায়েদের মুখে শুনেছেন এই আফগানি স্নো'র কথা।

৫.২.৩. কাবুলিওয়ালাদের খাদ্য সংস্কৃতি ও কলকাতায় আফগান খাবার

কলকাতার অভিবাসিত ও ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠী হিসাবে কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের যে সমস্ত চিত্র উঠে আসে, তাঁর মধ্যে তাঁদের খাদ্য সংস্কৃতির দিকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ কোনও জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসকে তুলে ধরতে গেলে তাঁদের খাদ্যাভ্যাসের উপরে গভীরভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন। কলকাতার কাবুলিওয়ালারা এমনই একটি জনগোষ্ঠী যাঁদের তিন প্রজন্মের বেশি বসবাস পশ্চিমবঙ্গে। তাই কাবুলিওয়ালারা কলকাতার মিশ্র-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পর থেকে তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। তবে এই পরিবর্তনশীলতার মধ্যে কাবুলিওয়ালারা তাঁদের খাদ্য সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের আফগান ঘরানাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা ভিন্ন দেশের, ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ধরে রাখা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তবে আফগানরা শুধুই যে নিজেদের খাদ্যাভাস ধরে রেখেছিলেন তা নয়, বরং আফগান খাদ্যের স্বাদ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আপামর কলকাতার খাদ্যপ্রেমী মানুষের মধ্যে। এরই ফলস্বরূপ কলকাতায় আফগান ঘরানার বিভিন্ন পদের জনপ্রিয়তা গড়গড়িয়ে বাড়তে থাকে। যার ফলস্বরূপ কলকাতার হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলিতে আফগান খাবার তৈরিতে জোয়ার আসতে থাকে।

কলকাতাতে বসবাসরত আফগান কাবুলিওয়ালাদের খাদ্যাভাসের সর্বপ্রথম ধারণা পাওয়া যায় আফগানিস্তান থেকে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যগুলির মধ্য দিয়ে। ঔপনিবেশক আমলে কাবুলিওয়ালারা যখন কলকাতাতে আসতে শুরু করেছিলেন তখন কাজু, কিশমিশ, হিং, আখরোট ছিল তাঁদের প্রধান বাণিজ্যিক পণ্য। এই সমস্ত শুকনো ফলের ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তাঁদের নিজেদের খাদ্যাভাসের ধারণা। আমাদের দেশে খাদ্যরীতির মধ্যে যেমন 'ভাত 'রুটি' প্রধান খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয়, আফগানদের মধ্যে তেমনই 'নান'-ই তাঁদের প্রধান খাদ্য। আফগান শরণার্থীরা পৃথিবীর যে দেশে গেছে, সেখানেই গজিয়ে উঠেছে এই নানের দোকান।[৩৫] আফগানিস্তানে আফগান সরকার এই 'নান' তৈরির জন্য তন্দুরওয়ালাদের আটা ও ময়দায় ভর্তুকি দিয়ে থাকেন এবং সরকার তদারকি করেন

নিয়মিত এই নানগুলি সঠিক দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে কিনা। নানগুলি আকারে এবং আয়তনে যথেষ্ট বড়, আফগানিস্তানে এই 'নান'-র জনপ্রিয়তা শীর্ষে থাকলেও তাওয়াই সেঁকা সাধারণ চাপাটির জনপ্রিয়তাও রয়েছে। এই নান এবং চাপাটির সঙ্গে আফগানদের প্রিয় খাদ্য মাংস। চর্বিবহুল দুম্বার মাংস আফগানদের প্রিয় খাবার।

কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যেও এই ধরনের খাবারের চাহিদা লক্ষ করা যায়। তাঁদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকাতে স্থান পায় নান, রুটি, পরোটার মতো খাবার। এরই সঙ্গে তালিকায় থাকে মাংস। এছাড়া বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে আফগান পরিবারগুলিতে বিভিন্ন ধরনের খাবারের আয়োজন হতে থাকে। এই সমস্ত খাবারের মধ্য অন্যতম ছিল পোলাও। আফগানি 'পোলাও' আফগান কাবুলিওয়ালাদের অন্যান্য খাবারের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় খাবার। এই পোলাওয়ের মধ্যে মাংসের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। এই পোলাও আবার স্থানভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন 'নারাঙ্গ' পোলাও আফগানিস্তানে সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার। এই পদটি বানানোর ক্ষেত্রে কমলালেবুর শুকনো খোশা গুড়ো করে তাতে মিষ্টি মিশিয়ে বানানো হয়।[৩৬] 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ' গ্রন্থে আফগানিস্তানের কাবুলিওয়ালাদের খাদ্যাভাসের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। যাঁর মধ্য দিয়ে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের খাদ্যরীতি সম্পর্কে অনেক তথ্য উঠে আসে। ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে আফগানদের অতিপ্রিয় খাবারগুলির মধ্যে ছিল দুম্বার মাংস অন্যতম। এই দুম্বার মাংস দিয়ে স্টুয়ের মতো বানিয়ে তাতে রুটি দিয়ে ভিজিয়ে আফগানরা খেয়ে থাকেন, যাকে 'সুরুয়া' বলা হয়ে থাকে।[৩৭] এই সুরুয়ার কথা জানা যায় সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থ থেকে। বর্তমানে দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের আফগান খাদ্যের সমাহার চোখে পড়ে। এই 'সুরুয়ার' প্রচলন এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটের দোকানগুলিতে হামেশায় পাওয়া যায়।[৩৮]

সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, আফগানিস্তানে সাধারণ গম, চিনি, গুড়, আলু, পেঁয়াজ, আর মাংসের আধিক্য তাঁদের খাদ্য তালিকাতে প্রাধান্য পায়। মাংস বলতে সাধারণ ভেড়ার মতো দেখতে একটি প্রজাতি যার নাম দুম্বা। এই দুম্বার মাংস আফগানিস্তানে সর্বাধিক ব্যবহৃত খাবারের মধ্যে পড়ে। আফগানরা দুম্বাকে কেটে তাঁর মাংসগুলিকে সরু সরু ফালি করে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখেন। মাংস ঝোলাবার জন্যে সকলের বাড়িতে আলাদা

করে ঘর রয়েছে। এই ঝোলানো মাংস তুষারের ঠান্ডা হাওয়াতে শুকোতে থাকে। তারপরে শীতকাল এলে সেই মাংস আফগানিস্তানে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। এই শুকনো মাংসকে আফগানিস্তানে 'লাদাই' বলে।[৩৯] কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নেতা আমির খান বলেন কলকাতাতে দুম্বার মাংস সবসময় মেলে না। যখন তাঁদের মধ্যে কোনও কাবুলিওয়ালা আফগানিস্তানে যান, তখন এই মাংস সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন এই মাংসের চাহিদা কলকাতার আফগানদের মধ্যে বিপুল।[৪০] তবে সারাবছর এই মাংস আফগানরা জোগাড় করতে পারেন না। কারণ এই মাংসের যোগান দেওয়া একদিকে যেমন ব্যয়বহুল, অন্যদিকে তেমনই কলকাতার মতো গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে প্রক্রিয়াজাত করার ক্ষেত্রে নানারকমের সমস্যা আছে।

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের খাদ্যাভাসের মধ্যে সর্বদা আফগানিস্তানের ছায়া লক্ষ করা যায়। তাছাড়া সুস্বাদু খাবার কাবুলিওয়ালাদের কাছে সবসময় প্রাধান্য পেয়েছে। আমিষ পদের ব্যবহার এঁদের খাদ্য তালিকাতে সবসময় প্রাধান্য পেয়ে থাকে। মাংসের কাবাব থেকে শুরু করে মাংসের অন্যান্য পদ আফগান কাবুলিওয়ালাদের খাদ্য বৈচিত্র্যে সবসময় ঠাঁয় পেয়েছে। একইসঙ্গে আফগান কাবুলিওয়ালাদের খাদ্য তালিকার মধ্যে দুধ, ঘি, মাখন, দইয়ের প্রাধান্য সবসময় লক্ষ করা যায়। অন্যান্য খাবারের মধ্যে বাদাম, পেস্তা, কিশমিশ, খুবানি, কমলালেবু, আঙুর, তরমুজ এঁদের খাদ্য তালিকার মধ্যে অপরিহার্য অংশ। এছাড়া কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে 'চা' পানের রীতি জনপ্রিয়। আফগান জনগোষ্ঠীদের বিষয়ে আলোচিত একাধিক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে আফগানদের 'চা' পিপাসুর বিষয়টি। কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যেও এই চা পানের রীতি পরিলক্ষিত হয়। সারাদিনে কাবুলিওয়ালারা বেশ কয়েকবার চা পান করে থাকেন।[৪১]

কলকাতার আফগান পরিবারগুলিতে খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি রীতির প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। এরা সাধারণত পরিবারের সকল সদস্যদের সঙ্গে একত্রে বসে খাওয়া-দাওয়া করে থাকেন। কার্পেট বিছানো মেঝেতে বসেই এরা আহার করে থাকেন। নাজেস আফরোজ এবং মোসকা নজিবের তথ্যচিত্রের মধ্যে আফগান কাবুলিওয়ালাদের খাদ্যরীতির কিছু ছবি উঠে আসে।[৪২] যেখানে দেখা গেছে এঁদের মধ্যে এঁটো-কাঁটার কোনও বালাই নেই। একটা বড় থালার মধ্যে খাবার নিয়ে দস্তরখানা পেতে একই থালাতে

সকলেই একইসঙ্গে মিলে খাওয়া-দাওয়া করেন। আফগানিস্তানের অনেকগুলি রীতি-নীতির মধ্যে অন্যতম হল একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করার রেওয়াজ। এঁদের মধ্যে ঝুটা জাতীয় কোনও রীতিনীতি নেই। আজও কলকাতার বুকে যে সমস্ত কাবুলিওয়ালারা আছেন তাঁদের খাদ্য শৈলীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কাবুলিরা সকালে কাজে যাওয়ার আগে দলবেঁধে সকালের নাস্তা করে কাজে বেরিয়ে পড়েন। কলকাতার সাবির, জিশান, নিজাম, আমিনিয়া ইত্যাদি হোটেলগুলিতে সকালের দিকে গেলে এঁদেরকে দলবদ্ধভাবে নাস্তা করার দৃশ্যে দেখা যায়।[৪৩] সন্ধ্যার দিকে আবার কাবুলিওয়ালারা খান কোঠিগুলি বা কলকাতার রেস্ট্রুরেন্টগুলিতে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, গল্প-গুজব করে থাকেন সঙ্গে আফগানি খাবার এবং চা পান করেন। রাতে বাড়িতে রুটি এবং নান জাতীয় খাবার খেয়ে থাকেন।

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের খাদ্য সংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে উঠে আসে কলকাতার বুকে আফগান খাবারের চাহিদার কথা। কলকাতার ভোজন রসিক বাঙালির মধ্যে আফগান খাবারের চাহিদা বিপুল। ফলে কলকাতার উপকণ্ঠে যে সমস্ত হোটেলগুলিতে কাবুলিওয়ালাদের নিত্য যাতায়াত রয়েছে, সেই সমস্ত হোটেলগুলিতে কাবুলিওয়ালাদের পছন্দমতো খাদ্যের চাহিদা পুরোনের জন্যে হোটেলের মালিকেরা সবসময় লক্ষ রাখেন।[৪৪] আবার একইভাবে কলকাতাতে এমন অনেক হোটেল রয়েছে যে হোটেলগুলি আফগান নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত না হলেও আফগান খাবারের যোগান তাঁরা সর্বদা রেখে দেন। যেখানে কলকাতার সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে কাবুলিওয়ালাদের নিত্য যাতায়াত লেগে থাকে। এই সমস্ত হোটেলগুলির মধ্যে সল্টলেকের ‘কাফিলা’, পার্ক সার্কাসের ‘কাবুল কলকাতা’, নিউটাউনে ‘কাবুলিওয়ালা’ রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৪৫] এই হোটেলগুলিতে বিরিয়ানি থেকে শুরু করে আফগান কাবাব, কান্দাহারি লাহান, মটন কিমা, আফগান চাঙ্গেজি, আফগান মুর্গান, বিরিয়ানির মতো খাবারের অবাধ দেখা মেলে। তবে প্রসঙ্গক্রমে আফগান খাবারের কথা উঠে আসলেই দিল্লির লাজপথ নগর এলাকার কথা প্রথমেই চলে আসে। কারণ এখানে প্রায় চল্লিশটি আফগানি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এখানে সারা বছর আফগান খাবার খাদ্য রসিক মানুষদের মুখে জল আনে। তাই

অনেকেই আবার দিল্লির এই লাজপথ নগরকে ‘মিনি কাবুল’ (Little Kabul) বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।[৪৬]

আফগান খাবারের চাহিদা দিনে দিনে কলকাতাতে যে ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাতে কলকাতার হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা ব্যবসার জগতে নিজেদেরকে ধরে রাখার জন্য তাঁদের হোটেলগুলিতে আফগান কর্মচারিদের নিয়োগ করেছেন। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে আফগান কাবুলিরা অনেকেই জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য কলকাতার হোটেলগুলিতে রান্নার কাজ বেছে নিয়েছিলেন। কাজেই আফগান রাঁধুনিদের কলকাতাতে জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করে আফগানি খাবার বানানোর কাজে। ফলে কলকাতাতে আফগান খাবারের জনপ্রিয়তার সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের পেশার জগতেও নতুন দিশা আসতে শুরু করে। কাজেই কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিট সহ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এমন অনেক দোকান রয়েছে যেখানে আফগান কাবুলিওয়ালাদের হাতেই তৈরি হচ্ছে আফগান খাবার। সুতরাং এই সমস্ত দোকানগুলিতে আফগান খাবারের স্বাদ মেটানোর জন্যে সবসময়য় খরিদ্দারের আগমন লেগেই থাকে। আবার এমন অনেক আফগান ব্যবসায়ী আছে, যাঁরা নিজেরাই কলকাতায় আফগান খাবারের দোকান স্থাপন করে ব্যবসা করছেন বহাল তবিয়েতে। ফলে আফগান খাদ্য সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে কলকাতার কাবুলিওয়ারাদের সংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন চিত্র উঠে আসে।

কলকাতায় আফগান হোটেল ও আফগান খাবারের মেনু

সূত্র:https://www.google.co.in/kabuliwala+restaurant+kolkata&oq=kabuliwala+restaurant+kolkata (কলকাতা, ০৫.১১.২০১৮)

৫.২.৪. কাবুলিওয়ালাদের গৃহ নির্মাণে আফগান সংস্কৃতি ও গৃহের অন্তরমহলের সাজসজ্জা

কলকাতার সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে যত আফগান কাবুলিওয়ালার বসবাস রয়েছে তাঁদের গৃহ নির্মাণ এবং বাড়িঘরের সজসজ্জার মধ্যে দিয়ে আফগান কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের একটা বড় দিক উঠে আসে। ঔপনিবেশিক আমলে যে সব কাবুলিওয়ালা কলকাতাতে এসেছিলেন তাঁদের স্থায়ী কোনও বাসস্থান ছিল না। কাজেই কলকাতা এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি অঞ্চলে এদের বসবাস ছিল। ১৯৩৯ সালের কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের নথিপত্র থেকে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কাবুলিওয়ালারা বাড়িভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন। চব্বিশ পরগণার কাঁকিনাড়া অঞ্চলে এক সময়ে কাবুলিওয়ালাদের বাসস্থান ছিল। এই কাঁকিনাড়া অঞ্চলে ‘ইছাক সরদার কুঠি’ নামের একটি বাড়ির কথা জানা যায়।[৪৭] এখানে কাবুলিওয়ালাদের একটা বড় অংশের বসবাস ছিল। এছাড়া কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ‘খান কোঠির’ উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে উত্তর কলকাতার কাশিপুর অঞ্চল ছাড়া মেটিয়াব্রুজ, ডায়মণ্ড হারবার, ধর্মতলা, শ্যামবাজার, বড়বাজার, পার্ক সার্কাস, ইকবালপুর, বালিগঞ্জ, আলিপুর, চাঁদনি চক ইত্যাদি অঞ্চলে কাবুলিওয়ালাদের বসতবাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়।[৪৮] কাবুলিওয়ালাদের গৃহগুলিকে সাধারণভাবে ‘খান কোঠি’, বা ‘খান মহল্লা’ নামে পরিচিত। এছাড়া সার্কাস অ্যাভিনিউতে করিম হোসেন লেনে, ফেয়ার্স লেন, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট সহ কলকাতার একাধিক অঞ্চলে কাবুলিওয়ালাদের ঘড়বাড়ির দেখা মেলে। সারা কলকাতাতে বর্তমানে কাবুলিওয়ালাদের প্রায় ১৫০ টির বেশী খানকোঠির সন্ধান পাওয়া যায়।[৪৯]

সূত্র: কলকাতার কাশিপুর অঞ্চলে কাবুলিওয়ালাদের খানকোঠির ধ্বংসাবশেষ, গবেষকের সংগ্রহীত, (কলকাতা, ২২.০৪.২০১৮)

কলকাতাতে যে বাড়ি গুলিতে কাবুলিওয়ালারা বসবাস করেন, সেগুলি আকার ও আকৃতি কলকাতার আর পাঁচটা সাধারণ ঘর বাড়ির মতো দেখতে নয়। কাবুলিওয়ালাদের বাড়িগুলির মধ্যে বেশকিছুটা বিশেষত্ব রয়েছে। গৃহ নির্মাণের এই বিশেষত্ব কাবুলিওয়ালাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। কলকাতাতে অবস্থিত কাবুলিওয়ালাদের বাড়িগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাড়ি গুলি উঁচু উঁচু ছাদের তৈরি সিলিং, ঘরগুলির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ অনেকটা সুদীর্ঘ। ঘরের মধ্যে তেমন কোনও আসবাবপত্র নেই, বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে মেঝে, মেঝেগুলিতে কার্পেটে মোড়া, পিঠে হেলান দেওয়ার জন্য আছে কুশন বালিশ। কলকাতার মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মেঝের উপরে দামি কার্পেটের ব্যবহার করে গৃহের অন্তরমহলের সৌন্দর্য বজায় রেখে চলেছে কাবুলিওয়ালারা। কাবুলিওয়ালাদের ঘরগুলিতে কোনও খাট-পালঙ্গ দেখা মেলে না, ঘরগুলি আয়াতনে অনেকটা বড় হওয়ার কারণে সকলেই একসঙ্গে মেঝের উপরে বসে খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, গল্প-গুজব করে থাকেন।[৫০]

মহাজনি কারবারের সুবাদে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের কাছেই নগদ টাকা রেখে দিতেন। কারণ সুদে টাকা খাটানোর জন্য যখন-তখন নগদ টাকার প্রয়োজন পড়ত। এছাড়া তখনকার দিনে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আধুনিক প্রযুক্তির অভাব ছিল। কাজেই নিজেদের কাছে নগদ টাকার জোগান রাখতে হত। তাই কাবুলিওয়ালারা প্রত্যেকেই নিজেদের ঘরে লকার রেখে দিতেন, এই সমস্ত লকারগুলিতে তাঁরা নগদ টাকা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক কাগজপত্র রেখে দিতেন। তাই কাবুলিওয়লাদের প্রত্যেকের ঘরে লোহার লকার ছিল অপরিহার্য। তবে অনেকেই আবার কাঠের তৈরি চারকোণা লকার ব্যবহার করতেন। সেখানে নিজেদের নাম লিখে ঘরের মধ্যে নিদিষ্ট স্থানে সাঁজিয়ে রাখতেন। কাঠের তৈরি এই বাক্সগুলি কাবুলিওয়ালাদের পূর্ব প্রজন্মের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে বর্তমান সময়ে কাবুলিওয়ালাদের পরিবারগুলিতে এই ধরনের আসবাব পত্রের আর দেখা মেলে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার ছাপ তাঁদের মধ্যেও আসতে শুরু করেছে। ফলে কলকাতার দু-একটি আফগান পরিবারে পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া পুরানো স্মৃতিগুলির দেখা মিললেও, বর্তমানে এই ঐতিহ্যের ক্ষয়িষ্ণু ভাবধারা ক্রমশ ধরা পড়তে শুরু করেছে, যা আগামী কয়েক বছরে হয়ত একেবারেই বিলীন হয়ে যাবে।

৫.২.৫ কাবুলিওয়ালাদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চা

খেলাধূলা এবং শরীরচর্চার বিষয়টি কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কাজেই বিনোদনের অঙ্গ হিসাবে কলকাতার আফগানদের খেলাধূলার বিষয়টির উপরে আলোকপাত করার প্রয়োজন। এমনিতেই আফগানিস্তান দেশটিতে বেশকিছু খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে আছে, যে খেলাগুলির কথা মনে পড়লেই সর্বপ্রথম আফগানিস্তানের কথা উঠে আসে। যেমন 'বুজখাসি' খেলা, এই খেলাটি আফগানিস্তানের অন্যান্য খেলার মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলা। আফগানিস্তানে এই খেলাকে 'লাটনা' খেলা নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ। এই 'বুজখাসি' বা 'লাটনা' খেলা সাধারণত কয়েকটি দলের ঘোড়াসওয়ার দলের মধ্যে সম্পাদিত হয়।[৫১] এছাড়া আফগান বালকদের মধ্যে ঘুড়ি কাটাকাটির খেলা খুবই জনপ্রিয় হয়ে আছে। এছাড়া সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানে ক্রিকেট এবং ফুটবলের মতো খেলাগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তবে দেশ ও কালভেদে আফগানদের খেলাধূলার মধ্যে একাধিক পরিবর্তন এসেছে। এমনকি দেশান্তরিত আফগানরা যখন বাধ্য অন্যদেশে আশ্রয় নিয়েছেন তখন বদলে গেছে তাঁদের খেলাধূলার গড়ন। যেমনটি আমরা কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি। যেমন 'বুজখাসি' খেলা আফগান জনগোষ্ঠীর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ক্রীড়া হওয়ার সত্ত্বেও, কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এই খেলা একেবারেই বেমানান। ফলে বাধ্য হয়ে কাবুলিওয়ালারা এই ধরনের খেলা থেকে নিজেদেরকে নির্লিপ্ত রেখেছেন। তবে কলকাতায় যেহেতু ক্রিকেট, ফুটবল, রাগবি, ভলিবলের মতো খেলাগুলির যথেষ্ট পরিসর রয়েছে। সেহেতু আফগান কাবুলিওয়ালারা এই ধরনের খেলাগুলির মধ্য দিয়ে নিজেদের বিনোদন নিবেদন করার ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে অভিন্ন দেশের অভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেও আফগান সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাবুলিওয়ালারা বেশকিছু মৌলিক খেলাধূলার মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন।

কাবুলিওয়ালাদের খেলাধূলা এবং শরীরচর্চার বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করলে উঠে আসে একাধিক তথ্য। যেমন- রবিবার অথবা যেকোনও ছুটির দিনে বা উৎসবের দিনগুলিতে কলকাতার ময়দান প্রাঙ্গনে কাবুলিওয়ালারা নিজেদের জনগোষ্ঠীর লোকজনের

সঙ্গে খেলাধূলাতে মেতে ওঠেন। সাধারাণত দুপুরের পর থেকে বিকেলের শুরুর দিকে কাবুলিরা দলে দলে ময়দান প্রাঙ্গণে চলে আসেন খেলাধূলা এবং শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে। রুক্ষ চেহারা, গৌড়বর্ণের মানুষগুলিকে দেখলেই বোঝা যাঁয় এরা বিদেশি জনগোষ্ঠীর মানুষ। ধর্মতলার ময়দান প্রাঙ্গণে বিভিন্ন বয়সি আফগান পাঠানদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পরিবারের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত কলকাতা ময়দানে চলে আসেন নিজেদের জনগোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে খেলাধূলা এবং গল্পগুজবের উদ্দেশ্যে। আফগান যুবকরা ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল সহ বিভিন্ন খেলাধূলার সঙ্গে অন্যান্য শরীরচর্চা করে থাকেন। অনেকেই আবার আফগানিস্তানের জাতীয় দলের পছন্দের ক্রিকেটার ও ফুটবলারদের নামের জার্সি পরিহিত অবস্থায় মাঠে চলে আসেন। এসবের মধ্য দিয়ে কলকাতার আফগানরা প্রমাণ করতে চান যে, তাঁরা আফগানিস্তান থেকে অনেক দূরে বছরের পর বছর বসবাস করলেও, আফগান সমর্থক হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। তাই ছুটির দিনগুলিতে কলকাতার ময়দান প্রাঙ্গণ এবং ভিক্টোরিয়ার আশেপাশে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের হামেশায় দেখতে পাওয়া যায়।

তবে আফগান কাবুলিওয়ালারা আফগানিস্তানের যে সমস্ত মৌলিক ক্রীড়াগুলির মধ্য দিয়ে কলকাতার বুকে আফগান সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 'আন্ডাকুষ্ঠী খেলা' (Egg Wrestling) এই খেলার মধ্য দিয়ে আফগানরা নিজেদের সংস্কৃতিকে কলকাতার বুকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন।[৫২] এই ধরনের খেলার নিয়ম একঝুড়ি করে 'সিদ্ধ' ডিম নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পাদিত হওয়া, এরপর উভয়পক্ষ একটা একটা করে ডিম নিয়ে একে অপরের ডিমের উপরে আলতো করে আঘাত করেন, যার ডিম প্রথমে ফেটে যায়, পরাজিত হন তিনিই। এইভাবে যতক্ষণ ঝুড়ির মধ্যে ডিম থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই খেলা চলে দু-পক্ষের মধ্যে। সোজা কথায় আমাদের এখানে যা 'ডিম ফাটানো' খেলা নামে প্রসিদ্ধ। কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে এই খেলার জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশি। কাবুলিওয়ালারা প্রতি বছর ঈদের দিনগুলিতে এই 'আন্ডাকুষ্ঠী' খেলাতে মেতে ওঠেন। এই ধরনের খেলার মধ্য দিয়ে

তাঁরা কলকাতায় আফগান সত্তার পরিচয় ধরে রেখেছেন। এছাড়া কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার বিপুল জনপ্রিয়তা আছে। নাজেস আফরোজ এবং মোসকা নজিবের তথ্যচিত্রে আফগান কাবুলিওয়ালাদের খেলাধূলা বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে দেখা গেছে কাবুলিওয়ালা দাদগুল খানের ছেলে কলকাতায় বড় হয়েছেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার একটি নামী ক্লাবে ক্রিকেট খেলার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ভবিষ্যতে তিনি ক্রিকেটার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[৫৩]

আফগানিস্তানের জাতীয় দলের ক্রিকেটার এবং ফুটবলাররা যখন আন্তর্জাতিক খেলাতে অংশগ্রহণ করেন, তখন কলকাতার ময়দানে কাবুলিওয়ালাদের উদ্যামতা চোখে পড়ে। তাঁরা নিজেদের দেশের সমর্থনে কলকাতার ময়দানে দলবেঁধে উপস্থিত হয়ে তা উদ্‌যাপন করেন। এছাড়া ফুটবল বিশ্বকাপের মতো বিশেষ মরশুমগুলিতে কলকাতার বাঙালিদের মধ্যে যেমন উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তেমনই আফগান কাবুলিওয়ালাদে মধ্যেও তাঁদের পছন্দের খেলোয়াড়দের নিয়ে উদ্যামতা লক্ষ করা যায়। তাঁরা নিজেদের প্রিয় দল এবং খেলোয়াড়দের সমর্থনে জার্সি পরনে ময়দানে খেলাধূলাতে নিজেরা মেতে ওঠেন। কলকাতার সাধারণ মানুষের মতো তাঁদের মধ্যেও এই চেনা উদ্যমতা চোখে পড়ে। একইভাবে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী কলকাতার স্টেডিয়ামগুলিতে যখন আফগানিস্তানের জাতীয় দল খেলাধূলাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আসেন, তখন সেই খেলা স্ব-চক্ষে উপভোগ করার জন্য কলকাতার আফগান জনগোষ্ঠীর সমর্থকদের একাংশ টিকিট ক্রয় করে মাঠে চলে আসেন। অতি সাম্প্রতিককালে কলকাতায় ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, এই খেলা চলাকালীন কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের একটা অংশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যাঁরা আফগানিস্তানের সমর্থনে গলা ফাটালে একদল ভারতীয় সমর্থক ছুঁটে গিয়ে তাঁদেরকে প্রহার করেন। তাঁদের অপরাধ নিজেদের দেশ আফগানিস্তানকে সমর্থন করা। ভারতীয় সমর্থকদের হাতে মার খেয়ে কাবুলিওয়ালারা হতবম্ব হয়ে যান।[৫৪]

আফগান কাবুলিওয়ালাদের ক্রীড়া নিয়ে যে উন্মাদনা ছিল তা আরও ভালোভাবে জানা যায় কাবুলিওয়ালাদের সংগঠনের নেত্রী ইয়াসমিন নিগার খানের স্বীকারোক্তি থেকে।[৫৫] ২০২১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার তরুন মহল ক্লাবের উদ্যোগে ভারত-আফগানিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাতৃত্বের উদ্‌যাপনের জন্য কলকাতায় এক দিবসীয় ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় দুই দেশের খোলোয়াড়দের নিয়ে। আফগান দলটিতে যে সমস্ত খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই কলকাতার আফগান বংশোদ্ভূত। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নেত্রী তথা 'অল ইন্ডিয়া জিরগা-ই-হিন্দে'র সভানেত্রী ইয়াসমিন নিগার খান সহ কলকাতার আফগান সমাজের বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। খেলা শুরুর প্রাগ মুহুর্তে দু-দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রতিযোগীতা শুরু হয়।[৫৬] সৌভ্রাতৃত্বের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারত-আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক নির্মাণে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ভূমিকার কথা যেমন উঠে আসে, তেমনই কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবির কথা উঠে আসে। একই সঙ্গে উঠে আসে কাবুলিওয়লাদের ক্রীড়াপ্রেমের নজির। এইভাবে কাবুলিওয়ালারা কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পড়েন ও নিজেদের ঐতিহ্যকে ধরে রখতে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে কলকাতার ময়দানে কাবুলিওয়ালারা সবাই যে খেলাধূলার উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন তা নয়, অনেকেই ছুটির দিনগুলোতে আসেন গল্পগুজব ও নিয়মিত শরীরচর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে। কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে যাঁরা একটু বয়সে বৃদ্ধ তাঁরাও ছুটির দিনগুলোতে ময়দানে আসেন একটু হাটাহাটি এবং নিজেদের জনগোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগে। অনেকেই আবার বিকালের দিকে জড়ো হন নিজেদের দেশের হাল-চালের খোঁজখবর ও আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে।

সূত্র: কলকাতার ময়দান প্রাঙ্গণে আফগান কাবুলিওয়ালারা ক্রীড়ারত, গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা, ০১.০১.২০২১)

৫.২.৬. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ভাষাগত সংস্কৃতি

কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের বহুবর্ণ দিকের মধ্যে তাঁদের ভাষাগত দিকটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতার উপকণ্ঠে দীর্ঘদিন বসবাস করার সুবাদে কলকাতার প্রচলিত ভাষার সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের একাত্মবোধ তৈরি হয়েছিল। তবে কাবুলিওয়ালাদের ভাষাগত সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে আফগানিস্তানের ভাষার বিষয়ে দু-একটি দিক পর্যালোচনা করার দরকার। আফগানিস্তানে জাতিগত জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের মতো প্রতিটি ভাষার এবং ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা নিয়েও মতভেদ আছে। কারণ আফগানিস্তানের একজনের 'ভাষা'-ই আবার অন্যজনের 'উপভাষা'। সি.আয়-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৪ সালে আফগানিস্তানে ফার্সী (দারি ভাষা) ভাষীর সংখ্যা ৫০ শতাংশ, পশতুভাষীর সংখ্যা ৩৫ শতাংশ, তুর্কিভাষী ১১ শতাংশ (উজবেক ও তুর্কমেন)

এবং বাকি ৪ শতাংশ দ্বিভাষিক।[৫৭] তবে আফগানিস্তানে প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 'ফার্সী' (দারি) ও পশতুভাষা। অধিক প্রচলিত ভাষা হিসাবে দারিকে আফগানিস্তানের 'লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা' (Lingua Franca) বলা হয়। দারি ও পশতু দুটিই সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃতি পেলেও সংবিধান পশতুকে রাষ্ট্রীয় ভাষা (National Langauge) হিসাবে ঘোষণা করেছে।[৫৮]

এই 'পাশতু' এবং 'দারি' ভাষা আফগানিস্তানে প্রচলিত থাকলেও অঞ্চলভেদে আঞ্চলিক, আবার কোথাও কোথাও আঞ্চলিক প্রভেদ আছে, আবার কোথাও আঞ্চলিক নামও রয়েছে। যেমন দক্ষিণে কান্দাহার অঞ্চলের পশতুর উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কোমল।[৫৯] তুলনায় আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এবং পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত পশতু অপেক্ষাকৃত কর্কশ। তাঁকে 'পুখতু' বলা হয়। তাঁদের জাতির নামেও তাঁর প্রতিফলন, যেমন পুশতু/ পুশতু ও পশতুন/ পুশতুন বনাম পুখতু ও পাখতুন। ভারতে যাঁদেরকে আমরা পাঠান বলি। অর্থাৎ ভারত সহ পশ্চিমবাংলায় আমরা যে সমস্ত আফগান পাঠানদের দেখি তাঁদের মূল ভাষা 'পাখতুন'। তাই ভারত সহ কলকাতার আফগানরা যখন নিজেদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কথাবার্তা বলেন, তখন 'পাখতুন' বা 'পুশতু' ভাষাতেই কথা বলেন।[৬০] এই ভাষাগুলি একাধিক নামে বিভক্ত হলেও ভাষাগুলি যে প্রায় একই তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে যাঁরা প্রথমদিকে কলকাতাতে এসেছিলেন তাঁদের ভাষাগত সমস্যা ছিল। কারণ তখন তাঁরা আফগানিস্তানের আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষাতে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলিরা হিন্দি ভাষায় সড়গড় হয়ে উঠেছিল। কলকাতার অবাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে দীর্ঘদিন বসবাস করার ফলে হিন্দি ভাষাকে আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন সহজে। পরবর্তীকালে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও জীবিকা নির্বাহের তাগিদে তাঁরা হিন্দি ভাষার ব্যবহারে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। কাবুলিওয়ালাদের ভাষা প্রসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় পথ-চল্‌তি[৬১] গল্পে বলেছেন, ট্রেনের মধ্যে এক কাবুলিওয়ালার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যিনি অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার পটুয়াখালি অঞ্চলের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। তিনি নিজের মাতৃভাষার মতোই 'বরিশাইল্যা' ভাষা বলতে পারেন (বরিশাল অঞ্চলের ভাষা)।

তবে কলকাতার ভাষা তাঁর আয়ত্ত হয়নি।[৬২] কাজেই বাংলা ভাষার সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের যোগাযোগ যে সীমাবদ্ধ, তা জানা যায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা থেকে। তবে কাবুলিরা যে হিন্দি ভাষাতে দক্ষ ছিলেন সে কথা উঠে আসে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য থেকে। আফগানিস্তানের যে সব প্রদেশ থেকে কাবুলিওয়ালারা কলকাতায় আসতেন সেখানে হিন্দিভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটেছিল অনেক আগে থেকেই। কারণ কাবুলিওয়ালাদের পূর্বপুরুষদের কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অনেক আগে থেকেই। কাজেই হিন্দি ভাষার বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহল ছিলেন। তাছাড়া কাবুলে হিন্দি ভাষার প্রবেশের ইতিহাস বহু পুরনো, কারণ একটা সময় কাবুলে হিন্দিগান ও সিনেমার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। বর্তমানে কলকাতাতে যত কাবুলিওয়ালার বসবাস আছে তাঁদের সকলেই প্রায় হিন্দি ভাষাতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য। এছাড়া কাবুলিদের মধ্যে একটা বড় অংশ উর্দু ভাষাতেও সমান স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই উর্দু লিখতে ও পড়তে জানেন। কলকাতায় এমন অনেক উর্দু মাধ্যম স্কুল আছে, সেখানে কাবুলিওয়ালাদের বর্তমান প্রজন্মের শিশুরা পড়াশোনা করেন। তবে এঁদের মধ্যে খুব সামান্য অংশ আরবি ভাষাতে স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করেন। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের হিন্দি ও উর্দুর মতো ভাষাগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকলেও, বাংলা ভাষার প্রচলন তাঁদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না, খুব অল্প কয়েকজন আছেন যাঁরা সাম্প্রতিককালে বাংলা খুব অল্প অল্প বলতে পারেন। তবে অনেকেই আছেন যাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে না পারলেও, বাংলা বুঝতে তাঁদের কোনও সমস্যা হয় না। কাজকর্ম চালানোর কাজে যতটুকু বাংলার প্রয়োজন হয়, ততটুকুই বোঝার চেষ্টা করেন। কাবুলিওয়ালাদের নেতা আমির খান সাহেব বলেন তিনি নিজেই পাশতু ভাষার পাশাপাশি হিন্দি, উর্দু ভাষতে যথেষ্ট সাবলীল।[৬৩] তবে নতুন প্রজন্মের কাবুলিওয়ালারা অনেকেই কলকাতার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ পাওয়ার ফলে পড়াশোনার সূত্র ধরে তাঁদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে ইংরেজি ভাষাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এঁরা নিজেদের পরিবারবর্গের সঙ্গে পশতু ভাষায় কথা বললেও, অফিস কাছারির কর্মজীবনে ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষার ব্যবহার করেন বহাল তবিয়তে। ফলে কলকাতার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষদের মতো কলকাতার

কাবুলিওয়ালাদের ভাষাগত সংস্কৃতির দিকটি উল্লেখযোগ্যভাবে এই আলোচনাতে প্রাধান্য পায়।

৫.২.৭. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিনোদন নিবেদন

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবনে প্রচলিত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এবং বিনোদনের দিকটি অত্যন্ত অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়। কারণ কোনও জনগোষ্ঠীর নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান এবং বিনোদনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সেই জনগোষ্ঠীর আসল সংস্কৃতি। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রকারের আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় পরবগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক উঠে আসে। বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে নাচ, গান, সিনেমা, খেলাধূলা, আড্ডা ইত্যাদি ছিল অন্যতম প্রধান মাধ্যম। তবে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলিকে কেন্দ্র করেও কাবুলিওয়ালাদের জীবনে বিনোদনের বিভিন্ন দিক উঠে আসে।

কলকাতার কাবুলিওয়ালারা অধিকাংশ যেহেতু হিন্দিভাষাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, যেহেতু অবসর নিবেদনের দিনগুলিতে তাঁরা অনেকেই ঘরে-বাইরে ভারতীয় হিন্দি সিনেমা ও হিন্দি ধারাবাহিক উপভোগ করেন। ভারতীয় হিন্দি সিনেমার সঙ্গে আফগানিস্তানের যোগাযোগ বহু দিনের। অমিতাভ বচ্চন অভিনীত সেই ‘খুদাগাওয়া’ সিনেমার সময় থেকেই এই সম্পর্কের সূচনা। এর পরে একাধিক ভারতীয় সিনেমাতে আফগানিস্তান প্রসঙ্গ বার বার এসে পড়েছে। এমনিতেই আফগানিস্তানে ভারতীয় টিভি, রেডিওতে সম্প্রচারিত হিন্দি ভাষার অনুষ্ঠানগুলির জনপ্রিয়তা প্রচুর। যে হিন্দি ধারাবাহিকগুলি ভারতবর্ষে অত্যন্ত জনপ্রিয়, সেই ধারাবাহিক গুলিই আফগানিস্তানে ‘দারি’ সংস্করণে অত্যধিক জনপ্রিয়। এছাড়া রেডিওতে ভারতীয় হিন্দি সিনেমার গান সবসময় লেগেই থাকে। অভিতাভ রায় তাঁর ‘কাবুলনামা’ গ্রন্থে বলেছেন আফগানিস্তানের কান্দাহার, কুন্দুজ, নিমরোজ, হেলমন্দ রেডিও স্টেশন থেকে ‘হরে রাম হরে রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রামে’র মতো গানগুলি নাকি প্রতিদিনি বেশ কয়েকবার শোনানো হয়। এছাড়া কাবুলে ‘হিন্দে উর্দু’ সিনেমা এবং সিনেমার গানের সিডির রমরমা চোখে পড়ার মতো। প্রসঙ্গত কাবুলের ‘দেহ্ আফগানা’

বা ‘সিদ্দিক-ই-উমান’ মার্কেটের ফুটপাথে চাদর বিছিয়ে দেদার বিকোচ্ছে মুম্বায় ফিল্ম এবং ফিল্মি গানের নকল সিডি।[৬৪]

সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না খোদ কাবুলে যখন ভারতীয় সংগীতের জনপ্রিয়তা এত বেশি, তখন কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে এসবের জনপ্রিয়তা কতটা ছিল। কলকাতার কাবুলিরা হিন্দি সিনেমার যেমন ভক্ত, তেমনি হিন্দি গানেরও ভক্ত। আমির খানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠে আসে কাবুলিওয়ালাদের সিনেমার প্রতি আকর্ষণের কথা। সিনেমার কথা বলতে গিয়ে আমির খান বারবার অমিতাভ বচ্চনের কথা বলছিলেন। অমিতাভের অভিনীত সিনেমার কথা বলছিলেন। আবার নিজেই গুনগুন করে গেয়ে চলেন ভারতীয় স্বর্ণ যুগের হিন্দি সিনেমার বিখ্যাত গানগুলি। এই প্রবণতা শুধু আমির খানের মধ্যেই ছিল না, আমির খানের মতো অসংখ্য কাবুলিওয়ালদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া কাবুলিওয়ালদের হিন্দি ধারাবাহিক ও খবরের চ্যানেলগুলির প্রতি তাঁদের নজর থাকে সবসময়। খবরের চ্যানেলগুলির মাধ্যমে কাবুলিওয়ালারা আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্তিতির খোঁজখবর রাখেন নিয়মিত। এছাড়া কাবুলিওয়ালাদের বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে খেলাধূলা ছিল অপরিহার্য অংশ। যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

কাবুলিওয়লাদের বিনোদন নিবেদনের মাধ্যম হিসাবে ‘গান’ যেমন অপরিহার্য অংশ ছিল, তেমনি ‘নাচ’ও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আফগানিস্তানে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাচের যে ঘরানা রয়েছে তাঁকে বলা হয় ‘আটান’।[৬৫] স্থান কাল ভেদের কারণে কখনও-সখনও নাচের ‘মুদ্রায়’ এবং ‘পদ-ছন্দের’ মধ্যে সামান্য পার্থক্য খুঁজে পাওয়া গেলেও, নিত্য পরিবেশনার ভঙ্গিতে কোনও ফারাক খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত তা সেই আদি অকৃত্রিম ‘আটান’। কাজেই কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের তিন-তিনটি প্রজন্ম কলকাতায় বসবাস করার পরেও তাঁদের নাচের মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসেনি। কলকাতাতে যখন কাবুলিওয়ালাদের নিজস্ব কোনও আচার- অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়ে থাকে তখন একটু মাঝবয়সী পাঠানদের মধ্যে আফগান ‘আটান’ নাচের দৃশ্য দেখা যায়।[৬৬] বিশেষত ঈদের দিনগুলিতে তাঁরা পরনে সালোয়ার-কামিজ, পায়ে লোহার নাল লাগানো ভারী বুটজুতো এবং মাথায় একমাথা বাবরি চুল দুলিয়ে আফগান পুরুষরা খোলা আকাশের নিচে নাচ শুরু করেন। বুটের দৃপ্ত

পদধ্বনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাততালি দিতে থাকেন। নাচের তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাঝে মাঝে ঝাকুনি দিয়ে মাথা নিচু করলেই কানের দু-পাশের বাবরি চুল সমস্ত মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলে। এই দৃশ্য ঈদের দিনগুলিতে কলকাতার ময়দান প্রাঙ্গণে গেলে দেখা যায়। কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কাবুলিরা এই ধরনের অভিনব নাচের মধ্যে দিয়ে তাঁদের ক্ষয়িষ্ণু আফগান সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছেন।[৬৭]

১৯৭০ সালের দিকে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে আরও একটি বিষয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থার তেমন কোনও সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণে কাবুলিওয়ালারা সবসময় দেশে ফিরিতে পারতেন না। একইভাবে কলকাতা থেকে সুদূর আফগানিস্তানে দূরাভাষের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। স্বাভাবিকভাবে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে নতুন কৌশলের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় তাঁরা 'ক্যাসেট রেকর্ডিং' প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। কাবুলিরা ক্যাসেটের মাধ্যমে কলকাতা থেকে নিজেদের কথা রেকর্ডিং করে আফগানিস্তানে তাঁদের পরিবারের কাছে পাঠাতেন। অনুরূপভাবে কাবুলিওয়ালারাদের পরিবার থেকেও একইভাবে ক্যাসেটের মাধ্যমে ভয়েস রেকর্ডিং কলকাতাতে পাঠাতেন। এইভাবে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা আফগানিস্তানে তাঁদের পরিবারবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন সারাবছর। কলকাতাত থেকে যখন কোনও কাবুলি দেশে ফিরতেন তাঁদের মাধ্যমেই এই ক্যাসেটগুলি পাঠানো হত। আমাদের এখানে যা অনেকটা চিঠি আদান প্রদানের মতো। আফগান পরিবারগুলি সারা বছর এই ক্যাসেট রেকর্ডিং আসার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে থাকতেন। অভিনব এই পদ্ধতি কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ' গ্রন্থে এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য পাওয়া যায়।[৬৮] এছাড়া কলকাতার কাবুলিদের সংগঠনের নেতা আমির খানের সঙ্গে কথা বলেও এই বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে এই প্রযুক্তি হারাতে বসেছে কারণ স্যোশাল নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি আসার ফলে কাবুলিওয়লাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে।

৫.২.৮. কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক সংগঠন ও লোককথা

কলকাতার নাগরিক জীবনের সঙ্গে আফগান কাবুলিওয়ালারা জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। এর ফলে তাঁরা কলকাতাতে বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে একাধিক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেন। এই উদ্যোগগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা সংগঠন স্থাপন করতে শুরু করেন। এছাড়া কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবনের উপরে লোককথার একটা প্রভাব সবসময় পরিলক্ষিত করা গিয়েছিল। এই লোককথার প্রভাব তঁদের ব্যক্তিজীবন থেকে সমাজ-জীবনের উপরে বিভিন্ন সময়ে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।

কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে এই ধরনের সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন কলকাতার আফগান নেতৃবৃন্দ। তাঁরা একদিকে যেমন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি নিজস্ব উদ্যোগে সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন। অনেক সময় রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে তাঁরা সাংস্কৃতিক কাজকর্মের পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমির খানের 'খোদই-খিদমদগরের' কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬৯] এই সংগঠনের মাধ্যমে আমির খান রাজনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। তিনি কলকাতার পাঠানদের একত্রিত করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন, বন্যা বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গে ত্রাণকার্যে সহযোগিতার মতো কার্যক্রমের সঙ্গে তাঁদের সংঠনকে যুক্ত করেছিলেন। একইভাবে কলকাতার পাখতুন জনগোষ্ঠীর সভানেত্রী ইয়াসমিন নিগার খানের অবদানের কথা উঠে আসে। তিনি নিজে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন 'Badsha Khan Memorial Women & Children Welfare Organisation' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবা মূলক সংস্থা স্থাপন করেছিলেন ২০১২ সালে।[৭০] এই সংস্থার মাধ্যমে তিনি কলকাতার আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের জন্য একগুচ্ছ সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।

এছাড়াও ইয়াসমিন কলকাতায় কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে নানা রকমের সামাজিক কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর এই ধরনের জনসেবামূলক কাজের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা তিনি কলকাতার পাঠানদের থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায়ের মধ্যে দিয়ে করে থাকেন। ইয়াসমিনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানা যায় তিনি নিজেকে এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখতে পেরে নিজেই গভীর তৃপ্তি অনুভব করেন।[৭১]

কাবুলিওয়ালাদের এই ধরনের সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল সেবাপ্রদান করা। তবে সবসময় শুধুই সেবা প্রদানের মধ্যে তাঁদের কর্মসূচি সীমাবদ্ধ ছিল না। এই ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে কলকাতার সঙ্গে কাবুলিওয়ালারা আরও গভীরভাবে মিশে যেতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা বোঝাতে চেয়েছিলেন কলকাতা তাঁদের বসবাসের জন্য যেমন জায়গা দিয়েছে, তেমনি তাঁরাও কলকাতার প্রতি কৃতজ্ঞ। কাজেই তাঁরা শুধুই নিজেদের কথা ভাবছেন তা নয়। কলকাতার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা এবং দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিতে চেয়েছেন, তাঁরা সবসময় কলকাতাকে বন্ধুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। কলকাতার অন্যান্য বিদেশি জনগোষ্ঠীর শহরের প্রতি যেমন কোনও দায়বদ্ধতা দেখা যায় না, কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রে তেমনটি পরিলক্ষিত হয় না।

কাবুলিওয়ালাদের জীবনে লোকশিক্ষা, লোকগাথার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হতে দেখা গেছে। এই প্রবণতা কয়েক দশক আগে পর্যন্ত কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে বেশি করে দেখা যেত। সাম্প্রতিক সময়ে যদিও আফগানদের মধ্যে এই প্রবণতা অনেকটা কমেছে।[৭২] আসলে একটা সময়ে আফগান সমাজ ছিল নিরক্ষর, ফলে অলৌকিকতা ও কুসংস্কার কলকাতার আফগান সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছিল। কাজেই বিপদে পড়লে বা কোনও অসুখের কবলে পড়লে ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, মাদুলির ব্যবহার, পির মুর্শিদের থেকে জল ও তেল নিয়ে চিকিৎসা ইত্যাদিতে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। বর্তমানে কাবুলিওয়ালারা এই প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত হতে পেরেছে। তবে এখনও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আফগানদের উত্তর পুরুষদের খোঁজ পাওয়া যায়, যারা মূলত এই সমস্ত ঝাড়ফুঁক ও তুকতাকের কাজের সঙ্গে নিযুক্ত আছেন। জানা যায় উত্তর চব্বিশ পরগণার জোয়ারিরা অঞ্চলে এমনই একটি আফগান পরিবারের কথা, যাঁরা মূলত এই লোক ওষুধের কাজের

সঙ্গে যুক্ত।[৭৩] তবে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে রেজ্জাক খানের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, আমাদের মধ্যে এই বিশ্বাসটুকু এখনও আছে, গাছ-গাছড়া, মাদুলি, তাবিজ, আংটির পাথরে এখনও অনেক কাবুলিওয়ালা বিশ্বাস রাখেন।[৭৪]

এছাড়া এমন অনেক কাবুলিওয়ালাদের খোঁজ পাওয়া যায় যাঁরা অনেক সময় আফগানিস্তানের বিভিন্ন ধরনের লোকগান এবং বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গানে মগ্ন থাকেন। যদিও কলকাতায় এই ধরনের কাবুলিওয়ালাদের সন্ধান পাওয়া একটু শক্ত। কারণ এই ধরনের কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা খুবই বিরল বললেই চলে।

৫.৩. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় জীবনের পরিচয়

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত একাধিক জনগোষ্ঠীর বসবাস কলকাতাতে। এই জনগোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্মীয় পরিচয় এবং ধর্মীয় চেতনা আছে। যাঁর মধ্যে দিয়ে তাঁদের ধর্মীয় জীবনের একাধিক দিক উঠে আসে। কাজেই কলকাতার অন্যতম বিদেশি জনগোষ্ঠী হিসাবে আফগান কাবুলিওয়ালারদের ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় জীবনে আফগানিস্তানের প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও, কলকাতার মতো শহরে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার দ্রুত চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের মতো ধর্মীয় জীবনেও মিশ্র-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হতে শুরু করে, যাঁর কারণ হিসাবে আফগানদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় চেতনা গড়ে ওঠে, সেই প্রভাব এসে পড়তে থাকে তাঁদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন চর্চাতে। ফলে তাঁদের ধর্মীয় আচার-আচরণ, বিশ্বাস, উপাসনা স্থল, ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদিতে মিশ্র সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। কাজেই কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় জীবন বৈচিত্র্যের মধ্যে অনেক সময় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপে ধরা পড়তে দেখা যায়।

কাজেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে সমকালীন সময় পর্যন্ত প্রায় তিন প্রজন্মের আফগানরা কলকাতার উপকণ্ঠে আফগানিস্তানের রক্ষণশীল ধর্মীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে কলকাতায় তাঁরা ধর্মীয় জীবনকে নিজেদের মতো লালন-পালন করে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন।

৫.৩.১. কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় বিশ্বাস

কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপরে আলোকপাত করার পূর্বেই বলে রাখা ভাল আফগানিস্তানের ধর্মীয় চিত্রটি ঠিক কেমন। আফগানিস্তানে প্রায় ৯৯% শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। বাকি ১% শতাংশ মানুষ অন্যান্য ধর্মের, যাদের মধ্যে শিখ এবং হিন্দু ধর্মের মানুষের সংখ্যা বেশি।[৭৫] আবার ৯৯% শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৮৪% শতাংশ সুন্নি মুসলিম এবং বাকি ১৫% শিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। সুতরাং এখান থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে আফগানিস্তানে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, জনজাতি, গোত্র ইত্যাদিতে যতই বিভক্ত থাকুক না কেন, ধর্মীয় বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। ইসলাম ধর্মই তাঁদের একমাত্র উপাস্য ধর্ম।[৭৬] কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রেও প্রায় এই একই জিনিস লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ সকলেই ইসালাম ধর্মে বিশ্বাসী। আফগানিস্তান থেকে যত কাবুলিওয়ালা কলকাতা আসেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ পাকতিয়া প্রদেশের পাখতুন জনগোষ্ঠীর মানুষ, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।[৭৭] এই পাখতিয়া প্রদেশে সুন্নি মুসলিমদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে সুন্নি মুসলিমদের সংখ্যা বেশি।

তবে আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে শিয়া-সুন্নির প্রভেদ থাকলেও এঁরা সকলেই ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী। আল্লাকে এরা শ্রেষ্ঠ উপাস্য হিসাবে বিশ্বাস করেন। ফলে এঁদের ধর্মীয় জীবন ইসলাম ধর্মের পাঁচ স্তম্ভের উপরে পরিচালিত হয়। রোজা, নামাজ, কলেমা, হজ এবং যাকাত এই নিয়মের উপরে এঁরা বিশ্বাস রাখেন। এছাড়া আফগানদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা ঘরে কোরান পাঠ করেন, এমন অনেক আফগান পরিবার আছে যাঁদের ছেলেমেয়েরা কলকাতার বিভিন্ন মাদ্রাসাগুলিতে কোরান পাঠ করেন।[৭৮] ইসলামি আদর্শে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে ইসলামিক আদর্শকে মেনে চলার চেষ্টা করে থাকেন। এঁরা সকলেই প্রায় নিজেদের ‘খান’ হিসাবে পরিচয় দিতেই পছন্দ করেন।[৭৯] কলকাতায় সালোয়ার-কামিজ পরিহিত আফগান পাঠানদের দেখলেই অনুমান করা যায় এঁরা ইসলামি আদব-কায়দা মেনে চলার চেষ্টা করেন।

তবে আফগান কাবুলিওয়াদের মধ্যে অধিকাংশ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হলেও, সমস্ত সম্প্রদায় আবার একই ধর্মের নয়। কারণ একই সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় আছে। যেমন হিলজাই সম্প্রদায়, এই সম্প্রদায়ে হিন্দু আছে আবার মুসলমানও আছে। এঁরা যখন নিজেদের গ্রামে বসবাস করেন তখন নিজেদের সুবিধার্থে হিন্দু এবং মুসলমান বলে পরিচিত হয়, কিন্তু বিদেশে সবাই হিলজায় বলেই নিজেদের পরিচয় দেয়। তাই আমাদের দেশে যত কাবুলিওয়ালা আছে তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু আছে, আমারা তাঁদের চিনতে পারি না। আমাদের কাছে এরা সবাই পাঠান বা মুসলমান।"[৮০] যদিও রমানাথ বিশ্বাসের এই উক্তির উপরে ভর করে আফগান পাঠানদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সারা ভারতে যতগুলি প্রদেশে আফগান পাঠানরা বসবাস করেন তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে এই ঘটনা প্রযোজ্য হলেও। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রে তা কতটা বাস্তব তা বিচার্যের বিষয়। তবে ভারতের একাধিক প্রদেশে আফগান শিখ ও হিন্দুদের যে বসবাস রয়েছে একথা সত্য। যাঁরা আফগানিস্তানে একাধিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছেন। তবে এঁরা অভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও নিজেদেরকে আফগান হিসাবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

৫.৩.২. কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান

কোনও জনগোষ্ঠীর জীবনে ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠান তাঁদের জীবনের অপরিহার্য অংশ। কারণ এই ধর্মীয় চেতনার মধ্য দিয়ে উঠে আসে তাঁদের ধর্মীয় জীবনের ইতিহাস। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রেও একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। আফগান কাবুলিওয়ালারা কলকাতায় বসাবাস করার সুবাদে তাঁদের ধর্মীয় জীবনে একাধিক রীতি-নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। একই সঙ্গে উঠে আসে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের নানা দিকের কথা। কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলি কলকাতার আর পাঁচটা মুসলিম সম্প্রদায়ের থেকে অভিন্ন নয়, তবে পার্থক্য রয়েছে অনেকটা। কলকাতার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে অবাঙালি মুসলিম পরিবারগুলির সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করার সুবাদে তাঁদের ধর্মীয় অভ্যাসের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। তবে এই পরিবর্তনের মধ্যেও আফগানিস্তানের ধর্মীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাঁদের ধর্মীয় ভাবধারার মধ্যে বেঁচে আছে আফগান ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এম.কে.এম সিদ্দিকি

তাঁরা ‘মুসলির অফ ক্যালকাটা’ গ্রন্থে কলকাতার মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিবরণ প্রদান করতে গিয়ে কলকাতার আফগানদের বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রমের কথা ব্যাখ্যা করেছেন।[৮১] একইসঙ্গে ‘ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কলকাতার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়’ গ্রন্থে মকবুল ইসলাম বর্ণনা করেছেন কলকাতার মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসবের বিষয়টি।[৮২] তিনি দেখিয়েছেন কলকাতার বসবাসরত প্রায় সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে তেমন কোনও মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপরে আলোকপাত করলে দেখা যাবে কাবুলিওয়ালারা সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় পরব পালন করে থাকেন ইসলাম ধর্মের আর্দশ মেনে নিয়ে। যেমন- ঈদ, রমজান, মহরম, মিরাজ শরিফ এবং সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার নামাজ পালন। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সম্মেলনে যোগদান এবং হজযাত্রার মতো ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করে থাকেন। এই সমস্ত পরবগুলিতে কাবুলিওয়ালারা নিজেদের পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে একত্রে উৎসব উদ্‌যাপন করেন। কাবুলিওয়ালাদের এই ধর্মীয় সংস্কৃতি শুধুমাত্র কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে। আফগানরা যেহেতু ইসলামের কঠোর আদর্শে বিশ্বাসী, সেহেতু ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি নিয়ম মতো পালন করার চেষ্টা করে থাকেন। কলকাতার ফেয়ার্স লেনের জান মহম্মদ খান এবং ইসমাইল খান নামক কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়। কলকাতার বুকে ধর্মীয় উৎসব পালন করার সময় আফগানিস্তানের গার্দেজ (Gardez) প্রদেশে তাঁদের পরিবারের কথা খুব মনে পড়ে, ইচ্ছে হয় ঈদের সময় বাড়ি ফেরার। কিন্তু কোনও উপায় নেই। এখান থেকেই উৎসবের দিনগুলিতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিবারের খোঁজখবর নিয়ে থাকি।[৮৩]

কলকাতা সহ সারা পৃথিবীতে ঈদ ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষদের সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসব পৃথিবীর সমগ্র মুসলিম জাতির মতো কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের কাছে অন্যতম আনন্দের দিন। বছরে দুটি ঈদ উদ্‌যাপিত হয় একটি ‘ঈদুল-ফিতর’ এবং অন্যটি ‘ঈদুল-আজহা’, ঈদুল-ফিতর হল প্রথম ঈদ, অর্থাৎ রমজান শেষ হওয়ার পরে আরবি ‘শওয়াল’ মাসের প্রথম দিকে এই ঈদ উৎযাপিত। অন্যটি হল ঈদুল-আজহা, এটি বছরের দ্বিতীয় ঈদ। এই ঈদটি আরবি ‘জ্বিলহজ’ মাসে অনুষ্ঠিত হয়।[৮৪] কাবুলিওয়ালাদের

মধ্যে এই ঈদকে কেন্দ্র করে উৎসব উদ্‌যাপন করতে দেখা যায়। তবে তাঁদের কাছে সারা পৃথিবীর মতো 'ঈদুল-আজহা' অপেক্ষা 'ঈদুল-ফিতরের' গুরুত্ব খানিকটা বেশি। কারণ একমাস রোজা রাখার (উপবাস) পরেই এই ঈদ উদ্‌যাপন হয়। স্বাভাবিকভাবে এই ঈদে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে একটা আনন্দের বাতাবারণ তৈরি হয়। তবে দুটি ঈদের সমান গুরুত্ব রয়েছে, কারণ ঈদ মানেই খুশীর উৎসব, আনন্দের উৎসব, মিলনের উৎসব। কাবুলিওয়ালারা এই ঈদের জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন। কারণ ঈদকে কেন্দ্র করে কলকাতার অভিবসিত জীবনে নানা সমস্যাগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে কাবুলিওয়ালারা অনন্দে মেতে উঠেন।

কলকাতার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষেরা যেমন ঈদকে উপলক্ষ্য করে যেমন নিত্য নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ কেনাকাটা করেন, কাবুলিওয়ালারা তেমনই ঈদের সময় নিজেদের পরিবারবর্গের জন্য নতুন পোশাক কেনাকাটা করে থাকেন। ঈদের সময় কলকাতাতে যে সমস্ত স্থানে আফগান দর্জিদের খোঁজ পাওয়া যায় সেখানে কাবুলিওয়ালাদের ভিড় লেগে থাকে নতুন সালোয়ার-কামিজ বানানোর উদ্দেশ্যে।[৮৫] আফগান পরিবারের মেয়েরাও ঈদের দিন নতুন জামাকাপড় পরিধান করে নানা রকমের খাবার বানানোর কাজে লেগে পড়েন। বিশেষত আফগান পরিবারগুলিতে ঈদ উপলক্ষ্যে বিরিয়ানি বানানোর রেওয়াজ আছে। পরিবারের পুরুষ এবং অল্পবয়সী শিশুরা রকমারি সালোয়ার-কামিজ, মাথায় টুপি এবং পাগড়ি, চোখে সুরমা, গায়ে আতর লাগিয়ে নামাজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। কলকাতার রেড রোড থেকে ময়দান প্রাঙ্গণে যে সমস্ত স্থানে ঈদের নামাজ হয়, সেখানেই তাঁরা প্রার্থনাতে সামিল হয়ে যান। সিদ্দিকি সাহেব তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, ঈদের দিনে কলকাতার রেড রোড প্রাঙ্গণে প্রায় চার হাজার কাবুলিওয়ালা নামাজ পড়তে আসেন। অনেকেই আবার কলকাতার যে সমস্ত এলাকায় বসবাস করেন, সেই এলাকার মসজিদ অথবা 'ঈদগাহ' প্রাঙ্গণে নামাজ পড়েন।[৮৬]

ঈদের দিনে কাবুলিরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ঈদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিনোদনে মেতে ওঠেন। কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই ঈদের দিনে কলকাতার ময়দান প্রাঙ্গণে মিলিত হন। এছাড়া ঈদের দিনে একাধিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে আফগানি নাচে মগ্ন হয়ে ওঠেন, এই নাচের মধ্যে দিয়ে কাবুলিওয়ালারা আফগান সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা

করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের আফগান, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাবুলিওয়ালারা একসঙ্গে মিলিত হন, উদ্দেশ্য একটাই নিজেদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিলন ঘটানো। তবে তৃতীয় প্রজন্মের আফগানরা ঈদের দিনে বিভিন্ন রকমের খেলাধূলার মধ্য দিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেন।

কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় জীবনে ঈদের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে 'রমজান'। ধর্মপ্রাণ আফগানরা রোজা রাখাকে নিজেদের ধর্মীয় জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসাবে মনে করেন। আফগানরা রোজার মাধ্যমে মানব জীবনের বিভিন্ন অপগুণকে নাশ করে আত্মশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির পথে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা করেন এই মাসে। সারা পৃথিবীর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মতো আফগানরা রমজান মাসে নিদিষ্ট নিয়ম পালন করার চেষ্টা করে থাকেন। রমজানের নিয়ম অনুসারে সারাদিন উপবাস থেকে ধর্মীয় নিয়ম পালন করা হয়। রমজানের নিয়ম অনুযায়ী সূর্যোদয়ের আগে 'সেহেরি' (রমজান মাসের ভোরের খাবার) খেয়ে রোজা রাখা শুরু করতে হয়, আবার সূর্যাস্তের পরে সারাদিনের উপবাস ভঙ্গ করে সন্ধ্যাবেলা 'ইফতার' (রমজান মাসে সন্ধ্যা বেলার খাবার) সম্পন্ন করতে হয়। কাবুলিওয়ালাদের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। রমজানের শুরু হয় চাঁদ দেখার মধ্য দিয়ে, আবার শেষ হয় একইভাবে। কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে রমজানের চাঁদ দেখতে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁদের মধ্যে উৎসবের আসল মেজাজ ধরা পড়ে।[৮৭] কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটে রমজান মাসে কাবুলিওয়ালাদের দোকানগুলিতে রকমারি খাবারের সমাহার চোখে পড়ে।

কলকাতার দেশীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মতো আফগানদের অনেকেই মহরম ও মিলাদ-উন্নবি পালন করে থাকেন। 'মহরম' হল হজরত ইমাম হোসেনের কারবালার প্রান্তরে মৃত্যুর দিনটিকে শোক জ্ঞাপনের মাধ্যমে স্মরণ করার দিন। এই মহরম পরব উপলক্ষ্যে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠী বিশেষত শিয়া মতালম্বীরা 'তাজিয়া' (ইমাম হোসেনের কবরের প্রতিকৃতি) এবং 'দুলদুল' (ইমাম হোসেনের ঘোড়া) নিয়ে মিছিল করেন। একই সঙ্গে এই যুদ্ধের ঘটনাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে লাঠিখেলা, তরবারী খেলা ইত্যাদি প্রদর্শিত হতে দেখা যায়।[৮৮] আবার মিলাদ-উন্নবি পালিত হয় হজরত মহম্মদের জন্মদিন পালনের উদ্দেশ্য নিয়ে। এছাড়া শব-ই-বরাত, মিরাজ শরীফ ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসবগুলি কলকাতার দেশি-বিদেশি উভয় মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর

মধ্যে পালিত হয়। আমির খানের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি তাঁদের মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে। কাবুলিওয়ালারা এই সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন করার চেষ্টা করে থাকেন। কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আরও একটি দিক বিশেষভাবে ধরা পড়ে। কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে একাংশ ধর্মীয় বিশ্বাসে পীর এবং মুর্শিদদের উপরে বিশেষভাবে আস্থা রাখেন। বিভিন্ন ধর্মীয় পরবগুলিতে এরা পীরদের দরগাগুলিতে শাল বা চাদর চড়ান। এই সমস্ত দরগাগুলিতে তাঁদের নিত্য যাওয়া আসা লেগে থাকে। আমির খান বলেন তাঁদের এই ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে পূর্বপুরুষের হাত ধরে। কাজেই এই সমস্ত ধর্মীয় স্থানগুলিতে পরবের দিন কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং দান করে থাকেন। এছাড়া কাবুলিওয়াদের মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এই অনুষ্ঠানগুলিতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের আফগানরা একসঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন প্রকারের আলাপ আলোচনা করে থাকেন।[৮৯] এইভাবে ধর্মীয় উৎসব পালনের মধ্যে দিয়েই কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক জীবনের একাধিক দিক উঠে আসে।

৫.৩.৩. কাবুলিওয়ালাদের প্রার্থনাস্থল এবং প্রার্থনা পদ্ধতি

কলকাতার কাবুলিওয়াদের ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রার্থনাস্থল এবং প্রার্থনা পদ্ধতি। কলকাতার কোনও নিদিষ্ট অঞ্চলে কাবুলিওয়ালাদের প্রার্থনাস্থলের খোঁজ পাওয়া যায় না। কারণ প্রথম থেকেই তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে না পারার কারণে কলকাতাতে প্রার্থনাস্থল গড়ে তুলতে পারেননি, এমনকি অনেকক্ষেত্রে কাবুলিওয়ালারা নিজেরাই তাঁর প্রয়াস অনুভব করেননি। কারণ ধর্মীয় নিয়ম-নীতি পালনের জন্য কলকাতাতে মসজিদের অভাব ছিল না। কাজেই কলকাতার অন্যান্য বিদেশি জনগোষ্ঠীগুলির কলকাতাতে যেমন নিজস্ব ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন, আফগান কাবুলিওয়ালারা তেমন কিছু স্থাপন করেননি। এঁরা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের মসজিদগুলিতে ধর্মীয় উপাসনার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে যাঁরা বেশি ধর্মপ্রাণ তারাই একমাত্র পাঁচবার নামাজ আদায় করেন এবং প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার নির্ধারিত সময়ে নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে

উপস্থিত হন। কাজেই কলকাতার মসজিদগুলিতে কাবুলিওয়ালাদের সর্বদাই দেখা মেলে। বিশেষত নাখোদা মসজিদ, রাজাবাজার বারী মসজিদ, কলুটোলা ছোট মসজিদ, লাল মসজিদ এবং পার্ক সার্কাসের আহমদিয়া মসজিদ সহ একাধিক স্থানে।[৯০]

কাবুলিওয়ালাদের প্রার্থনা পদ্ধতির সঙ্গে ইসলাম ধর্মের প্রার্থনা পদ্ধতির তেমন কোনও বৈসাদৃশ্য নেই। তবে এদের মধ্যে 'শিয়া' ও 'সুন্নি' মতালম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় রীতিনীতি ও পদ্ধতির মধ্যে বেশকিছু আলাদা আলাদা পদ্ধতি রয়েছে। এছাড়া ইসালাম ধর্ম অনুযায়ী আজানের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদের রওনা হয়ে যান। এছাড়া প্রতি ঈদের সময়ে কাবুলিদের মধ্যে অনেকেই নির্দিষ্টহারে ইসলামিক রীতি অনুযায়ী যাকাত প্রদান করেন। কলকাতাতে এমন অনেক ধর্মপ্রাণ আফগান কাবুলিওয়ালার বসবাস রয়েছে যাঁরা আর্থিকভাবে সচ্ছল। আবার আর্থিকভাবে সচ্ছলদের একাংশ জীবনে একবার হজের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে থাকেন।[৯১]

তবে আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে যতই উদ্দীপনা দেখা যাক না কেন। কলকাতাতে এমন অনেক কাবুলিওয়ালা আছেন যাঁদের ধর্মীয় বিষয়ে সঠিক ধ্যান-ধারণা থাকলেও, অনেকের ধর্মীয় শৃঙ্খলার সঙ্গে তাঁদের পেশার স্ব-বিরোধ রয়েছে। কারণ কাবুলিওয়ালাদের পেশাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান পেশা সুদের ব্যবসা, অথচ এই সুদের ব্যবসা ইসলামের পরিপন্থী, এমনকি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কাজেই কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই কঠোর ধর্মপ্রাণ হওয়ার সত্ত্বেও, সুদের ব্যবসার মতো পেশাকে বেছে নিয়েছেন। এই বিষয়ে কাবুলিওয়ালাদের কাছে জানতে চাইলে তাঁরা বলেন- 'রোটি রোজীর টানে সুদের ব্যবসা করতে হয়'। সুতারং বাবা-দাদাদের রেখে যাওয়া এই ব্যবসা থেকে কাবুলিওয়ালা এখনও নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি। কলকাতার আফগান সংগঠনের নেতা আমির খান বলেন 'সুদের ব্যবসার কারণে আফগানিস্তানের মানুষ তাঁদেরকে পছন্দ করেন না। অনেক সময় এই ব্যবসার কারণে তাঁদের নিজেদের দেশ থেকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত আসে। তাই কাবুলিওয়ালারা যখন দেশে ফেরেন তখন অনেকেই এই সুদের ব্যবসার কথা গোপন রাখেন।[৯২]

সংযোজনী: কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের কবরস্থান

কৃতজ্ঞতা স্বীকার- নাজেস আফরোজ এবং মোসকা নাজিব

সূত্র: https://www.bbc.com/bengali/news/2015/05/150524_ms_afghan_kabuliwala_kolkata

৫.৪. পর্যবেক্ষণ

পরিশেষে বলা যায় কলকাতায় দীর্ঘদিন বসবাস করার সুবাদে কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের একাধিক দিক উঠে আসে। আগমনের শুরুর দিকে কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কাবুলিওয়ালাদের পরিপন্থী ছিল না। ফলে শুরুর দিকে কলকাতায় মানিয়ে নিতে তাঁদের সমস্যা হয়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় তাঁরা অভিযোজনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই কাবুলিওয়ালাদের পারিবারিক সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, খাদ্য-সংস্কৃতি, খেলাধূলা, বিনোদন ইত্যাদিতে আফগান সংস্কৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করে চলেছেন। তবে কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মানিয়ে নেওয়ার জন্য কাবুলিওয়ালারা নিজেদের জীবনে বেশ কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসার চেষ্টাও করেছেন। কাজেই কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে মিশ্র-সংস্কৃতির ভাবধারা লক্ষ করা গেছে।

একইভাবে কাবুলিওয়ালাদের ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে ইসলামি রীতি-নীতি এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির বহু দিক উঠে আসে। যেমন ঈদের দিন সকলে একসঙ্গে ময়দানে মিলিত হওয়া, 'আন্ডাকুষ্ঠী' খেলায় মেতে ওঠা, মহরমের দিন ধর্মীয় রীতি মেনে আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন ইত্যাদি। এছাড়া ধর্মীয় প্রার্থনা স্থলের প্রসঙ্গে জানা যায়

কাবুলিওয়ালারা কলকাতাতে ধর্মীয়স্থান স্থাপন করতে না পারার কারণে কলকাতার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের মসজিদগুলিতে ধর্মীয় কার্য সম্পন্ন করেন এবং কাবুলিওয়ালাদের মৃত্যুর পরে কলকাতার কবর স্থানগুলিতে তাঁদেরকে চিরতরে শায়িত করা হয়।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. এ. কে. এম শাহনাওয়াজ এবং ফাতেমা হেরেন: *বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন,* (বাংলাদেশ, অবসর, ২০১৭), পৃ. ৪।

২. দাদগুল খান [৪৭, আফগান, কাপড়ের ব্যবসায়ী, মেটিয়াব্রুজ] এবং ইউসুফ খান [৪৮, মশলা ব্যবসায়ী, মেটিয়াব্রুজ]: *সাক্ষাৎকার*। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে (১৭.০৯.২১)

৩. আমির খান [৫৫, খোদাই-খিদমদগার, সভাপতি, কলকাতা]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৮.০৩.২০১৯)।

৪. IB File No: *236/39, Afghan National in Calcutta.*

৫. শেখ মকবুল ইসলাম*: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কলকাতার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়,* (সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৩), পৃ. ৩২।

৬. IB File No: *236/1939, Afghan National in Mednipore*, এছাড়া বিস্তারিত জানতে দেখুন- সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়: *কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ,* (কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৮) পৃ. ৪৪, শ্রী রমানাথ বিশ্বাস: *আফগানিস্থান,* (কলকাতা, কোরক, প্রথম সংস্করণ ১৯৪৩), পৃ.পৃ. ৯০-৯৫, পান্থজন: *কাবুলের পথে পথে,* (কলকাতা, আনন্দ, ২০০৯), পৃ.পৃ. ১৫৯-১৬১।

৭. আমির খান [৫৫, খোদাই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা]: *প্রাগুক্ত,* ইউসুফ খান [৪৮, কাবুলিওয়ালা, মেটিয়াব্রুজ], ওয়ালি খান [৪২, আফগান কাবুলিওয়ালা, গড়িয়া, সুদের ব্যবসায়ী]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৭.০৯.২০২১-২২.১০.২০২১)

৮. Nazes Afroz & Moska Najib: *From Kabul to Kolkata of Belonging, Memories and Identity,* (Kolkata, 22th March, 2015)। বিস্তারিত জানতে দেখুন- নাজিয়া আফরিন: কাবুলিওয়ালার খোঁজে, (ঢাকা, বিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২০১৫)।

৯. সৈয়দ মুজতবা আলী: *দেশে বিদেশে,* (কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৬)।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *কাবুলিওয়ালা,* (বিশ্বভারতী, সাধনা পত্রিকা, ১২৯৯)।

১১. কলকাতার *আফগান কাবুলিওয়ালাদের উপরে সমীক্ষা করে উঠে আসে এই তথ্য।* সমীক্ষা পর্যালোচনা করেছেন গবেষক নিজে।(১৯.৯.২০২১- ২৭.১০.২০২১)।

১২. আমির খান [৫৫, খোদাই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা]: *প্রাগুক্ত*।

১৩. *তদেব।*

১৪. নাজিয়া আফরিন: *প্রাগুক্ত*।

১৫. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা]: *প্রাগুক্ত।*

১৬. রবীন্দ্রনাথ: *চিঠিপত্র,* নবম খন্ড, ৪৫ নং চিঠি, (বিশ্বভারতী, ১৯৬৪)।

১৭. সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী: *সীমান্তের অন্তরালে,* (কলকাতা, জয়ঢাক প্রকাশনা, ২০০৭), পৃ. ১ ২।

১৮. অমিতাভ রায়: *কাবুলনামা,* (কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১০), পৃ.৩২।

১৯. Nazesh Afroz, Moska Najib: *BBC News Bangla,* 24th May, 2015.

২০. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: *প্রাগুক্ত,* (কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৮), পৃ. ২৫।

২১. তদেব, পৃ. ২৬।

২২. Nazes Afroz & Moska Najib: *প্রাগুক্ত*।

২৩. *তদেব।*

২৪. রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনগুলিতে কলকাতার ময়দান প্রাঙ্গণে কাবুলিওয়ালাদের মিলিত হওয়ার দৃশ্য দেখা যায়। গবেষক নিজে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের থেকে (০১.০১.২০২১)। *এছাড়া আমির খানের সাক্ষাৎকার পর্বেও একই অভিমত তিনি প্রকাশ করেছেন।*

২৫. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-ইন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৪.০৯.২০২১)।

২৭. শহিদুল্লাহ খান [২৭, আফগান, হুসেন এন্ড জেমস গারমেন্টসে কর্মচারী, ময়দান লেন, কলকাতা]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৭.০৯.২০২১)। দিন মহম্মদ দরবেশ [৩২, আফগান, হুসেন এন্ড জেমস গারমেন্টসের কর্মচারী, ময়দান লেন, কলকাতা]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৭.০৯.২০২১)।

২৮. *তদেব।*

২৯. পির নাজের তুর্কমেন [৩৮, মাজার-ই-শরিফ, আফগান জুয়েলারি ব্যবসায়ী, আফগানিস্তান]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে।(১৮.০২.২০২০)।

৩০. সমীর খান [২৭, কার্পেট ব্যবসায়ী, কাবুল]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছে গবেষক নিজে। সমির খান 'The Kabuliwalee' নামক সংস্থার কর্ণধার। এই সংস্থাটি কলকাতাতে এসেছিলেন আফগান পণ্যদ্রব্য নিয়ে, যার নাম 'The Kabuliwalee' সংস্থাটি কলকাতার বাজারে আফগান পণ্যের পসড়া নিয়ে এসেছিলেন। এই প্রদর্শনীটির নাম ছিল- The *Kabuliwalee, A short talk by Sameer Khan of his Rugs on Killim Rugs and Persian Carpets followed by a Fassion Show of Afghani Clothes and Jewellery,* (The Harrington Street Arts Center, Ho Chi Minh Sarani, 21st - 23rd ,2020).

৩১. *তদেব।*

৩২. *তদেব।*

৩৩. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* নয়াদিল্লী, ৩১ আগস্ট, ২০২০।

৩৪. *তদেব।*

৩৫. রমেশচন্দ্র চন্দ: *গান্ধারীর দেশে,* (কলকাতা, সেরিবান, নভেম্বর ২০২১),পৃ. ৪২।

৩৬. *তদেব:* পৃ. ৪৩।

৩৭. সৈয়দ মুজতবা আলি: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭০।

৩৮. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ.২৮।

৩৯. *তদেব।*

৪০. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা]: *প্রাগুক্ত।*

৪১. IB File No- *236/1939, Afghan National in Mednipore.* এছাড়া বিস্তারিত জানতে দেখুন- সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৪। শ্রী রমানাথ বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৯০-৯৫। পান্থজন: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৫৯-১৬১।

৪২. *From Kabul to Kolkata" Of Belonging Memories and Identity-Photography Exhibition Embassy of India Kabul, Afghanistan,* March 14, 2015.

৪৩. *তদেব।*

৪৪. কাউম খান [৫৫, সাবির হোটেলের কর্মচারী, কলকাতা]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (০১.০১.২০২২)।

৪৫. *আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ আগষ্ট,২০২১।*

৪৬. Mohammad Shafiq: *The Impact of Globalization: An insight into the Afghan Diaspora in India,* (Delhi, Jawaharlal Nehru University, School of International Studies, 2020).

৪৭. IB File No: - *236/1939(16), Afghan National in North 24 Parganas.*

৪৮. I.B File No: *236/1939(16), Afghan National in North 24 Parganas.*

৪৯. I.B File No: *236/1939, Afghan National in Calcutta.* এছাড়া আমির খান থেকে শুরু করে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের উপরে সমীক্ষা করে জানা গেছে কলকাতার একাধিক অঞ্চলে কাবুলিওয়ালাদের বাড়িঘরের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত কলকাতার পাশ্ববর্তী জেলাগুলিতেও কাবুলিওয়ালাদের বসবাসের একাধিক তথ্য উঠে আসে।

৫০. নাজিয়া আফরিন: *প্রাগুক্ত*। আমির খান: *প্রাগুক্ত।* এবং আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন- নাজেস আফরোজ: *বিবিসি নিউজ সাংবাদিক,* (কলকাতা, ফ্রম কাবুল টু কলকাতার তথ্যচিত্র নির্মাতা, ০৭.১২.২০১৫)।

৫১. বুজখাসি আফগানিস্তানের অন্যতম একটি প্রধান খেলা। এই ক্রীড়ার বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় রমেশচন্দ্র চন্দ: *গান্ধারীর দেশে,* পৃ. ৬৭। এছাড়া আরও জানতে বিস্তারিত দেখুন- Moska Najib and Nazesh Afroz: *Cultural Smarti Afganistan,* (Great Britain, Kuperard), এবং কাবুলের পথে পথে: প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

৫২. ঈদের দিনগুলোতে কলকাতার ময়দান প্রাঙ্গণে কাবুলিওয়ালারা এই 'আগুা কুষ্ঠি' খেলা খেলে থাকেন। আমির খান সাহেব থেকে শুরু করে ইসমাইল খান সমস্ত কাবুলিওয়ালা তাঁদের সাক্ষাৎকারে এই খেলার কথা ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া বস্তারিত জানতে দেখুন- *The kabuliwala of Tagore's story still live in Kolkata, Scroll 8 April, 2015.*

৫৩. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: প্রাগুক্ত, (১৪.০৯.২০২১)। এছাড়া বিস্তারিত জানতে দেখুন- Jhimli Mukherjee Panday: South Kolkata Club takes to strengthen ties with

Afghan traders in City, (The Times of India, 6th Septerber, 2021). এবং আরও জানতে দেখুন- BBC News, 23 May, 2015.

৫৪. *কলকাতার লজ্জা! আফগান সমর্থকরা মার খেলেন যুবভারতীতে, দ্যা ওয়াল,* ১১ জুন, ২০২২।

৫৫. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-ইন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: *প্রাগুক্ত,* (১৪.০৯.২০২১)।

৫৬. *তদেব।*

৫৭. Shaista Wahab and Barry Youngerman: *A Brief History of Afganistan, (New York, Fact on File an imprint of Infobase Publishing, Second edition,* 2010) পৃ.২৪।

৫৮. *তদেব,* পৃ. ২৫।

৫৯. রমেশচন্দ্র চন্দ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬।

৬০. *তদেব,* পৃ. ৬৩।

৬১. শ্রী সুনিতীকুমার চট্টোপাধ্যায়: *পথ চল্‌তি,* (বাক সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬০), পৃ. ১২৮।

৬২. *তদেব,* পৃ. ১২৯।

৬৩. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা]: *প্রাগুক্ত।*

৬৪. অমিতাভ রায়: *প্রাগুক্ত,*পৃ. ১০৪।

৬৫. *তদেব:* পৃ. ১০৭।

৬৬. *তদেব:* পৃ. ১০৭। এছাড়া আরও জানতে দেখুন- M.K.A Siddique: Muslims of Calcutta, (Kolkata, Anthropological Survey of India, September 1974).

৬৭. *Kabul to Kolkata "Of Belonging Memories and Identity" Photography Exhibition Embassy of India Kabul*, Afghanistan, March 14, 2015।

৬৮. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধায়: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭১।

৬৯. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা]: *প্রাগুক্ত।* কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের একাংশকে নিয়ে আমির খান সীমান্ত গান্ধির স্মৃতি এবং আদর্শকে সামনে রেখে কলকাতায় গড়ে তুলেছিলেন 'খোদাই-খিদমদ্গার' এবং 'ভারত পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ' সংগঠন। এই সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন নং- *(S/IL/66182)* গবেষক নিজে আমির খান সাহেবের থেকে এই তথ্য গবেষক নিজে সংগ্রহ করেছেন।

৭০. মিস ইয়াসমিন নিগার খান [৫১, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-ইন্দ, সভানেত্রী, সার্কাস এভিনিউ]: *প্রাগুক্ত*। ইয়াসমিন নিগার খান প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানের জন্য তিনি সীমান্ত গান্ধির স্মৃতির উদ্দেশ্য কলকাতাতে গড়ে তুলেছিলেন- *Badsha khan Memorial Woman & Children Welfare Organisation*, Kolkata, 2012. Estd-2012. এই সংস্থার মাধ্যমে সভানেত্রী বিভিন্ন প্রকারের সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতেন। বিশেষকরে কলকাতার পথ শিশুদের জন্য একাধিক সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

৭১. *তদেব।*

৭২. রমেশচন্দ্র চন্দ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬।

৭৩. আবদুল ওলিউর খান [৫২, আফগান কাবুলি, কাকিনাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগানা]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৬.০৯.২০১৯)

৭৪. রাজ্জাক খান [৫৪, আফগান কাবুলিওয়ালা, জাকারিয়া স্ট্রিট, কলকাতা]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৯.১১.২০১৯)।

৭৫. Moska Najib and Najesh Afroz: *প্রাগুক্ত।*

৭৬. মোঃ ফজলুল হক: *আফগানিস্তানের ইতিহাস ১৭৪৭-১৯৭৮,* (রাজশাহী, পাপিয়া সুলতানা, মার্চ ২০১৭), পৃ. ১৮।

৭৭. রমেশচন্দ্র চন্দ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৭।

৭৮. হাফিজ মহম্মদ সৈয়দ [৬৫, কাশীপুর বৈশাখ বাগান, আমির খানের বাল্যকালের শিক্ষক মহাশয়]: *সাক্ষাৎকার।* সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গবেষক নিজে। (১৮.০৩.২০১৯)। মিঃ হাফিজ সাহেব বলেন একসময় তিনি আফগান কাবুলিওয়ালাদের পরিবারের সন্তানদের পড়াতেন কাশিপুর ঝিলরোড মসজিদে। এখনও অনেকে কাবুলিওয়ালাদের পরিবারের শিশুরা আছেন যাঁরা তাঁর কাছে পড়াশোনা করতে আসেন। প্রসঙ্গত এই হাফিজ মহম্মদ সৈয়দ ছিলেন কলকাতার কাবুলিওয়ালারা সংগঠনের নেতা আমির খানের বাল্যকালের শিক্ষক।

৭৯. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা]: *প্রাগুক্ত।*

৮০. শ্রী রমানাথ বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০।

৮১. M.K.A Siddique: *প্রাগুক্ত।*

৮২. শেখ মকবুল ইসলাম: *প্রাগুক্ত।*

৮৩. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা]: *প্রাগুক্ত।*

৮৪. শেখ মকবুল ইসলাম: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৩৭-৩৯।

৮৫. আজম খান [৪২। আফগান কাপড় ব্যবসায়ী, হুসেন এন্ড গারমেন্টস এর মালিক, ময়দান লেন কলকাতা]: *প্রাগুক্ত,* (১৭.০৮.২০১৮)।

৮৬. M.K.A Siddique: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫১।

৮৭. শেখ মকবুল ইসলাম: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৩১-৩৯।

৮৮. *তদেব:* পৃ. ৩৯।

৮৯. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা]: *প্রাগুক্ত।*

৯০. *তদেব।*

৯১. *Kolkata Kabuliwala's pray for the Family & Friends back home, Times of India,* 17 August, 2021. এছাড়া বিস্তারিত জানতে দেখুন M.K.A Siddique: *Muslims of Calcutta,* (Kolkata, Anthropological Survey of India, September 1974) এই গ্রন্থে কলকাতার বিদেশি মুসলিম জনগোষ্ঠীদের ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

৯২. আমির খান [৫৫, খোদা-ই-খিদমদ্গার, সভাপতি, কলকাতা]: *প্রাগুক্ত।*

উপসংহার

পৃথিবীর ইতিহাসে অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর অভিগমন প্রবাহমান ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে আলোচিত হয়ে আসছে। অভিবাসনের মধ্য দিয়ে দেশান্তরিত হয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ এবং আশ্রয়প্রার্থী দেশে নতুন করে জীবন-জীবিকা শুরু করার প্রবণতা বিদেশি জনগোষ্ঠীগুলির মধ্য অত্যন্ত চেনা বৈশিষ্ট্য। অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যার এই ধারা ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রবাহমান। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অগণিত মানুষের বাসস্থান হিসাবে ভারতবর্ষ সর্বময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছোট ছোট বিদেশি জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটতে থাকে। যাঁদের মধ্য আফগান জনগোষ্ঠীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আফগানরা কলকাতা শহরের দিকে আসতে শুরু করেন।

১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কাবুলিওয়ালা' নামক গল্পের মধ্য দিয়ে কলকাতার আফগান জনগোষ্ঠীর কথা তুলে ধরেছিলেন। তিনি এই গল্পে ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতার আফগান জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছুটা আভাস দিয়েছিলেন। তবে কাবুলিওয়ালাদের ইতিহাস শুধুই ঔপনিবেশিক কালপর্ব এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ বাংলার সঙ্গে আফগান যোগাযোগের অতীত ইতিহাস। আবার একইভাবে উত্তর ঔপনিবেশিক কালপর্ব পেরিয়ে সাম্প্রতিক সময়েও কলকাতার কাবুলিওয়ালা জনগোষ্ঠীর অচর্চিত ইতিহাস উঠে এসেছে। তাঁদের কলকাতায় আগমন, বাসস্থান নির্বাচন এবং জীবনের একাধিক বিষয় আমরা দেখতে পেয়েছি। কাজেই উক্ত গবেষণা সন্দর্ভে ১৮৯২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবন যাপনের একাধিক দিকের উপরে গভীরভাবে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় জীবনের বহুবর্ণ দিক আলোচনায় উঠে এসেছে। যেখানে দেখা গেছে প্রতিমুহূর্তে অভিযোজনের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ অনুভব করেছেন।

কলকাতা মহানগরীতে বিদেশ থেকে আগত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্য আফগান কাবুলিওয়ালাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করেছি ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে কাবুলিদের যোগসূত্র বহু প্রাচীন। মহাকাব্যের যুগে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্য যোগাযোগের উন্মুক্ত ইতিহাস সর্বজনবিদিত। এই সময়ে 'গান্ধার' এবং 'গান্ধারী' এই দুটি নামের মধ্য দিয়ে দু-দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাস সামনে চলে আসে। 'গান্ধার' নামের সঙ্গে যেমন প্রাচীন আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক স্থানের নাম উঠে আসে, তেমনই 'গান্ধারী' নামের সঙ্গে উঠে আসে মহাভারতের গান্ধারীর কথা, যিনি আপাত দৃষ্টিতে আবার গান্ধার রাজ্যের রাজকন্যা। এছাড়া মহাকাব্যের যুগে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি গুলিতে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্ক বিষয়ে একাধিক গল্প, স্থানের সাদৃশ্যতা, মঠ, মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেখান থেকে দুটি দেশের সাংস্কৃতি সম্পর্কের মেলবন্ধনের চিত্র উঠে এসেছে।

তবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্য ঐতিহাসিক যোগসূত্র সর্বপ্রথম উঠে আসে হরপ্পার সভ্যতার বাণিজ্য মুখর চরিত্রের সূত্র ধরে। এই সময়ে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। আফগানিস্তানের বাদাখ্শান থেকে আমদানিকৃত দুর্মূল্য নীলকান্ত মণি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল হরপ্পা ও তার সমসাময়িক সময়ে। দুটি দেশের এই যোগাযোগের ধারা ঋক বৈদিক যুগকেও সমৃদ্ধ করেছিল। আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের মধ্য দিয়ে যার সূচনা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে দু'দেশের মধ্য একধাকি অঞ্চলগত সাদৃশ্যতা, নদ নদীর উৎস সন্ধানের মধ্য আফগানিস্তানের প্রসঙ্গ বার বার এসে পড়ে। এছাড়া যোগাযোগের এই ধারা মৌর্য সাম্রাজ্যে পেরিয়ে কুষাণ যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মৌর্য যুগে কাবুল, কান্দাহারের মতো অঞ্চলগুলি মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং মহামতি অশোক বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্য আফগানিস্তানকে নির্বাচিত করার ইতিহাস সকলের জানা। তবে কুষাণ যুগে দুটি দেশের যোগসূত্র আরও স্পষ্ট ভাবে উঠে আসে। সম্রাট কণিষ্ক তাঁর সাম্রাজ্যকে মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছিলেন। কাজেই আফগানিস্তানের উপরে কুষাণ রাজাদের আধিপত্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। কুষাণরা কাবুল এলাকা দখল করে আর্সাকীয় নামক উপজাতিদের থেকে।

তবে মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে আফগান যোগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভিন্নাত্মক হলেও, ভারতবর্ষে আফগানদের আগমনের পথ আরও প্রশস্ত হতে থাকে। অভিবাসনের শুরুর দিকে আফগানদের প্রধান লক্ষ ছিল ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। তবে সুলতানি আমলে অভিবাসনের অভিমুখ খানিকটা পরিবর্তন হয়। এই সময়ে আফগানরা ট্রেডিং ডায়াস্পোরার মাধ্যমেই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম অভিবাসিত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে সামরিক অস্ত্র সরবরাহ, যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত ঘোড়া বিক্রয়, সামরিক বাহিনীতে কাজের উদ্দেশ্যে, ভারতে খাস জমি দখলের চেষ্টায় অভিবাসিত হয়েছিলেন। তবে ১৫২৬ থেকে ১৫৫৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে আফগানরা ভারতবর্ষ দখল করাকে কেন্দ্র করে মোঘলদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। মোঘল এবং আফগানদের এই দীর্ঘ টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসন চলতে থাকে। কাবুল, কান্দাহারকে কেন্দ্র করে বাবরের সময় থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য- এশিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে উঠতে থাকে।

তবে বাংলার সঙ্গে আফগান যোগাযোগের যে অতীত ইতিহাস রয়েছে তা জানতে পারা যায় বখতিয়ার খলজির বাংলায় আগমনের মধ্য দিয়ে। যদিও বখতিয়ার খলজির অনেকে আগে থেকে অনেক সাধারণ আফগানরা বাংলায় পদার্পণ করেছিলেন সেনাবাহিনীর কাজে অংশগ্রহণ করার কাজে। ১৪৯৩ সাল থেকে ১৫১৯ সাল পর্যন্ত আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময়ে বাংলায় আফগান উপস্থিতির ছবি স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে শেরশাহ শূর, দীন মহম্মদ এবং কররানীর মত আফগান শাসকরা বাংলার বুকে শাসক হিসাবে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাজেই বাংলার সঙ্গে আফগান যোগাযোগের ইতিহাস সীমাবদ্ধ ছিল না।

আধুনিক যুগে ভারত এবং আফগানিস্তান যোগাযোগের বিষয়ে একাধিক তথ্য উঠে এসেছে। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশদের সঙ্গে একের পর এক ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের ক্ষেত্র, ঐতিহাসিক ডুরান্ড লাইনের স্থাপন, পাকতুনিস্থান সমস্যা নিয়ে সীমান্তগান্ধি সহ পাঠানদের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান, স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার সমূহ ভারতে আফগান অভিবসানের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেছিল। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে আফগানিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্র আরও

মজবুত হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই আফগানিস্তান দেশটি বারে বারে একাধিক সমস্যায় জর্জরিত ছিল। কাজেই আফগানিস্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, একাধিক নির্মাণ প্রকল্প, সেনাবাহিনী গঠনের মতো কাজে ভারত সবসময় আফগানিস্তানকে সাহায্য এসেছে।

একইভাবে আমরা লক্ষ করেছি ১৯৭৯-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত আফগান দ্বন্দ্ব, ১৯৯২-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ, ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত তালিবান শক্তির আগ্রাসন আফগানিস্তানের আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে রাজনৈতিক অবস্থার অপরিসীম ক্ষতির কারণে আফগানরা ভারতবর্ষে অভিবাসিত হয়েছে। ভারত এই সমস্ত আফগান বাস্তুচ্যুত মানুষের আশ্রয়প্রার্থী দেশ হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। কাজেই ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্য ঐতিহাসিক যোগাযোগ থেকে অভিবাসনের ইতিহাসের মধ্য কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনের প্রেক্ষিত বিদ্যমান রয়েছে।

১৯৫১ ও ১৯৬৭ সালে শরণার্থী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নিয়মাবলীতে ভারতের প্রতক্ষ সায় না থাকলেও ভারত সরকার আফগান নাগরিকদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেননি। কাজেই কলকাতার বুকে অন্যান্য বিদেশি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের আগমনের ক্ষেত্রে তেমন কোনও সমস্যা লক্ষ করা যায়নি। কাজেই কাবুলিওয়ালারা অনেক সময় যেমন স্বেচ্ছায় দেশান্তরিত হয়েছেন আবার সংকটেও দেশান্তরিত হয়ে ভারতবর্ষকে বাসস্থানের জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা লক্ষ করেছি কাবুলিওয়ালাদের কলকাতাতে অভিগমনের বিষয়টির সঙ্গে ‘ডায়াস্পোরার’ ধারণা সমনে এসে পড়ে। কারণ ‘অভিবাসন’ শব্দটির সঙ্গে দেশ ছেড়ে বিদেশে বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠীর চিত্র সেভাবে ধরা পড়ছিল না। কাজেই ‘ডায়াস্পোরা’ শব্দটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে কাবুলিওয়ালাদের কলকাতাতে আগমনের ধরনের মধ্য ‘ডায়াস্পোরা’ তত্ত্বের ধারণা লক্ষ করা যায়। প্রথমদিকে কোনও জনগোষ্ঠীর মানুষ তাঁর জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্যস্থানে আশ্রয় নিলে তাঁদেরকে ‘ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠী’ হিসাবে আখ্যায়িত করা হত। পরবর্তীকালে এই ধারণা প্রসারিত হয়ে স্বেচ্ছায় দেশান্তরিত মানুষদের ‘ডায়াস্পোরা’ জনগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত করা হয়। যা কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আলাদা নয়।

গবেষণাতে উঠে এসেছে কাবুলিওয়ালারা 'অভিবাসিত' এবং 'ডায়াস্পোরার' কবলে পড়ে দেশান্তরিত হওয়ার পরে কলকাতাতে এসে তাঁরা নানা প্রতিকুলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। ফলে আশ্রিত দেশে একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাঁরা 'প্রান্তিক' অবস্থার মধ্যে পতিত হচ্ছেন। আর্থ-সামাজিক ভাবে তাঁদের জীবনে যেমন প্রান্তিকতা নেমে আসছে, তেমনই কলকাতার অন্যান্য বিদেশি জনগোষ্ঠীর নিরিখে সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর' মধ্য প্রতিপন্ন হচ্ছেন। কাজেই তাঁদের এই সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক অনিশ্চয়তা প্রান্তিকতার মানদন্ডের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপরিচয়ের সংকটের সামনে দাঁড় করাচ্ছে।

অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ মুজতবা আলী, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় আফগান সমাজ এবং কাবুলিওয়ালাদের পরিচয় বার বার উঠে এসেছে। এমনকি চলচ্চিত্রকর তপন সিংহ, হেমেন গুপ্তার মতো পরিচালকদের হাত ধরে 'কাবুলিওয়ালা' চলচ্চিত্র দর্শক দরবারে সগৌরবে সমাদৃত হয়েছে। এর পরেও কলকাতার বুকে কাবুলিওয়ালারা নিজেদের আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে আজও অভিবাসিত জনগোষ্ঠী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মতো জীবন কাটাতে কাবুলিওয়ালারা বাধ্য হচ্ছেন।

তবে কাবুলিওয়ালাদের অভিবাসন শুধুই তত্ত্বের মধ্যই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁদের অভিবাসনের পিছনে দ্বিমুখী কারণ লক্ষ করা গিয়েছে। একদিকে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার চরম দুর্দশা, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি এবং বিদেশি শক্তির ক্রমাগত আগ্রাসী নীতি তাঁদের যেমন দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল। অন্যদিকে কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রথম দিকের রাজধানী। কাজেই আফগানদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে কলকাতাকে বেছে নিতে অসুবিধা হয়নি। এঁরা আফগানিস্তানের পাকতিয়া, গজনী, মুসাখেল, পাকতিকা, কান্দাহারের মতো একাধিক প্রদেশগুলি থেকে ভারতে এসেছিলেন। পরে ভারতের কলকাতা, দিল্লি, বিহার পাঞ্জাব, আসাম, বোম্বের মতো বড়ো বড়ো শহরগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বিভিন্ন জেলা শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। **১৯৩৯** সালে কলকাতা গোয়েন্দা দপ্তরের নথিপত্র থেকে জানা যায় কাবুলিওয়ালারা হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা,

বাঁকুড়া, দিনাজপুর, নদিয়া, হুগলি, জলপাইগুড়ি জেলা সহ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলা শহরগুলিতে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলিওয়ালারা অনেকেই কলকাতামুখী হয়ে উঠেছিলেন। পার্ক সার্কাস, গড়িয়া এলাকা, ফিয়ার্স লেন, ওয়েলিংটন, কাশিপুর, শ্যামবাজার, বড়বাজার, ধর্মতলা, ভবানীপুরের মতো অঞ্চলগুলিতে অনেকেই পাকাপাকিভাবে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে তাঁরা কলকাতার জনজীবনে নিজেদেরকে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন।

কাবুলিওয়ালাদের দীর্ঘদিন কলকাতায় বসবাস করার সুবাধে তাঁদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপরে বিভিন্ন ধরনের তথ্য উঠে আসে। ঔপনিবেশিক আমলে কাবুলিওয়ালারা যখন কলকাতাতে আসতে শুরু করেছিলেন তখন তাঁদের পেশাগত জীবনের একটা দিক 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খানিকটা তুলে ধরেছেন। হিং, সুরমা, শুকনো ফল, পোস্তিনের মত পণ্যদ্রব্য কলকাতা শহর থেকে গ্রাম অঞ্চলের শহরতলীতে বিক্রি করতেন। একই সঙ্গে কাজু, কিসমিস, আখরোটের ব্যবসায় তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। তবে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাঁদের মূল ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুদের ব্যবসা। এই সুদের ব্যবসা ছিল তাঁদের প্রধান ব্যাবাসা। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসতে শুরু করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নতুন পেশার দিকে তাঁরা ঝুঁকতে শুরু করেন। দর্জির দোকান, রেডিমেট কাপড়ের ব্যবসা, হোটেল ব্যবসার মতো কাজে তাঁরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। তবে সাম্প্রতিককালে কাবুলিওয়ালারা নানা রকমের উদ্ভবনী পেশার সঙ্গে নিজেদের নিযুক্ত করতে উদ্যত হয়েছেন যেমন- কলকাতার বাণিজ্য মেলাগুলিতে আফগানি পণ্যের দোকান, কলকাতার হোটেলগুলিতে আফগানি মশলার সরাবরাহ, মাইক্রোফিনান্স এবং প্রমোটারির মতো ব্যবসা।

কাবুলিওয়ালাদের কলকাতায় আগমনের প্রথম দিকে তাঁদের সামাজিক জীবন গড়ে ওঠেনি। তবে পরবর্তী সময়ে তাঁরা যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তখন তাঁদের সমাজ জীবনের চিত্র ক্রমশ বদলাতে শুরু করে। কলকাতায় বিবাহের মাধ্যমে

সংসার জীবনের শুরু করার পরে অনেকেই পাকাপাকিভাবে কলকাতাতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে আফগান সমাজে মহিলাদের অবস্থান বেশ রক্ষণশীল। তবে কাবুলিওয়ালাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, বসবাসের ক্ষেত্রে অঞ্চলগত বিভাজন এবং নাগরিক সমস্যা এবং মৃত্যুর মতো বিষয়গুলির সঙ্গে কলকাতা জড়িয়ে আছে গভীরভাবে।

কলকাতার কাবুলিওয়ালদের রাজনৈতিক চেতনার একাধিক তথ্য আমরা পেয়ে থাকি। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রতক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও, রাজনৈতিক ভাবে তাঁরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কাবুলিওয়ালা জনগোষ্ঠীর প্রথম নেতা লালাজান খান এবং পরবর্তীতে আমির খান, ইয়াসমিন নিগার খানের মতো নেতৃবৃন্দ উঠে এসেছেন। লালজান খান সারা ভারতের পাখতুন জনগোষ্ঠীর দাবিদাওয়া ও চাহিদা নিবারণের জন্যে ‘অল ইন্ডিয়া পাখতুন-জিরগা-ই-হিন্দ’ নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন খান আব্দুল গফফর খানের সাহচর্যে। পরবর্তীকালে এই সংগঠনের কার্যভার গ্রহণ করেছে লালা জানের কন্যা ইয়াসমিন নিগার খান। আমির খানের প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে ‘খোদাই-খিদমদ্গার’ নামক প্রতিষ্ঠান। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাবুলিওয়ালাদের নানা রকমের কার্য পদ্ধতি পরিচালনা করেছেন। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহন না করলেও তাঁরা যে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন সে তথ্য উঠে আসে। এছাড়া কাবুলিওয়ালাদের একাংশের মধ্য পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থার প্রতি তাঁদের যে দুর্বলতা আছে সেকথা তাঁদের কথাবার্তা এবং কার্যক্রমের মধ্য বার বার ফুটে উঠেছে। তবে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি কাবুলিওয়ালাদের কলকাতাতে বসবাসের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদান করলেও, তাঁদের সার্বিক ভোটাধিকার, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব প্রদান, নেতৃবৃন্দ নির্বাচনে তেমন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

একেবারে শেষ অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করেছি কলকাতা মহানগরীতে আফগান কাবুলিওয়ালারা কীভাবে তাঁদের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনকে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। কলকাতার আফগান জনগোষ্ঠীর মানুষদের তাঁদের নিজেস্ব একটি সাংস্কৃতিক জীবন ছিল। আবার কয়েকশো বছর বসবাসের ফলে কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের ছাপ তাঁদের মধ্য পড়তে শুরু করেছিল। কাজেই তাঁদের মধ্য একটা মিশ্র সংস্কৃতির ভাবধারা

লক্ষ করা গিয়েছিল। তবে এই মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যও কাবুলিওয়ালারা তাঁদের বাড়িঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, পারিবারিক জীবন এবং বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্য আফগান সত্তাকে ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কাজেই কলকাতার বুকে তাঁদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন ধারার মধ্য বিপুল পরিবর্তন সাধিত হলেও আফগান ভাবধারা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাঁদের খাদ্য সংস্কৃতি, গৃহের অন্তরমহলের সাজসজ্জা, খেলাধূলা ও শরীর চর্চা, ভাষাগত দিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন স্থাপনের মধ্য আফগান সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়।

একইভাবে কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে ধর্মীয় দিকের একটা বিরাট বড় অংশ বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে উঠে এসেছে। যেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি কাবুলিওয়ালারা সকলেই প্রায় ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী। ফলে তাঁদের ধর্মীয় আচার-আচরণে ইসলামি নিয়ম-কানুন অনুসারে চালিত হয়ে থাকে। ধর্মকে কেন্দ্র করে কাবুলিওয়ালারা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিয়ম নীতি পালন করার চেষ্টা করে থাকেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আফগান জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ঈদ উপলক্ষে একত্রে মিলিত হয়ে উৎসব উদ্‌যাপন করেন। সর্বোপরি মৃত্যুর পরে কলকাতার নিকটস্থ যে সমস্ত কবরস্থান আছে সেখানেই তাঁদেরকে চিরতরে শায়িত করা করা হয়ে থাকে।

সংযোজনী

সংযোজনী: ১. সমগ্র বঙ্গে আফগান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা।

সাল	জনসংখ্যা
১৮৭২	১২৮
১৮৮১	৯৭
১৮৯১	২৭৬
১৯০১	৬৭০
১৯১১	১৩৪১
১৯২১	১৪৩৮
১৯৩১	১০০৮
১৯৪১	------
১৯৫১	৭৭২
১৯৬১	৬৩৩
১৯৭১	১৮৫
১৯৮১	৮৮৮
১৯৯১	১৩৪০
২০০১	৪৬৬
২০১১	৩৩২

সূত্র: ১৮৭২ থেকে ২০১১ জনগণনা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তালিকা

সংযোজনী: ২. ১৯৪৯ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় আফগান জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান।

ক্রমিক সংখ্যা	সাল	জনগোষ্ঠীর নাম	পুরুষ	নারী	সর্বমোট জনসংখ্যা
১.	১৯৪৯	আফগান	১৪৪৫	০	১৪৪৫
২.	১৯৫০	আফগান	১৮৭৬	১	১৮৭৭
৩.	১৯৫১	আফগান	২৪৮১	১	২৪৮২
৪.	১৯৫২	আফগান	২০৭৭	০	২০৭৭
৫.	১৯৫৩	আফগান	১৬৬৪	৭	১৬৭১
৬.	১৯৫৪	আফগান	১৬৭৬	১	১৬৭৭
৭.	১৯৫৫	আফগান	-	-	-
৮.	১৯৫৬	আফগান	১৬২৭	০	১৬২৭
৯.	১৯৫৭	আফগান	১৪৯১	০	১৪৯১
১০.	১৯৫৮	আফগান	১৩৯৪	১	১৩৯৫
১১.	১৯৫৯	আফগান	-	-	-
১২.	১৯৬০	আফগান	৫১৮	১	৫১৯
১৩.	১৯৬১	আফগান	১০৬০	১	১০৬১

সূত্র: Statistical Abstract West Bengal, Government of West Bengal State Statical Bureau.

সংযোজনী: ৩. ১৯৪১ সালে হাওড়া জেলায় বসবাসরত আফগান জনগোষ্ঠীর তলিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	জন্ম সাল ও জন্মস্থান	বর্তমান পেশা	বর্তমান ঠিকানা	ভারতে আগমনের সময়কাল
১.	খান মহম্মদ সত্তার	১৯২১, খায়ারখোট, গজনী	সুদের ব্যবসা	৩৪, নারায়ন চৌধুরী ঘাট, শিবপুর, হাওড়া	১৯৪১
২.	খান মহম্মদ ইয়ার	১৯২১, খায়ারখোট, গজনী	সুদের ব্যবসা	৩৪, নারায়ন চৌধুরী ঘাট, শিবপুর, হাওড়া	১৯৪১
৩.	খান বাজ মহম্মদ	১৯১৪, খায়ারখোট, গজনী	কাপড়ের ব্যবসা	নাসিং বোস লেন, হাওড়া	১৯৫২
৪.	খান সৈয়দ তরি	১৯০৪, সারান, গজনী	সুদের ব্যবসা	মানিকপুর, সাকরাইল, হাওড়া	১৯৩৪
৫.	খান জুমা গুল	১৯০৭, দিহ-ইয়াক, গজনী	সুদের ব্যবসা	২৯৮, বিলিয়াস রোড, হাওড়া	১৯৪২
৬.	খান আব্দুল হালিম আবদুল্লা	১৮৮২, দিহ-ইয়াক, গজনী	কাপড়ের ব্যবসা	২৩৯, পঞ্চানন তলা, হাওড়া	১৯৪৬
৭.	খান আব্দুল খালিক	১৯২৬, খু-আমাত, গজনী	সুদের ব্যবসা	৩৪, রাজ নারায়ন চৌধুরী রোড, হাওড়া	১৯৪৬
৮.	খান রাজ মহম্মদ	১৯০৭, মিস-ওয়াস, হুকমাত, গজনী	সুদের ব্যবসা	১৬৯ জি.টি রোড, শিবপুর, হাওড়া	১৯৪১
৯.	খান মহম্মদ সাফিয়া	১৯০৮, লুৎ-ওয়াল, গজনী	সুদের ব্যবসা	১৬৯ জি.টি রোড, শিবপুর, হাওড়া	১৯৩৬
১০.	খান মহম্মদ আসলাম	১৯১৮,মুখামাত, খায়েরকোর্ট, গজনী	সুদের ব্যবসা	১/২ নাসিং বোস লেন, শিবপুর, হাওড়া	১৯৩৬
১১.	খান গুলাম মহম্মদ	১৯২১, মুখামাত, খায়েরকোর্ট, গজনী	সুদের ব্যবসা	৩৪, রাজ নারায়ন চৌধুরী রোড, হাওড়া	১৯৩৯
১২.	খান আব্দুল মাজিদ	১৯০১, গন্ডাই, গজনী	সুদের ব্যবসা	১৬৯ জি.টি রোড, শিবপুর, হাওড়া	১৯৪৪
১৩.	খান মাসা	১৯১৪, কেল্লাখেল, কাটওয়াজ	কাপড়ের ব্যবসা	১/২ নাসিং বোস লেন, শিবপুর, হাওড়া	১৯৪০

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	জন্ম সাল ও জন্মস্থান	বর্তমান পেশা	বর্তমান ঠিকানা	ভারতে আগমনের সময়কাল
১৪.	খান ফাকির	-----, আফগানিস্তান	কাপড়ের ব্যবসা	১/২ নাসিং বোস লেন, শিবপুর, হাওড়া	১৯৪৩
১৫.	খান জালাত	১৯২৯, কাকাখেল, কার্টওয়াজ	কাপড়ের ব্যবসা	১/২ নাসিং বোস লেন, শিবপুর, হাওড়া	১৯৪০
১৬.	খান মালঙ	১৯১৭, কাকাখেল, কার্টওয়াজ	কাপড়ের ব্যবসা	১/২ নাসিং বোস লেন, শিবপুর, হাওড়া	১৯৪২
১৭.	খান নাসির	১৯২০, কাকাখেল, কার্টওয়াজ	কাপড়ের ব্যবসা	১/২ নাসিং বোস লেন, শিবপুর, হাওড়া	১৯৪২
১৮.	খান আলামির	১৯১৪, কাকাখেল, কার্টওয়াজ	কাপড়ের ব্যবসা	১/২ নাসিং বোস লেন, শিবপুর, হাওড়া	১৯৪২
১৯.	খুদাই নাজীর	১৯১০, খেরট	সুদের ব্যবসা	২৫৬, বিলিয়াস রোড, হাওড়া	১৯৩৪
২০.	খান আকরাম	১৯০৬, পাঠান, গজনী	সুদের ব্যবসা	১৫০, জি.টি রোড, হাওড়া	১৯২৬
২১.	খান ওয়াজির	১৯৩০, পাঠান, গজনী	সুদের ব্যবসা	মানিকপুর, সাকরাইল, হাওড়া	১৯৪৪
২২.	খান দোরান	১৯১০, আখাদ, গজনী	সুদের ব্যবসা	১৫০, জি.টি রোড, সালকিয়া, হাওড়া	১৯৪০
২৩.	খান করিম	১৮৯৪, হুকমাত, গজনী	সুদের ব্যবসা	১৫০, জি.টি রোড, সালকিয়া, হাওড়া	১৯২১
২৪.	খান আজাদ	১৯৩৪,খালাখেল, খাইরখোর্ট, গজনী	সুদের ব্যবসা	পালিয়ার হাট, গৌরাঙ্গ চক, আমতা, হাওড়া	১৯৫১
২৫.	খান জালালুদ্দিন	১৯০২, বালাই, দিই-ইয়াক	সুদের ব্যবসা	১৫০, জি.টি রোড, সালকিয়া, হাওড়া	১৯২৬
২৬.	খান গোলাম রসুল	১৮৯৭, দিই-ইয়াক, গজনী	সুদের ব্যবসা	২৩৯, পঞ্চানন তলা, হাওড়া	১৯৪৫
২৭.	খান জান মহম্মদ	১৯১৯, ইয়ারো-ইয়া, মহম্মদ খেল	সুদের ব্যবসা	২০, জি.টি রোড, বালি	১৯৩৪

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	জন্ম সাল ও জন্মস্থান	বর্তমান পেশা	বর্তমান ঠিকানা	ভারতে আগমনের সময়কাল
২৮.	খান নিয়াজ গুল	১৯৩৩, মোহম্মদখেল, তাতিয়াওরাড়, গজনী	সুদের ব্যবসা	১/২ নাসিং বোস লেন, শিবপুর, হাওড়া	১৯৩৫
২৯.	খান আব্দুল হাকিম	১৯২৩, হুকমাত, সারান	সুদের ব্যবসা	খালসাপাড়া, উলুবেড়িয়া	১৯৪৫
৩০.	মুসা খান	১৮৮১, গজনী	সুদের ব্যবসা	১/২ নাসিং বোস লেন, শিবপুর, হাওড়া	১৯৩৫
৩১.	খান আব্দুল মালিক	১৯১৭, সৈয়দ মহম্মদখেল, হুকুমাত, গজনী	সুদের ব্যবসা	খালসাপাড়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া	১৯৪৫
৩২.	খান সুলতান	১৯১৩, মকার, গজনী	সুদের ব্যবসা	২৫৬, বিলিয়াস রোড, হাওড়া	১৯৩৪
৩৩.	উমর খান	১৯১৮, গিলান, গজনী	সুদের ব্যবসা	২৫৬, বিলিয়াস রোড, হাওড়া	১৯৩৪
৩৪.	খান গোলাম মৈইনুদ্দিন	১৯২৯, হুকমাত, সারান, গজনী	সুদের ব্যবসা	২৫৬, বিলিয়াস রোড, হাওড়া	১৯৫০
৩৫.	খান হোসাই	সারান, গজনী	সুদের ব্যবসা	২০, জি.টি রোড, বালি	১৯৫১
৩৬.	খান পাই মহম্মদ	সারান, গজনী	সুদের ব্যবসা	২০, জি.টি রোড, বালি	১৯৫১
৩৭.	খান মহম্মদ সূফী	গজনী	সুদের ব্যবসা	২০, জি.টি রোড, বালি	১৯৩৯
৩৮.	খান খারোটি	গজনী	সুদের ব্যবসা	২০, জি.টি রোড, বালি	১৯৩৯
৩৯.	খান ফাতে মহম্মদ	১৯০৬, হুকমাত, সারান	সুদের ব্যবসা	২০, জি.টি রোড, বালি	১৯৩৫
৪০.	খান আলি আকবর	১৯০৭, চারমারি, গজনী	সুদের ব্যবসা	১/২ নাসিং বোস লেন, শিবপুর, হাওড়া	১৯৪০

**বিঃদ্রঃ: হাওড়াতে আরও ততধিক আফগান নাগরিকের তথ্য পাওয়া যায়।*

সূত্র: IB File No-236/1939 (16)- Afghan National Hawrah

সংযোজনী: ৪. মেদিনীপুর জেলায় আগত আফগান জনগোষ্ঠীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	পিতার নাম	জন্মস্থান	জেলা	থানা	পশ্চিমবঙ্গে বাসস্থান
১.	গোলাপ খান	শাহনোয়াজ খান	উমারখেল	গার্দেজ	দাজি	মেদিনীপুর
২.	মির গিয়াসুদ্দিন ইলিয়াস	ইয়ার মহম্মদ	নাওসের	গার্দেজ	গার্দেজ	মেদিনীপুর
৩.	সৈয়দ আকবর	জান মহম্মদ	তারাখেল	গার্দেজ	গার্দেজ	মেদিনীপুর
৪.	আজিজ খান	আকিম খান	কামারা	গজনী	গজনী	মেদিনীপুর
৫.	ফাতে খান	মির খান	আসমালাই	গজনী	ওয়াজি	মেদিনীপুর
৬.	জাফর খান	বাজগুল খান	তরা	গজনী	গজনী	মেদিনীপুর
৭.	গুল খান	মিরবাজগ খান	কানদেউ	গজনী	গজনী	মেদিনীপুর
৮.	আলানক খান	মিসরাই খান	আসামোনাই	আসমালখের	গজনী	মেদিনীপুর
৯.	ওবেদুল খান	মাজদার খান	বেণাটাই	গার্দেজ	গার্দেজ	মেদিনীপুর
১০.	আওয়াল ইলিয়াস আবাল খান	আজিজ খান	উমরখেল	ওয়াজি	গার্দেজ	মেদিনীপুর
১১.	তাজগুল খান	মুরাদগুল খান	ডালো	গার্দেজ	গার্দেজ	মেদিনীপুর

**বিঃদ্রঃ: মেদনীপুরে আরও ততধিক আফগান নাগরিকের তথ্য পাওয়া যায়।*

সূত্র: IB File No-236/1939 (16) Afghan National Mednipore

সংযোজনী: ৫. ১৯৫২ সালে চব্বিশ পরগণা জেলায় বসবাসরত আফগান জনগোষ্ঠীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	পেশা	আফগানিস্তানের ঠিকানা	চব্বিশ পরগণার ঠিকানা	আগমনের সময়কাল
১.	সৈয়দ রসুল	সুদের ব্যবসা	শাহিকোর্ট, গার্দেজ	৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, টলিগঞ্জ	কলকাতা-১.০২.১৯৫২
২.	গুল খান	সুদের ব্যবসা	মিয়াজিসারেঙ্গে, মহম্মদ খেল, গজনী	শ্যামগঞ্জ, বিড়লা পুর	কলকাতা-১.০২.১৯৫২
৩.	সাখকী	সুদের ব্যবসা	পাঠান, গজনী	ফাড়ি বাগান, কামার হাটি	কলকাতা-১৬.১২.১৯৫২
৪.	গুল খান	সুদের ব্যবসা	মুসাখেল, গজনী	ইছাক সরদার কুঠি, কাকিনাড়া	কলকাতা-১০.০১.১৯৫২
৫.	লাওনাঙ	সুদের ব্যবসা	মুসাখেল, গজনী	কালিয়াচক, বজবজ	কলকাতা-২৪.০১.১৯৫২
৬.	আবুল খালিক	সুদের ব্যবসা	ইউসুফখেল, গজনী	ইছাক সরদার কুঠি, কাকিনাড়া	কলকাতা-৩০.১২.১৯৫২
৭.	পির দিল	সুদের ব্যবসা	ইউসুফখেল, গজনী	গোরা বাজার, দমদম	কলকাতা-১৩.০১.১৯৫২
৮.	মির্জা খান	হিং বিক্রেতা	সারান, গজনী	৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, টলিগঞ্জ	কলকাতা-০২.০১.১৯৫২
৯.	আলম খান	সুদের ব্যবসা	সিলগার, গজনী	বাটারিয়া রোড, আলম বাজার	কলকাতা-১৭.১.১৯৫২
১০.	কটাই খান	সুদের ব্যবাসা	সারান, গজনী	বাশবাগান, টিটাগড়	কলকাতা-২১.০১.১৯৫২
১১.	আমির শাহ	সুদের ব্যবসা	সিলগার, গজনী	বাটারিয়া রোড, আলম বাজার	কলকাতা-১৭.০১.১৯৫২
১২.	আতা মহম্মদ	সুদের ব্যবসা	কাটওয়ার্জ, গজনী	কালিয়াচক, বজবজ	কলকাতা-১৬.০১.১৯৫২
১৩.	লগন খান	কাপড়ের ব্যবসা	কার্টওয়ার্জ, গজনী	কালিয়াচক, বজবজ	কলকাতা-১৫.০১.১৯৫২

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	পেশা	আফগানিস্তানের ঠিকানা	চব্বিশ পরগণার ঠিকানা	আগমনের সময়কাল
১৪.	খোজা খান	সুদের ব্যবসা	কইগড়, গার্দেজ	বনগাঁ বাজার, বনগাঁ	কলকাতা-১৬.০১.১৯৫২
১৫.	মেতা খান	কাপড়ের ব্যবসা	কার্টওয়াজ, গজনী	কালিয়াচক, বজবজ	কলকাতা-১৬.০১.১৯৫২
১৬.	শের ডালি	সুদের ব্যবসা	সুরমাত, গার্দেজ	বেঙ্গলি বাজার, মেটিয়াব্রুজ	কলকাতা-১৬.০১.১৯৫২
১৭.	জুমা মহম্মদ	সুদের ব্যবাসা	মমজাই, গার্দেজ	৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, টলিগঞ্জ	কলকাতা-১৬.০১.১৯৫২
১৮.	আব্দুল গফফর	কাপড়ের ব্যবসা	ইউসুফখেল, গজনী	ওয়ার্কশপ রোড কাঁচড়াপাড়া	কলকাতা-০৮.০১.১৯৫২
১৯.	মুসা খান	সুদের ব্যবসা	পিন্ডাইখেল, গজনী	স্টেশন রোড, ডায়মন্ড হাবড়ার	কলকাতা-১১.১২.১৯৫১
২০.	কাদির খান	সুদের ব্যবসা	সারান, গজনী	রাজাবাগান, মাটিয়াব্রুজ	কলকাতা-০৫.১২.১৯৫১
২১.	নাসিম খান	সুদের ব্যবাসা	সারান, গজনী	শংকরবাজার, বারুইপুর	কলকাতা-০৭.১২.১৯৫১
২২.	দোস্ত মহম্মদ	সুদের ব্যবসা	সারান, গজনী	বাগদা হাট, বনগাঁ	কলকাতা-২৯.১১.১৯৫১
২৩.	শাহ নাওয়াজ	সুদের ব্যবসা	লাতোয়াল	লাকিপুর, আলমবাজার	কলকাতা-২৯.১১.১৯৫১
২৪.	গুলাম নবী	সুদের ব্যবসা	সাইদামখেল, গজনী	হাইস্কুল রোড, মেটিয়াব্রুজ	কলকাতা-২৬.১১.১৯৫১
২৫.	দোরগুল	সুদের ব্যবসা	হুকমাত, গার্দেজ	ভিক্টোরিয়া রোড, আলমবাজার	কলকাতা-২২.১১.১৯৫১
২৬.	কাজির খান	সুদের ব্যবসা	জানকি, গজনী	৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, টলিগঞ্জ	কলকাতা-০৪.০১.১৯৫২
২৭.	মির্জা গুল	সুদের ব্যবসা	জুরমাত, গার্দেজ	বেহালা	কলকাতা-২৮.৫.১৯৫১

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	পেশা	আফগানিস্তানের ঠিকানা	চব্বিশ পরগণার ঠিকানা	আগমনের সময়কাল
২৮.	মহম্মদ খান	সুদের ব্যবসা	পাঠান, গজনী	কুলপি রোড, বারুইপুর	কলকাতা-২৭.১০.১৯৫১
২৯.	শারিন দিল	সুদের ব্যবসা	খাজাদের খেল, সারান	শাখওয়াত বিল্ডিং, হাইস্কুল রোড, মেটিয়াব্রুজ	কলকাতা-২৭.১০.১৯৫১
৩০.	দর মহম্মদ খান	সুদের ব্যবসা	পলাটখেল, গার্দেজ	কাকিনাড়া, জগদ্দল	কলকাতা-১৬.৪.১৯৫১

**বিঃদ্রঃ: অবিভক্ত চব্বিশ পরগানায় আরও ততধিক আফগান নাগরিকের তথ্য পাওয়া যায়।*

সূত্র: IB File No-236/1939 (16) Afghan National 24 Parganas District

সংযোজনী: ৬. ১৯৪৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় আফগান জনগোষ্ঠীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	আগমনের সময়কাল
১.	মান্নান খান	জলপাইগুড়ি- ৩০.১১.৪৮
২.	বানুয়াশাই খান	জলপাইগুড়ি- ৩০.১১.৪৮
৩.	নূর মহম্মদ খান	জলপাইগুড়ি- ৩০.১১.৪৮
৪.	মহম্মদ আসলাম খান	জলপাইগুড়ি- ৩০.১১.৪৮
৫.	মহম্মদ আয়ুব খান	জলপাইগুড়ি- ৩০.১১.৪৮
৬.	মহম্মদ গোলাপ খান	জলপাইগুড়ি- ৩০.১১.৪৮
৭.	গুল মহম্মদ খান	জলপাইগুড়ি- ৩০.১১.৪৮
৮.	আব্দুল হাসান খান	জলপাইগুড়ি- ৩০.১১.৪৮
৯.	মহম্মদ নাজির খান	জলপাইগুড়ি- ৩০.১১.৪৮
১০.	মহম্মদ রহিম খান	জলপাইগুড়ি- ৩০.১১.৪৮

**বিঃদ্রঃ: জলপাইগুড়ি জেলায় আরও ততধিক আফগান নাগরিকের তথ্য পাওয়া যায়।*

সূত্র: IB File No-236/1939 (16) Afghan National Jalpaiguri

সংযোজনী: ৭. ১৯৫১ সালে বর্ধমান জেলায় আগত আফগান জনগোষ্ঠীর তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	আফগানিস্তানের ঠিকানা	আগমনের সময়কাল
১.	শাহ হোসেন	বাক্‌খেল, গজনী	বর্ধমান- ১৮.১২.১৯৫১
২.	নিজামুদ্দিন	বাক্‌খেল, গজনী	বর্ধমান- ১১.১২.১৯৫১
৩.	খান সৈয়দ	বাক্‌খেল, গজনী	বর্ধমান- ১১.১২.১৯৫১
৪.	মহম্মদি	মিলেজি,গজনী	বর্ধমান- ১৭.১০.১৯৫১
৫.	মহম্মদ শাহ	সারান, গজনী	বর্ধমান- ২০.১২.১৯৫১
৬.	বাহাউদ্দিন	গার্দেজ	বর্ধমান- ২২.১২.১৯৫১
৭.	রহমাতুল্লা	বাক্‌খেল, গজনী	বর্ধমান- ১৬.১২.১৯৫১
৮.	খান খোদীর	খোর, গজনী	বর্ধমান- ১৬.১২.১৯৫১
৯.	খান সাহাবাজ	মটোয়াক, গার্দেজ	বর্ধমান- ১৬.১২.১৯৫১
১০.	আব্দুল রসিদ	বাক্‌খেল, গজনী	বর্ধমান- ১৬.১২.১৯৫১
১১.	খান আদম	বাক্‌খেল, গজনী	বর্ধমান- ১৬.১২.১৯৫১
১২.	খোবেল	মটোয়াক, গার্দেজ	বর্ধমান- ১৬.১২.১৯৫১
১৩.	মহম্মদ জাহির	বাক্‌খেল, গজনী	বর্ধমান- ১৬.১২.১৯৫১
১৪.	পিরদিল	বাক্‌খেল, গজনী	বর্ধমান- ১৬.১২.১৯৫১

**বিঃদ্রঃ: জলপাইগুড়ি জেলায় আরও ততধিক আফগান নাগরিকের তথ্য পাওয়া যায়।*

সূত্র: IB File No-236/1939 (16) Afghan National Burdwan

সংযোজনী: ৮. Speech by Prime Minister at the Parliament of Afghanistan

December 25, 2015

Your Excellency President Ghani
Your Excellency, Chief Executive Dr. Abdulla
Honorable Speaker of Wolesi Jigra and the Chairman of Meshraon Jigra
Distinguished Member of both Houses

Eight centuries ago, a famous son of Balkh Province, one of the greatest poets in human history, Jalaluddin Rumi, wrote, "Raise your words, not your voice. It is rain that gives flowers, not thunder". This is the wisdom of this magnificent land and a great nation. A land where legends are born – of poetry and beauty, of valour and honour, of pride and generosity, of the warmest embrace of friendship and the strongest resistance for freedom. And, in this century, the great Afghan people have waged an epic struggle of courage and resolve to shape their future with vote and debate, not gun and violence. A country with an abiding faith in the tradition of Jirga has chosen the path of democracy. And, it has done it against challenges that would have defeated a lesser people. It is a tribute to the countless, nameless Afghans who laid down their lives and sacrificed their future. To the leadership of former President Hamid Karzai Saheb, who led the nation with wisdom and determination from the dark days of despair to a future of hope. To President Ghani and CEO Dr. Abdullah for their vision and statesmanship that can only come from great patriots. To you, Members of Parliament, for braving violence to take your seat in this House in trust of Your People.

Honourable Members…..

So, I stand here, on behalf of 1.25 billion friends in India, in admiration for your achievements, in gratitude for your friendship and in solidarity for your future. And, today, I am humbled and honoured to join President Ghani and all the Members of the Afghan Parliament to dedicate this new abode of democracy to the Afghan nation.We could not have chosen a more special day than the birthday of one of the tallest leaders of our time, former Prime Minister and Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayeeji. Eleven years ago, he dreamt of this project in partnership with Karzai Saheb. And, we are deeply touched that you have chosen to name one of the wings in this building the Atal Block. This Parliament House brings together our two nations through the vision of our leaders, the labour of our people and the stones of our lands. And, the Atal block unites us in spirit, because Atal means hero in Pashto and in Hindi it means to be firm. It captures the spirit of Afghanistan and of our friendship. This Parliament Complex is a small tribute to your progress as a nation and a democracy. And it will stand as an enduring symbol of the ties of emotions and values of affection and aspiration that bind us in a special relationship.

Honorable Members…..

Our ties are as ancient as history. Over the mighty Hindu Kush and through the forbidding Khyber Pass, monks, merchants and monarchs have linked us through

knowledge, culture, religion, commerce and kingdoms. In the shifting contours of history, there were times we have been one. There were times we saw wars. But, through the ages, we have always enriched one another. In the timeless Buddhist symbols of Aynak and Bamian and in the majestic monuments of Delhi, in our culture and art, in language and literature, food and festivals, we see the imprint of our timeless relations. We owe to ancient Afghanistan the gift of one of the great characters of Mahabharata, Gandhari. In the achievements of Mauryan Empire or Shershah Suri, we see connectivity that we now aspire to rebuild. The words of poet Ahmed Shah Durrani may have expressed the longing of an Afghan King in Delhi, I forget the throne of Delhi, when I remember the mountain tops of my Afghan land. But, in the heart of every Indian and Afghan, there is boundless love for each other. We love each other's culture and cinema, music and poetry, food and festivals. And, now we admire each other's cricket. We are delighted that the Afghan National Cricket Team has found its home ground near Delhi and is practicing for next year's World Cup. And, I congratulate the Afghan under 19 team that just beat Zimbabwe in its first home series. We are just as proud that Afghans see India as a natural destination for education, health or a family home. Indians remember the support of Afghans for our freedom struggle; the contribution of Khan Abdul Gaffar Khan, revered as Frontier Gandhi; and, the important footnote of that history, when, exactly hundred years ago, the first Indian Government-in-Exile was formed in Kabul by Maharaja Mahendra Pratap and Maulana Barkatullah. King Amanullah once told the Maharaja that so long as India was not free, Afghanistan was not free in the right sense.

Honorable Members….

This is the spirit of brotherhood between us. And, when you began a new journey in a new century, we were proud to stand with you and walk with you. Our partnership has helped rural communities get schools, minor irrigation, health centers, and welfare for children and opportunities for women. Together, we have built roads that have brought regions closer; power transmission lines and power stations that light up Afghan homes; satellite links that bring education, medical advice and communication to Afghan people. And, we are helping the security forces become more mobile. The institutions we are establishing together are helping rebuild agriculture and mining in Afghanistan, and make advanced medical care available in Kabul. Nothing is more important for a nation than its human resources. So, we are pleased that our scholarships and training programmer are empowering Afghan youth with modern education and professional skills; Afghan government with resources to develop their country; and, the Afghan Security Forces with the capacity to secure their nation. Power and water will flow out of Salma Dam soon. The Store Palace will again stand as a symbol of your priceless heritage. Our scheme of 1000 scholarships every year for Afghan students in India will continue. We are pleased with the response to our special scholarship scheme in agriculture science. Today, I announce 500 scholarships for the children of the martyrs of Afghan security forces. As we have stood with you in our efforts to rebuild your country, you have guarded and protected our people as your own. We have faced daily threats, but we feel secure in your midst.

To Indian diplomats, officers, engineers and doctors, who serve here with pride, to the families of our Indian martyrs, I express the gratitude of Indians and Afghans. There are some who did not want us to be here. There were those who saw sinister designs in our presence here. There are others who were uneasy at the strength of our partnership. Some even tried to discourage us. But, we are here because you have faith in us. You never doubted the sincerity of our commitment and the strength of our friendship. And, you have seen the fruits of our partnership. You have judged us by what mysterious Indian consulates. You know that India is here to contribute not to compete; to lay the foundations of future, not light the flame of conflict; to rebuild lives, not destroy a nation. You know, as we do, that Indians and Afghans have always stood for each other, never against another. You have been at the crossroads of history. And, your history tells us that you will never let yourself become a theatre of competition; or serve the designs of others. For you live by the creed extolled by poet Kushal Khan Khattak that Nation's honor and nation's fame on life they have a prior claim. So, with your faith and at your pace, India will continue to build governance .We will do this from the responsibility that comes from our friendship. But, we also do this with a commitment to peace and stability in our region. We know that Afghanistan's success will require the cooperation and support of each of its neighbors. And, all of us in the region - India, Pakistan, Iran and others - must unite, in trust and cooperation, behind this common purpose and in recognition of our common destiny. When Afghanistan becomes a haven of peace and a hub for the flow of ideas, commerce, energy and investments in the region, we will all prosper together. That is why we are working to improve your connectivity by land and sea, including through Chahbahar in Iran. That is why I hope that Pakistan will become a bridge between South Asia and Afghanistan and beyond**.**

I hope that the day will come soon when energy from Central Asia will power prosperity in our region; when a Kabuliwala can once again come across easily to win Indian hearts; when we in India can relish the wonderful fruits of Afghanistan; when Afghans do not have to pay an enormous price to buy their favorite products from India. For this has always been the course of this region's history. And, it must be the path to its future. But, brave and tireless as the Afghans are in defending their nations, Afghanistan will succeed only when terrorism no longer flows across the border; when nurseries and sanctuaries of terrorism are shut; and, their patrons are no longer in business. Terror and violence cannot be the instrument to shape Afghanistan's future or dictate the choices Afghans make for, the fire that is lit in Afghanistan, can never be contained, within these boundaries. Afghans have the wisdom to seek peace with neighbors, but also the courage to defend their freedom. And, Afghans of all persuasions must have the right to seek peace among themselves. Too much blood has flown down Kabul River. Too many tragedies have darkened the mountain slopes. Too many dreams have burnt in the fire of a senseless conflict. You can be Pushtoons, Uzbeks, Tajiks, Hazaras. You can be Muslims, Hindus and Sikhs. But, you are proud Afghans who can come together as one nation and one people. You may have fought in the name of religion; or in the cause of identity. But, it is now time for Afghans to come together in peace. As a wise Afghan said, a tree with a bitter seed, Fed with butter and sugar, Will still

bear a bitter fruit. You have a glorious tradition of pluralism and respect for diversity and beliefs. Those waging war from outside must seek a path to this building and this hall. Those seeking territory through gun must seek power through ballot. Those who have destroyed homes must now rebuild their nation. For, this is your land and these are your people. And, it must be on your terms, on your genius, through your own process and your own spirit of brotherhood. Not driven by the calculations or ambitions of others. And, the future you build in peace and through dialogue must preserve the hard-won progress of the last decade and half. It must have a place for every Afghan. It must have space for everyone's aspiration. And, it must be a nation, where every citizen is secure of her rights and confident about her future. And, as Afghans take responsibility for their future, the world must stand with them in solidarity and support.

We must do that for the soldier from a foreign land who laid down his life in an Afghan village that he had never heard of and for a people he had never known; and, for the enormous sacrifices that Afghans have made for a life that others take for granted. We must support Afghanistan without time lines because the new clouds of extremism and terrorism are rising, even as the old ones continue to darken our skies; and, because Afghans are not only fighting for their future, but are standing up for all of us and a safer world. The world will be a better place when we can experience the real wealth of Afghan people in their diversity and rich heritage. It is time for all Afghans, everyone in the region and the rest of the world to come together. The sacrifices must not go in vain. The flame of hope should not die. No girl that steps into the world should slip into darkness of denied opportunities. No son should face the choice of gun or refuge in a distant land. No mother should fear bringing a child into this world. No leader should lose a brother because he spoke for Afghan freedom to choose friends. No one kneeling in prayer in a mosque should be killed in the name of religion. No elder should look back on his youth wasted in conflict, and see the same future for his grandchild. Every youth in Afghanistan should see a future in which IT stands for information technology, not international terrorism. For, the promise and the opportunities of the 21st century belong to Afghan youth as much as anyone else In the world. For India this is a deeply held commitment.

Your suffering is our pain. Your dreams are our duty. Your strength is our belief. Your courage is our inspiration. Above all, your friendship is our honor. And, as Hindi cinema's most famous Pathan character, Sher Khan in Zanjeer sang, Yaari haii man mera, Yaar meri zindangi. Friendship is my faith, the friend is my life. This is the creed of Afghans and Indians. I am confident that Hope will return to your homes, Laughter in your schools, Life in your streets Prosperity in your cities unity in your society and, peace in your nation. And, at every step of your journey, India will be with you. Thank you. Thank you again for this great honor and privilege.

Thank You.

সূত্র: Speech by Prime Minister at the Parliament of Afghanistan (December 25, 2015)

সংযোজনী: ৯. Speech by the President of India Shri Pranab Mukherjee at the Banquet in Honor of the President of the Islamic Republic of Afghanistan, H.E. Mr. Hamid Karzai.

Rashtrapati Bhavan,
New Delhi: 12.11.2012

Your Excellency, President Hamid Karzai, President of the Islamic Republic of Afghanistan,

Ladies and gentlemen,

It is a great pleasure to extend to Your Excellency and the distinguished members of your delegation, a warm welcome on your State Visit to India. I am particularly happy to have this opportunity to renew my personal association with you.

India and Afghanistan are bound by age-old neighborly ties of warmth and abiding people-to-people relations. These have been renewed in modern times by our shared experience of nation-building and development. Our common values and our search for peace have brought us together in a strategic partnership to face the common challenges. Our past, present and future bind us together. Our shared and overlapping heritage is our strength. A large number of Indians are familiar with Afghanistan through the tender story of the 'Kabuliwala', immortalised in the writing of Nobel Laureate Rabindranath Tagore. Earlier today, you delivered an inspiring speech on Maulana Abul Kalam Azad, a towering nationalist leader of India, who is a source of inspiration for both our nations.The oldest verses of the Rig Veda make references to rivers and towns in the region that is today Afghanistan. Kings, travellers, scholars, and traders in the course of our history have come to India through Afghanistan. Many of the Sufi traditions, which are so popular in India, originated from Afghanistan. The spiritual legacy of poet Jalaluddin Rumi who was born in Balkh, transcends national and ethnic borders. Gandhara sculptures are a part of our rich heritage. Some of the most popular personalities in our film and music world have ancestral linkages to your land.

Your great nation, which has long epitomised bravery and nobility, has been afflicted in recent decades, with threats to its security and by extremism and terrorism imposed from beyond its borders. Through those difficult years, the people of India have empathised with the pain of their Afghan brethren. We share your sense of grief when we hear of incidents like the suicide attacks against a mosque during the Eid festival recently or during the Ashura last December in Kabul. We rejoice with you in the significant achievements that have been made under your leadership in the past ten years. We also recognise the challenges that remain, and hope that our shared conviction and faith in peace and progress would help us defeat terrorism and uncertainty. We both agree on the need for greater international cooperation against terrorism, especially cross border terrorism emanating from the terrorist sanctuaries.

India firmly believes that sustainable peace can be achieved through sound economic development in an environment of stability. I recall my visit to Afghanistan in January

2009 to inaugurate, together with you, the highway between Zaranj and Delaram. India's other development initiatives in Afghanistan are aimed at assisting the Afghan Government in increasing the capacity of the Afghan government and people to stand on their own feet and to be the makers of their own destiny. We are committed to completing the new Parliament building in Kabul, the Salma Dam in Herat, the two additional sub-stations on the electricity transmission line to Kabul - to name just a few examples. We are pleased at the popularity of the educational scholarships extended to Afghan students. We will continue to partner Afghanistan in its reconstruction and development, based on the needs and requirements of your Government and your people, and, of course, our own capacities. We are ready to join hands with other countries in making Afghanistan a focal point of cooperation in development.

We have recognized that an active development partnership between our governments is not enough and it needs to be supplemented by nation-building and stronger people-to-people links. In this context the Strategic Partnership Agreement, signed during your historic visit last year, lays stress on developing private trade and investment, regional cooperation, and encouraging linkages between our Parliamentarians, intellectuals, youth, cultural groups, civil-society organizations, and students. In particular, the closer economic integration of Afghanistan with the rest of the region can provide not only a vast and growing market for your goods and services, but can also be a source of capital, technology, best-practices and institutions that are appropriate for Afghan needs. Afghanistan can indeed emerge as a hub of regional cooperation binding us in common endeavors.

India stands beside the Afghan people to strengthen their hands in bringing peace and prosperity to their great country. India would always be there to assist the friendly people of Afghanistan and to further strengthen and deepen our strategic relationship.

With these words, May I request you to join me in raising a toast:

- to the good health and personal well-being of His Excellency President Hamid Karzai;

- to the progress and prosperity of Afghanistan and its friendly people; and

- to the abiding friendship and co-operation be+tween India and Afghanistan.

সূত্র: Rashtrapati Bhavan, New Delhi : 12.11.2012

সংযোজনী: ১০. PMO Office English rendering of PM's address at the convocation of VisvaBharati University at Santiniketan in West Bengal

Posted On: 25 MAY 2018 5:09PM by PIB Delhi

Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina, present on the stage, Governor of West Bengal Mr. Keshari Nathji Tripathi, Chief Minister of West Bengal Ms Mamata Banerjee, Vice-Chancellor of Visva Bharati Professor Sabuj Kali Sen and Vice-Chancellor of Ramakrishna Mission Vivekananda Institute Swami Swamyapriyanand ji, everyone present here from Visva Bharati and my dear young friends,

As the Chancellor of Visva Bharati, first of all I apologize to all of you because on the way to the university some children were pointing out to me that they didn't even have access to drinking water. As the Chancellor of the University it's my responsibility to ensure that you are not inconvenienced. Therefore, I beg your pardon for the inconvenience caused to you. Being the Prime Minister, I have had the opportunity to participate in the convocation of several universities of the country. In most of the cases I was present there as a guest. But today I am not a guest here but the Chancellor. My role here is a result of democracy. I am the Chancellor due to the post of Prime Minister. This democracy is in itself a master that is inspiring more than 125 crore Indians in different ways. Every person who is nurtured and educated by the values of democracy is helpful in building a better India and a better future. We have been told that आचार्यत विद्याविहिता साघिष्ठतम प्राप्युति इति which means that one cannot attain education, excellence and success without going to a teacher. I am really fortunate to have got the opportunity of spending some quality time with so many teachers on the holy land of Gurudev Rabindranath Thakur.

Just like one can feel the power of mantras in a temple, I am experiencing a similar energy in the Viswa Bharati University. While I was coming towards the stage after getting down from the car, I was wondering that once Rabindranath Tagore had stepped on every part of this land. He must have penned down his words sitting here. He might have hummed his music somewhere here and might have held long conversations with Mahatma Gandhi here. He might have explained the meaning of life, nation and self-respect of the nation to his students. Friends……….

Today we have gathered here to follow a tradition. Amarkunj is a witness to several such events for the past century. One phase of whatever you have learnt over the past several years will conclude today. I want to congratulate all the recipients of the degree. My best wishes to them for their future endeavors. This degree is the proof of your educational qualification. Therefore, it is significant in this regard. However, you have achieved not only the degree but also the priceless learnings. You are the heir of a rich heritage. You are associated with a Guru-Shishya tradition which is both ancient and modern.

In the *Vedic* and *puranic* era, Sages had nurtured this tradition while in the modern era, it was carried forward by great personalities like Gurudev Rabindranath Tagore. This is not just an address but a great message for you all. This is an example of how nature teaches us to be a good human being or a nation. This is the expression behind this wonderful organization and the great idea of Gurudev Rabindranath Tagore which became the cornerstone of Viswa Bharati.

Brothers and sisters,

यत्र विश्वम भवेतेक निरम। This means that the entire world is a nest or a house. This teaching of the Vedas has been made the essential message of Viswa Bharati by Gurudev. The essence of India's rich tradition is hidden in this *Veda Mantra*. Gurudev wanted this place to be a proclamation which the whole world would make its home. The nests and homesteads are given equal importance where the entire world can be accommodated. This is what Indianness is. This it is the mantra of 'Vasudhaiva Kutumbakam' which has been echoing from the land of India for the past thousands of years. Gurudev had devoted his entire life to this mantra.

Friends, The Vedas and Upanishads were as relevant even 100 years back when Rabindranath Tagore had come to Shantiniketan as they were thousands of years ago. These are even relevant today for dealing with the challenges of the world in the 21st century. It is true that today nations are confined within political boundaries. However, it is also a fact that the great traditions of this land have spread in the form of globalization. Today, Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina ji is also present among us. It is a rare occasion as the Prime Ministers of two countries are present in the same convocation. India and Bangladesh are two nations but our interests lie in co-ordination and cooperation with each other. We can learn a lot from each other whether it is about culture or public policy. For example, the Bangladesh Bhawan which will be inaugurated by both of us shortly. This building is also a reflection of Gurudev's vision.

Friends,

At times, I am surprised when I see that not only Gurudev's personality, but also his travels were extensive. During my foreign tours, I meet many people who tell me that several years ago Tagore had visited their country. In those countries today, Gurudev is still remembered with great love and respect. People try to associate themselves with Tagore.

In Afghanistan, every Afghan keeps mentioning about the story of Kabuliwala with great pride. Three years ago when I went to Tajikistan, I had got the opportunity to inaugurate a statue of Gurudev. I can never forget the respect that people had for Gurudev there.

In many universities of the world Tagore is still a subject of study. There are chairs named after him. It won't be wrong to say that Tagore was and is still a global citizen. On this occasion, I am really eager to tell you about the relation he had with Gujarat. Gurudev had a special relationship with Gujarat. His elder brother, Satyendranath Tagore was the first Indian to join the civil services. He had stayed in Ahmedabad for

a long time. Most probably he was the Commissioner of Ahmedabad. I had read somewhere that before leaving for England, Satyendranath ji had taught his younger brother English for six months in Ahmedabad only. Gurudev was only 17 years old at that time. During that period, Gurudev had written some important parts of his popular novel 'Khudito Pashan' and a few poems in Ahmedabad. In a way, every corner of the country including Gujarat had played some or the other role in the emergence of Gurudev at the global front.

Friends,

Gurudev believed that every person is born to attain some goal. Education plays a crucial role in making every child capable in order to reach their goals. We can get a glimpse of the kind of education he desired for children in his poetry 'power of affection'. He used to say that education is not the only thing which is imparted in schools. Education is a balanced development of every aspect of a person which cannot be tied to time and place. And that's why Gurudev always desired that Indian students were well-acquainted with what was happening in the external world; how many people lived in other countries; what were their social values, their cultural heritage and so on. He always insisted upon knowing these things. However, at the same time he insisted that one should not forget one's Indian culture. I was told that once he had explained this aspect through a letter to his son-in-law who had gone to study agriculture in America. He had written to his son-in-law that studying agriculture was not enough and meeting the local people was also a part of education. He further wrote that if in the process of knowing the people he started losing his identity then he should keep himself locked inside the room.

In the Indian National Movement, Tagore ji's educational and Indian philosophy became a distant one. His life was an integral part of national and global ideas, which have been part of our ancient traditions. This was also one of the reasons that he created a separate world of education in Visva-Bharati here. Simplicity is the basic principle of education here. Classes are still run under the trees in the open air. There is a direct interaction between man and nature. All the dimensions of human life including music, painting, theatre and acting are being nurtured in the lap of nature. I am glad that this institution is continuously moving towards fulfilling the dreams with which its foundation stone was laid by Gurudev. His efforts to combine education and skill development and for uplifting the standard of life of common man is commendable. I have been told that you are working together to develop almost 50 villages here. My hopes and ambitions expanded when I was told about this effort. Hope grows with work. Since you have done so much my expectations from you have also raised slightly.

Friends,

This institution will complete its 100 years in 2021. You can expand your efforts from 50 villages to 100 or 200 villages in the next 2-3 years. It's my request to you all to sync your efforts to the needs of the country. For example, you can make a resolution that by the centenary of the institution in 2021, you will develop 100 villages that will have electricity connections in every household, gas connection and toilets, mothers and

children will be fully immunized and people will be educated about digital transactions. They will be aware of common Service centers and the way to fill up online forms.

You must be well aware of the fact that gas connections provided under Ujjwala scheme and toilets built under Swachh Bharat Mission are meant for easing the lives of women.

Your efforts in the villages, worshippers of Shakti, will work to empower women on this land. Besides, efforts can also be made to turn these 100 villages into nature-loving or nature- worshipping villages. Just like you are working for the preservation of nature, these villages will also become part of your mission. These villages should carry forward the vision of water conservation through adequate arrangements for water storage. Air pollution can be prevented by avoiding the use of firewood. Soil can be conserved by using organic fertilizer keeping cleanliness in mind. Gobar Dhan Yojana of the Government of India can be used to chieve this. You can complete all that work by making a check list.

Friends,

Today we are facing different types of challenges. 125 core Indians have vowed to build a New India by 2022 that will mark 75 years of independence. Education and institutions of education like this one play significant role in the pursuit of this resolution. Young people from such institutions give new energy and direction to the country. Our universities are not just educational institutions. Efforts are going on to ensure their active participation in social life.

Under Unnat Bharat Abhiyan, the universities are being linked to the development of the villages. In line with Gurudev's vision, the central government is constantly working to strengthen our education system according to the needs of New India. A new scheme called Revitalizing Infrastructure and System in Education i.e. RISE has been announced in this year's budget. Under this, one lakh core rupees will be spent in the next four years to improve the education system of the country. Global Initiative of Academic Network was also started. Through this, the best teachers of the world are being invited to teach in Indian institutions. With an investment of one thousand crores, Higher Education Financing Agency has been created to provide adequate facilities to educational institutions. This will help the major educational institutions to invest in high quality infrastructure. 2400 schools across the country have been selected to shape the innovative mindset of the children at an early age. In these schools, we are focusing on students from class 6 to 12 through Atal Tinkering Labs. These labs with modern technology are being introduced to children.

Friends,

Your institution is a living example of innovation in education. I would wish that more than 11000 students of Visva-Bharati should avail maximum benefits out of the schemes introduced for promoting innovation. You are all passing out from this Institution. With the blessings of Gurudev, you have received a vision. You are carrying the identity of Viswa Bharati with you.

I would urge you to carry on with your efforts to elevate its pride. The people will salute this Institution when they will hear about its students who would change the lives of 500-1000 people through innovation.

Remember, what Gurudev had said, "Jodi Tor daak shune keu na ashe tabe ekla chalo ray". If no one is ready to walk with you, keep going alone towards your goal. But today I have come here to tell you that if you take one step, the government is ready to move four steps with you. Public participation will only take our country forward to the desired 21st century of which Gurudev had dreamt.

Friends,

Gurudev had told Gandhiji sometime before his death that Visva Bharti is the ship where the most precious treasure of his life remains. He hoped that all of us, the people of India, would cherish this precious treasure. So, it's the responsibility of all of us to not only preserve this treasure but also to enrich it. May Viswa Bharati University keep showing new ways to the world along with the dream of New India? With that I end my speech. Thank you very much. May you fulfil your dreams along with the dreams of your parents, this institution as well as the country? Best wishes to you all! Thank you very much!

সূত্র: English rendering of PM’s address at the convocation of Visva Bharati University at Santiniketan, west Bengal, May 25.2018 by PIB Delhi.

সংযোজনী: ১১. ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো আমন্ত্রণ বার্তায় কাবুলিওয়ালা প্রসঙ্গ।

The President of India | Shri Ram Nath Kovind

सत्यमेव जयते

Press Releases

CHIEF EXECUTIVE OF AFGHANISTAN CALLS ON THE PRESIDENT

Rashtrapati Bhavan : 28.09.2017

Dr. Abdullah Abdullah, Chief Executive of the Islamic Republic of Afghanistan, called on the President of India, Shri Ram Nath Kovind, at Rashtrapati Bhavan today (September 28, 2017).

Welcoming Dr. Abdullah to India, the President said that India considers him a very close friend. We admire the selfless leadership that he has given Afghanistan through difficult times.

The President said that India considers Afghanistan not just a strategic partner, but a country very close to our hearts. People to people exchanges have provided a very strong foundation to India-Afghanistan relations. Rabindranath Tagore's 'Kabuliwala' resonates in the heart of every Indian. Every Indian instinctively trusts a person from Kabul.

The President said that a new development partnership between India and Afghanistan has been announced earlier this month. Both sides are embarking on new generation development projects aimed at supporting socio-economic development in Afghanistan. India will continue to support Afghanistan in all possible ways.

The President said that India deeply respects the supreme sacrifice made by the Afghan National Defence and Security forces to fight the forces of terror. We are indebted to them for ensuring security of Indians and of our Mission and Consulates in Afghanistan. India strongly condemns the acts of cross border terror perpetrated against the people of Afghanistan. There is no doubt that the people of Afghanistan have suffered for a long time. Generations have been lost to terrorism. We empathise with their yearning for peace. We stand with the Government and people of Afghanistan in their quest for peace, stability and prosperity.

This release issued at 1855 hrs.

সূত্র: The President of India, Rashtrapati Bhaban, Press Release 28.09.2017

সংযোজনী: ১২. অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের পক্ষ থেকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে পাঠানো চিঠি।

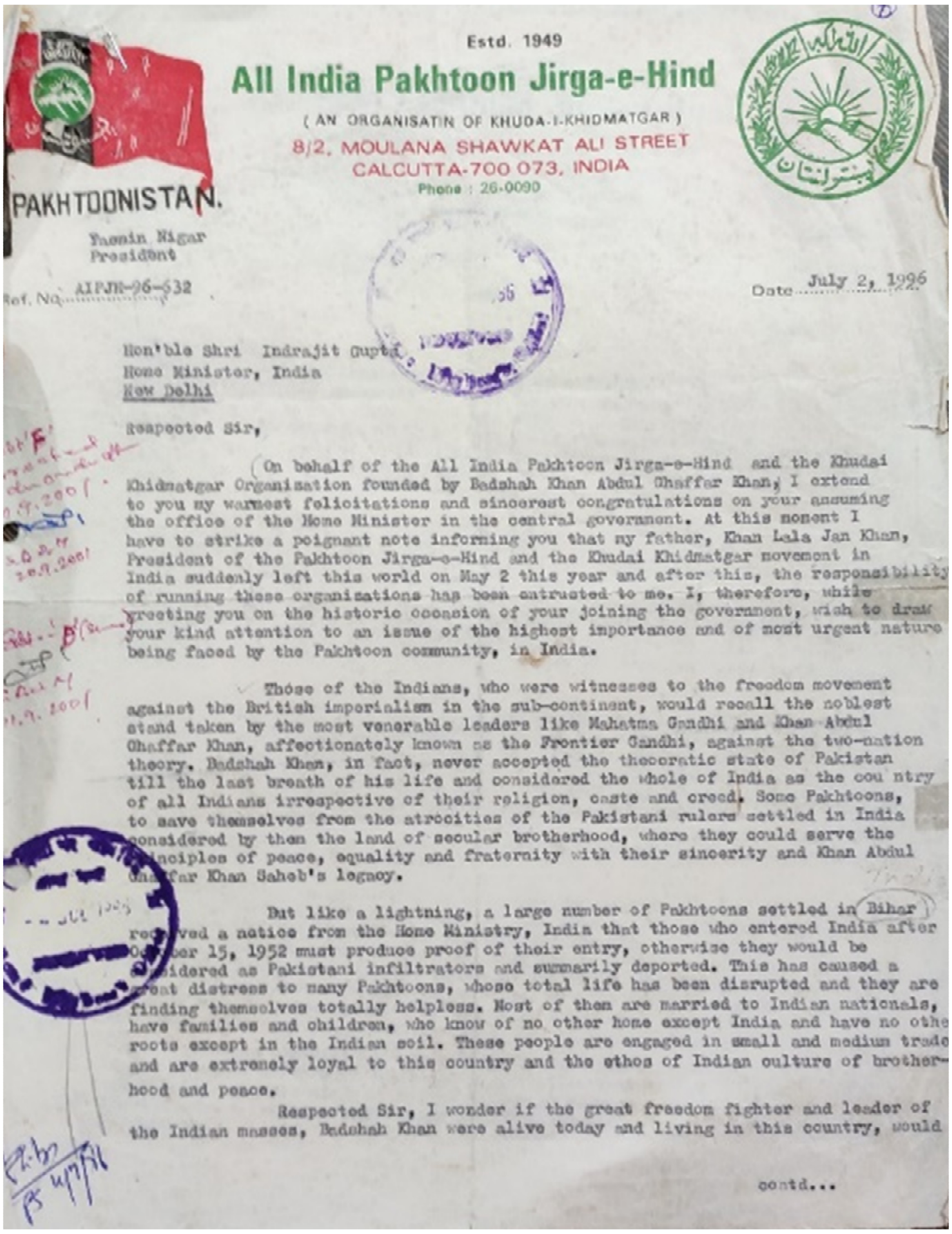

Estd. 1949

All India Pakhtoon Jirga-e-Hind

(AN ORGANISATIN OF KHUDA-I-KHIDMATGAR)

8/2, MOULANA SHAWKAT ALI STREET
CALCUTTA-700 073, INDIA
Phone : 26-0090

PAKHTOONISTAN.

Yasmin Nigar
President

Ref. No. AIPJH-96-632

Date July 2, 1996

Hon'ble Shri Indrajit Gupta
Home Minister, India
New Delhi

Respected Sir,

On behalf of the All India Pakhtoon Jirga-e-Hind and the Khudai Khidmatgar Organisation founded by Badshah Khan Abdul Ghaffar Khan, I extend to you my warmest felicitations and sincerest congratulations on your assuming the office of the Home Minister in the central government. At this moment I have to strike a poignant note informing you that my father, Khan Lala Jan Khan, President of the Pakhtoon Jirga-e-Hind and the Khudai Khidmatgar movement in India suddenly left this world on May 2 this year and after this, the responsibility of running these organisations has been entrusted to me. I, therefore, while greeting you on the historic occasion of your joining the government, wish to draw your kind attention to an issue of the highest importance and of most urgent nature being faced by the Pakhtoon community, in India.

Those of the Indians, who were witnesses to the freedom movement against the British imperialism in the sub-continent, would recall the noblest stand taken by the most venerable leaders like Mahatma Gandhi and Khan Abdul Ghaffar Khan, affectionately known as the Frontier Gandhi, against the two-nation theory. Badshah Khan, in fact, never accepted the theocratic state of Pakistan till the last breath of his life and considered the whole of India as the cou ntry of all Indians irrespective of their religion, caste and creed. Some Pakhtoons, to save themselves from the atrocities of the Pakistani rulers settled in India considered by them the land of secular brotherhood, where they could serve the principles of peace, equality and fraternity with their sincerity and Khan Abdul Ghaffar Khan Saheb's legacy.

But like a lightning, a large number of Pakhtoons settled in Bihar received a notice from the Home Ministry, India that those who entered India after October 15, 1952 must produce proof of their entry, otherwise they would be considered as Pakistani infiltrators and summarily deported. This has caused a great distress to many Pakhtoons, whose total life has been disrupted and they are finding themselves totally helpless. Most of them are married to Indian nationals, have families and children, who know of no other home except India and have no other roots except in the Indian soil. These people are engaged in small and medium trade and are extremely loyal to this country and the ethos of Indian culture of brotherhood and peace.

Respected Sir, I wonder if the great freedom fighter and leader of the Indian masses, Badshah Khan were alive today and living in this country, would

contd...

সূত্র: ইয়াসমিন নিগার খানের থেকে গবেষকের নিজের সংগৃহীত, (কলকাতা, ১৫.০৯.২০২১)।

সংযোজনী: ১৩. কলকাতার পাখতুন জনগোষ্ঠীর সমস্যার বিষয়ে তৎকালীন সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধায় উপ-প্রধানমন্ত্রী এল.কে. আডবানিকে পাঠানো চিঠি।

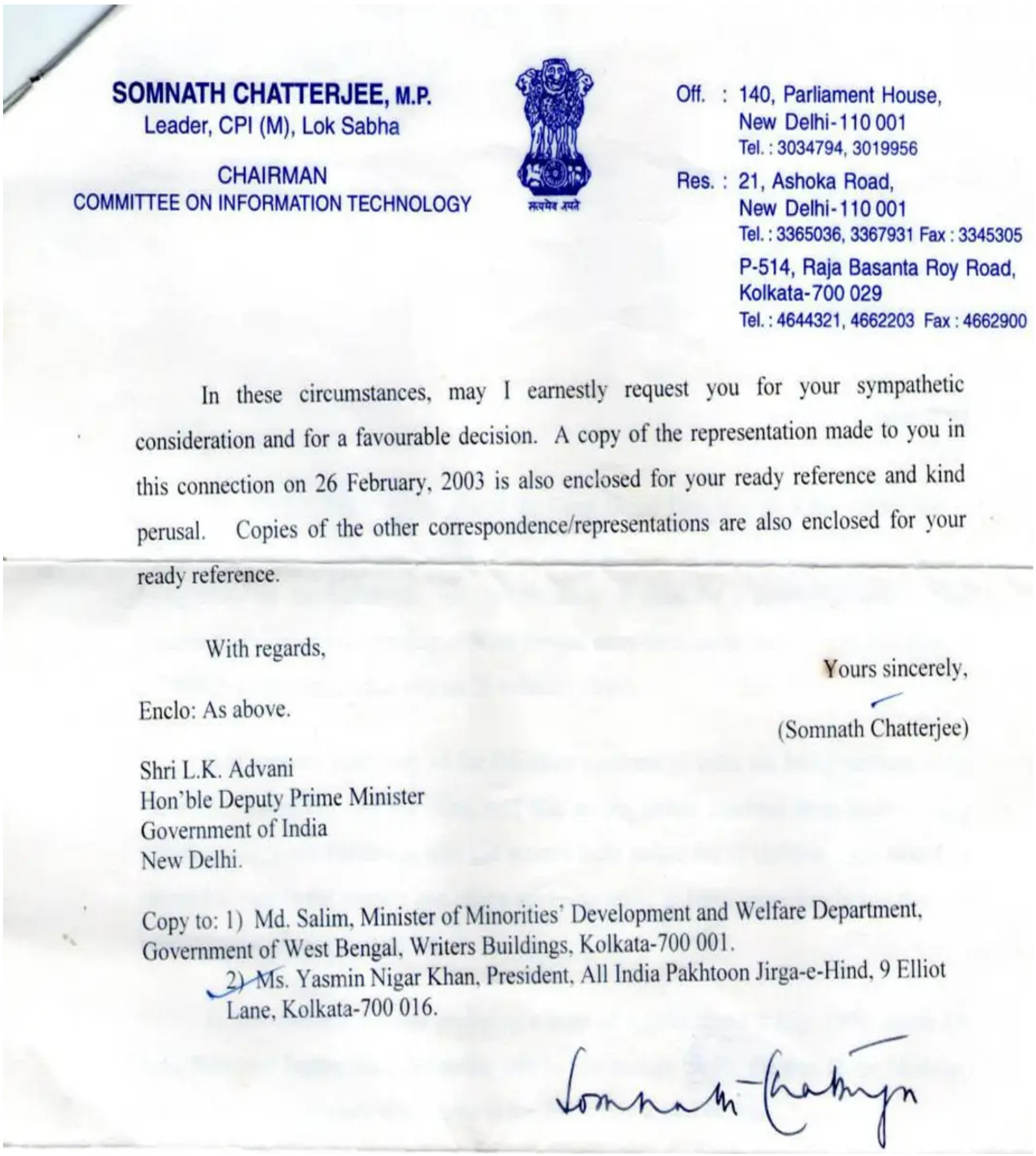

SOMNATH CHATTERJEE, M.P.
Leader, CPI (M), Lok Sabha

CHAIRMAN
COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY

Off. : 140, Parliament House,
New Delhi-110 001
Tel. : 3034794, 3019956

Res. : 21, Ashoka Road,
New Delhi-110 001
Tel. : 3365036, 3367931 Fax : 3345305

P-514, Raja Basanta Roy Road,
Kolkata-700 029
Tel. : 4644321, 4662203 Fax : 4662900

In these circumstances, may I earnestly request you for your sympathetic consideration and for a favourable decision. A copy of the representation made to you in this connection on 26 February, 2003 is also enclosed for your ready reference and kind perusal. Copies of the other correspondence/representations are also enclosed for your ready reference.

With regards,

Yours sincerely,

(Somnath Chatterjee)

Enclo: As above.

Shri L.K. Advani
Hon'ble Deputy Prime Minister
Government of India
New Delhi.

Copy to: 1) Md. Salim, Minister of Minorities' Development and Welfare Department, Government of West Bengal, Writers Buildings, Kolkata-700 001.
2) Ms. Yasmin Nigar Khan, President, All India Pakhtoon Jirga-e-Hind, 9 Elliot Lane, Kolkata-700 016.

সূত্র: ইয়াসমিন নিগার খানের থেকে গবেষকের নিজের সংগৃহীত, (কলকাতা, ১৫.০৯.২০২১)।

সংযোজনী: ১৪. পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রেরিতপত্র অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের সভানেত্রী ইয়াসমিন নিগার খানকে।

মমতা ব্যানার্জ্জী
ममता बैनर्जी
ممتا بنرجی
Mamata Banerjee

सत्यमेव जयते

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
مغربی بنگال وزیراعلیٰ
CHIEF MINISTER, WEST BENGAL

15th May, 2012

MESSAGE

I am glad to know that All India Pakhtoon Jirga-E-Hind, led by Ms. Yasmin Nigar Khan, the great grand daughter of Frontier Gandhi, is going to launch a social work organisation for the development of women & children on 26th May, 2012 in Kolkata.

I felicitate Ms. Khan for such philanthropic initiative taken in the name of Badsha Khan and Khudai-Khidmatgar movement in India.

(Mamata Banerjee)

Ms. Yasmin Nigar Khan,
Presidsent,
All India Pakhtoon Jirga-E-Hind,
4/1, Karim Hossain Lane,
Circus Avenue,
Kolkata – 700017.

Writers' Buildings, Kolkata-700 001, West Bengal, India
Tel : 0091-033-22145555, 0091-033-22143101, 0091-033-22145587
Fax : 0091-033-22141137, 0091-033-22143528

সূত্র: ইয়াসমিন নিগার খানের থেকে গবেষকের নিজের সংগৃহীত, (কলকাতা, ১৫.০৯.২০২১)

সংযোজনী: ১৫. ১৯৬৯ সালে ১৭ ই আগস্ট দ্যা কাবুল টাইম’সে কাবুলিওয়ালা শিরোনামে প্রকাশিত খবর।

Balkh is proud of literary figures like Rabia, Rumi

By E. von Schuh

Rabia Balkhi was the first woman of the Islamic period who composed poems in Persian. Born and brought up in Balkh, she knew Arabic and wrote poems in both languages.

She was, however, not the only famous writer that originated from Balkh and its area. From the 10th century onwards we find many illustrious names mentioned in the history of Persian literature.

Najib Ullah gives a very interesting explantion for this fact: "Most of these poets, like the early ones of the 9th century, lived in the eastern part of the Iranian Plateau or the territories of Afghanistan.

These territories, situated farther than Persia from the Arabic-speaking world, proved to be more favourable grounds for the development of Persian poetry and prose".

I would like to mention a few more of these writers, as you may come across their names studying history and culture of our host land.

Abu Shukur was a poet philosopher of the Samanid Period. One of his poems is the translation of a saying of Socrates:

"My knowledge has reached the stage,
Where I know that I am ignorant".

Abul Mu'ayyed of Balkh was a famous poet and prose writer of the time. He was the first author of the Iranian legendary history Shah Nama "The Book of Kings", in Dari Prose. About the middle of tenth century, Daqiqi, attempted to compose the epics of Iran—The Book of Kings. Amongst his sources were probably, Abdul Mu'ayyed and Abu Ali both of Balkh. There is no doubt that Firdausi was inspired by the work of Daqiqi, to compose his world famous Shah Nama or Book of Kings.

Unsuri (d. 1050) was the son of a wealthy merchant of Balkh. He devoted the latter part of his life to studies and literary pursuits and became one of the greatest pane gyrists in the Persian language.

Nasir Khusru, (1003-60) came from Qubadiyan in Balkh. He was one of the greatest prose writers of his time but also composed about thirty thousand verses. Eleven thousand of his verses still exist. Famous is his "Nostalgia for Balkh" translated below:

O, evening breeze, if you pass over Balkh,
Go to my home and inquire about it.
See what happened to my country
And what this world of injustice and evil did to it.
I fear that the times have destroyed
Its beautiful gardens and houses.
See if my brother is dying.
Or if he is attached to me as before.

The great literary period of Balkn closes with her great son Maulana Jalal-uddin Rumi. He was born in 1207 in Balkh, into a scholarly and aristocratic family.

His father, Baha-uddin, was a mystic and scholar, and he served as his son's first teacher. In 1219, a year before the Mongol invasion which forever destroyed Balkh's glory, Baha-uddin left Balkh with his family, and settled permanently in Konya, central Anatolia. Jalal-uddin was certainly the greatest Mohmmadian mystic.

He believed in the "oneness of existence", in love and purification as the sole way to attain God, in justice and equality in the world, and in tolerance of other creeds. He believed in the immortality of the soul and the continuity of life through which the soul of man ascends and reaches the "universal spirit" and is absorbed into it.

His most famous literary work is Masnawi, the greatest of Persian and perhaps Islamic mystical monuments.

Maulana Jalal-uddin died in 1273 and was buried in Konya. The 694th anniversary of his death was celebrated in Afghanistan on the 17th of December, 1967 and a road in Kabul is to be named after him. In Konya an avenue will be called Balkh avenue and in Balkh a street will be called Konya street.

Jalal-uddin Rumi's Masnawi begins as follows:

"Hear the song of the reed and hear its tale!

Complaining of the pain of separation,
It says: Since I was cut from my meadow of reeds,
Men and women have sighed through my songs,

Tearing my heart in pieces with the anguish of parting.
I desire to unveil the mysteries of passion;
Anyone separated from his origin
Wants to return to it.
I, too, have cried for it in all gatherings,
Accompanying the songs of the happy and the unhappy ones".

A group of Czechoslovak artists arrived here yesterday to give performances at the Speenzar camp during the 51st anniversa-ry of the country's independence.

500-member Comex-3 stops in Kabul on way to India

By Amin Saikal

Did they come here to camp, sing, play around and simply cause throngs of spectators to stand in front of the wall, adjescent to the Kabul Zoo?

Of course not! The main aim was to promote international understanding and build up a knowledge of how youth can serve the cause of peace in the world. Their presence couldn't help but boost our tourism industry, too.

We're talking about Comex-3, the third Commonwealth Expedition to travel from Britain to India with a Shakespearean pagaent and a variety show of songs and dances.

What make the comex-3 different from last year's comex-2 were not the shorter skirts that the young girls, mostly from 18 to 25, had on or longer hair or beards that characterised the boys of the team. It was the unexpected increase in their numbers.

This year graduates and undergraduates from all over Britain formed. Comex-3. Leaving Britain on July 15, after passing through and staying in many countries, Comex-3 made up of 500 students from different universities of Britain in 20 brand new English buses arrived in Kabul last Tuesday night.

Lack of enough place around Kargha lake made them split into two parts, the biggest one camping next to the Kargha lake restaurant, and the second part composed of four buses camping next to the Kabul Zoo.

Heading toward Karte Char, my eyes were suddenly captured right a few metres down from the Kabul Zoo, by a bunch of mini-skirted girls, carrying guitars, walking around the camping area with smiling faces.

I got a little nervous when I was offered the honour of having a chat with some of them, many of whom were in bikinis, though there wasn't any water around, or if there was any from the summer rain it was about to evaporate.

Since I couldn't talk to most of them there, one of them, while her shoulders were moving as the sound of a guitar was heard from the other tent next to hers, in a low voice said "Why don't you meet all of us down at Kargha tonight. We will have a talent show there".

Accepting her invitation, I went to Kargha at 8 p.m., where almost all were present, sleeping and awake. They were all in such a rush that one could believe that they were now preparing themselves for a London stage performance.

As whispers from the corners encouraged "Do your best, do your best," the lrfist group of singers appeared, followed by folk dancers and singers.

The commedy sketch presented by two young boys, was admired by the audience very much. It made the people not only laugh but also admire how skilled the two young men were.

Meeting one of the minis of Comex-3, I got a chance to tour the area, where 16 buses were camped.

"Oh, I haven't been able to hire an Afghan cook. We'd like to find out about Afghan dishes, I am sure, as I have heard that, they are delicioes", said a charming young lady, while she was distributing food to her friends.

"We have found roads in this country a big sign of achievements in development of communications in this country. We passed through several countries, but they didn't have as good highways as Afghanistan does" the girl and boy who accompanied me to the camping area said. They were both graduates of history from one of the London universities.

Talking about Afghanistan they both said, "We are highly impressed by this country, by its high mountains, roads, people and special hospitality. We'd like to visit this country again".

Comex-3 left Kabul for Pakistan and India early Thursday. They will be back to Kabul for a two or three day stop sometimes in mid-September.

Members of Comex-3 enjoy playing guitar up at Kargha.

KABULIWALA, KABULIWALA

By Nihad Adil

"Kabuliwala, Kabuliwala" cries the little girl Mini through the window and inquisitively asks what is there inside his bag. The Kabuliwala jokingly replies there is an elephant inside.

Thus a human relation grows up between the little child and the man from Kabul. The man who watches it, is no other person than Poet Tagore, the first Nobel prize winning poet of Asia.

He felt the father instinct of the Kabuliwala who had a daughter like his own Mina and whose fingerprint the simple man from Kabul carried with him. The feeling that he develops for the man comes out in his story "Kabuliwala".

Tagore was a poet of man, champion of peace and crusader for the oppressed and here we find Tagore, the poet, the philosopher the artist and novelist.

Tagore, was an idealist and his idealism was based on man alone. Living under the colonial yoke, British imperialism and in a world full of hatred Tagore tried to sing the song of love.

The great land to which he was born, has always been considered as a land of love where according to him,

The Afghans, the Moguls, the Sakas, the Huns,
All got absolved in one body.

The great creator bound all humanity together. This world is not for fatricidal conflicts, but to enjoy the mirth of the world and feel for fellow human beings. In Gitanjali, he sang.

I have had my invitation to this world's festival,
And thus my life has been blessed.
My eyes have seen, my ears have heard.

But in this world's festevity he was because of the cry of the oppressed. He sang.

Snakes are spreading venom all around.
Now the call for peace will be a great mockery.

Though he prayed to get his head bent to the feet of the All Mighty and he always prayed for peace, he was not always prayed for peace, he was not always for subservience. He truly believed that ultimate salvation of man lies in the submission to God. He also believed that salvation can not be brought without removing ignorance, poverty and fear. He cherished a world.

Where the mind is without fear and the head is held high,
Where knowledge is free,
Where world has not been brought into narrow domestic walls,
Where word comes from the depth of truth,
Where tireless striving stretches its crams towards perfection,

(*Gitanjali*)

This human perfection was everything in Tagore's works.

His hero man triumphs over all impediments, greed and hatred.

His drama Pakta Karbi showed how the basic goodness of man triumph over the evil. His character of Ananda Manikya in another drama shows how non-violence and love triumph over violence and hatred.

India was at that time in the midst of a non-violent struggle for freedom. Tagore believed the non violent struggle of his people would triumph over the brute strength of greedy colonial Britain.

Tagore's spiritualism, is very much reflected in his 'Sonar Tari', the golden boat. Tagore knew the ooat will sail for the other world, the world to which he can not escape going.

Rashi Rashi dhankata hola shara—
Lots of paddies have been reaped and now we must prepare to go home.
Then he sang:
Gaganey gargey megh ghana barashai,
Kule eka bashe achhi nahi bharasha . . .
Under the heavy rains the thunder flashes in the sky,
I am sitting alone on the shore and there is no hope.

This is actually the feeling of all mortals. This is not so much of supernatural feelings as the feelings of ordinary human beings.

The girl he sees in Kalimpong, or the Bengali middle class lovers like Amita and Labanya—all come out in his stories. If we read Tagore we read human beings around us.

Tagore was also a poet of nature. He felt the nature as a human being does feel. Like Wordsworth he tried to feel the impulse of life in nature. The vastness of Atlantic moved, the majestic Himalayas attracted him. He spent month after month ruising over the Padma.

The simple life of peasants would attract him. His beautiful bunglow is still there at Shilaidah in the Pakistani part of Bengal. He wanted to establish a relationship between man and nature. Possibly this led him to set up his famous Viswavarati University in a rural surrounding. Viswaravarati is today one of the greatest educational institutes of the planet.

Tagore's art also reflected human passions and love. In the Viswaravarati his nephew Abannindranath Thakur developed the greatest Indian school of art.

Tagore's works are constant companion of those who cherish peace and fraternity for man.

"These years can not be forgotten" Azimi says

"It was our long cherished dream to continue studies after graduating from a higher educational establishment in Kabul," said Azimi Nur Ahmad, who came to study in the USSR a few years ago, a post-graduate at the Baku Oil and Chemistry Institute named after Meshadi Azizbekov. We talked to him in the cosy room he shared with his countryman, post-graduate Mir Aobar, in the Institute's dormitory. The room was bright, the shelves were full of books and on the walls hung geological maps. When I visited the Afghan friends Azimi Nur Ahmad was correcting his thesis.

"How goes it?" I asked Nur Ahmad.

"Everything is fine," he said with a smile. "The thesis is almost ready, I expect to defend it this year. My friend Mir Aqbar has completed his thesis and is going to defend it in a month's time."

Azimi Nur Ahmad took from the shelf a bulky book with a brown cover. This is Mir Aqbar's thesis. Written on the title page are the words: "For the academic degree of Candidate of Geological and Mineralogical Sciences."

"We are both geologists," continued Azimi Nur Ahmad, and our work is devoted to the geology of ore deposits. Afghanistan is a mountainous country and is rich in ores. After we defend the theses we shall return home and devote ourselves to the prospecting for minerals needed by our country. As you can see the years spent in the Soviet Union studying were not in vain. We have a fine academic advisers well-known not only in Azerbaijan but beyond its confines—Academician Shamil Azizbekov. He and many other scientists helped us in our work on the theses. And not only the scientists. Many Soviet people we met these years have been very friendly to us Afghans and spoke with respect about our country. But you will hear many more interesting things from my friend, Mir Aqbar."

art & culture

2 one-act plays by KADS

Mrs. Glenda Kittrell with the Kabul Amateur Dramatic Society presented KADS' second production of the summer in the form of two one-act plays by Peter Shaffer, "The Private Ear" and "The Public Eye".

The two plays written some ten years ago have been performed in both New York and London. While the titles of the plays complement and balance each other and the themes portray the frustrations in people's lives, each play is an individual entity.

"The private ear belongs to Bob, convincingly played by Geoff Thomas, a quiet music lover who works as a clerk in a trading company but who has the desires and dreams of an artist and a philosopher. He regrets that he is so tired when he comes home at the end of the day from doing nothing at the office but filling out 16 invoices that he nas no energy to read, study and pull himself out of the torpor of his life.

He comes alive only when listening to symphonies and operas. He is moved by the passionate themes of the operas, and especially identifies himself with Benjamin Britten's hero Peter Grimes. Both have dreams and visions about what life should be like. When listening to music he is transformed into the conductor and it is then that he feels his soul pour out. He feels keenly his yearning to express himself but he doesn't know what is inside, and he doesn't know how to do it.

In contrast to him is his officemate Ted, a flippant young man with executive pretentions who has what his friend lacks, "drive" Ted has been asked to help with the dinner and the conversation with the girl who Bob has asked over for the evening. Bob thinks Doreen is also a music lover because he saw her at a concert, but she confides to Ted that she only went because her friend gave her the ticket. Ted thinks that operas in which people sing their conversation are silly and responds by putting his empty phrases to song, much to Doreen's delight.

Bob is disgusted with Ted who finally leaves in a huff. Bob tries to win Doreen's affections by sharing Madame Butterfly but his advances are rejected. In his frustration and rage at himself he wrathfully scratches the record. The lights dim to the thumping rhythm of the record's scar.

(Continued on page 4)

সূত্র: গবেষকের সংগৃহীত।

সংযোজনী: ১৬. মহাত্মা গান্ধি, খান আব্দুল গফফর খান, সরোজীনি নাইডু এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

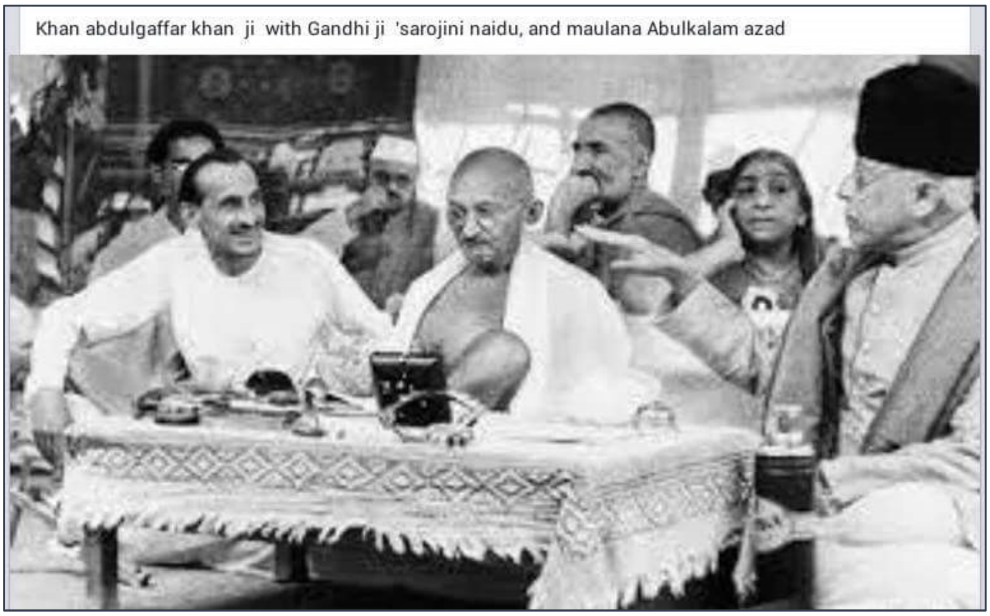

সূত্র: কাবুলিওয়ালাদের সংগঠনের নেতা আমির খানের থেকে গবেষক নিজে সংগ্রহ করেছেন। (কলকাতা, ২২.০৪.২০১৮)

সংযোজনী: ১৭. শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের প্রথম সভাপতি লালাজান খান এবং তাঁর সতীর্থরা।

সূত্র: গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা- ১৫.০৯.২০২১)।

সংযোজনী: ১৮. **কাবুলিওয়ালাদের নেতা আমির খান ও তাঁর সহযোগীরা পশ্চিমবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতির জন্য জ্যোতি বসুর হাতে অর্থ সাহায্য তুলে দিচ্ছেন।**

সূত্র: মিঃ আমির খানের থেকে গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা, ২২.০৪.২০১৮)

সংযোজনী: ১৯. **কলকাতার পাখতুন জনগোষ্ঠীর সভানেত্রী ইয়াসমিন নিগার খান ও তাঁর সহযোগীরা পশ্চিমবঙ্গে বন্যা কবলিত মানুষের সাহায্যার্থে জ্যোতি বসুর হাতে অর্থ সাহায্য তুলে দিচ্ছেন।**

সূত্র: মিস ইয়াসমিন নিগার খানের থেকে গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা- ১৫.০৯.২০২১)

সংযোজনী: ২০. ঈদের দিনে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নাচের দৃশ্য।

A group of Afghans dancing on Eid day

সূত্র: M.K.A Siddique: Muslims of Calcutta, (Kolkata, Anthropological Survey of India, September 1974)

সংযোজনী: ২১. 'কলকাতায় কাবুলিওয়ালী' নামক প্রদর্শনীতে আফগানি পণ্যের সমাহার।

সূত্র: কলকাতার হ্যারিংসন স্ট্রিটের কাবুলিওয়ালী (Kabuliwalee) প্রদর্শনী থেকে গবেষকের সংগৃহীত। (কলকাতা- ২২.০২.২০২০)

সংযোজনী: ২২. কলকাতার ময়দান প্রাঙ্গণে নামাজ পাঠরত অবস্থায় কাবুলিওয়ালারা।

সূত্র: গবেষকের সংগৃহীত, (কলকাতা- ২২.০২.২০২০)

সংযোজনী: ২৩. কাবুলিওয়ালা সুলতান খান দেখাচ্ছেন এখনও যত্ন করে রাখা আছে তাঁর মায়ের অর্ধশতাব্দী পুরানো একটি পোশাক।

সূত্র: কৃতজ্ঞতা স্বীকার-নাজেস আফরোজ এবং মোসকা নজিব, বিবিসি নিউজ বাংলা (২৪.০৫.২০১৫)

সংযোজনী: ২৪. কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ভারত সরকার কর্তৃক সুদের ব্যবসার জন্য লাইসন্স প্রদান।

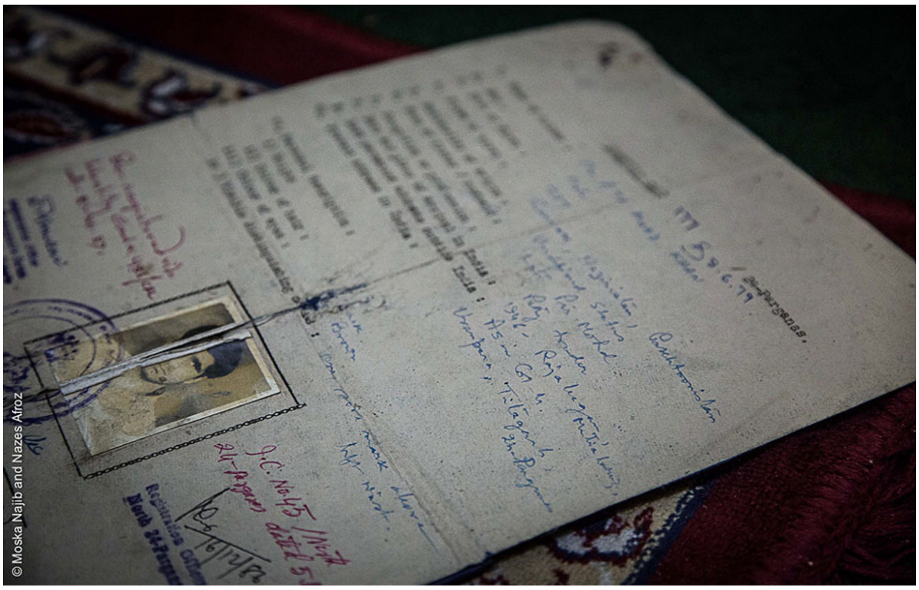

সূত্র: কৃতজ্ঞতা স্বীকার-নাজেস আফরোজ এবং মোসকা নজিব, বিবিসি নিউজ বাংলা, (২৪.০৫.২০১৫)

সংযোজনী: ২৫. খোদাই-খিদমদগরের প্রেসিডেন্ট আমির খান এবং তাঁর বাল্যকালের শিক্ষক হাফিজ মহম্মদ সৈয়দ।

সূত্র: গবেষকের সংগৃহীত (কলকাতা, ২২.০৪.২০১৮)

সংযোজনী: ২৬. বড়বাজারে দর্জির দোকানে কর্মরত নতুন প্রজন্মের দুই আফগান।

সুত্র: গবেষকের সংগৃহীত। (কলকাতা, ২২.০৪.২০১৮)

সংযোজনী: ২৭. কলকাতার খেলাফত কমিটির একটি অনুষ্ঠানে ইয়াসমিন নিগার খান।

সুত্র: গবেষকের সংগ্রহীত, (কলকাতা- ১৫.০৯.২০২১)।

সংযোজনী: ২৮. 'কাবুলিওয়ালি' প্রদর্শনীতে কাবুলের চিত্রকর মিঃ মহম্মদ ফারহাদ, এই ছবির মাধ্যমে কাবুলিওয়ালাদের ভারতে আগমনের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

সূত্র: 'দ্যা কাবুলিওয়ালী' প্রদর্শনী থেকে গবেষকের সংগ্রহীত, (কলকাতা- ২২.০২.২০২০)

মানচিত্র

১. ১৯১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর জনবিন্যাসের মানচিত্র

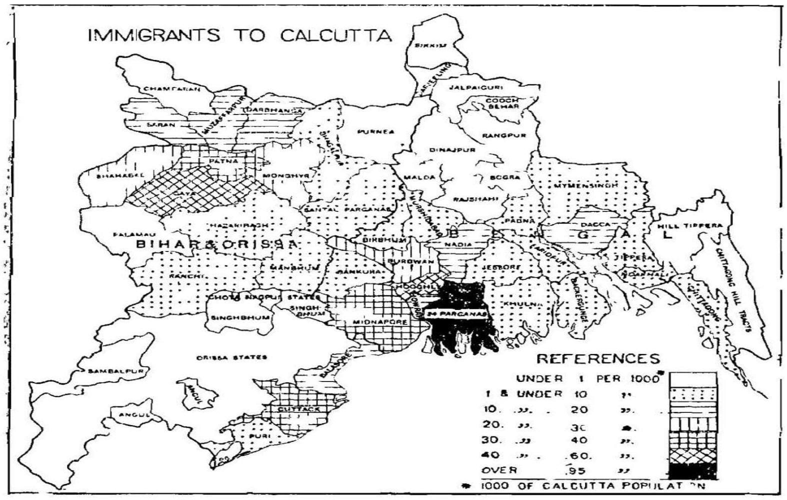

সূত্র: L.S.S O' Malley: *Census of India, 1911, vol. VI, City of Calcutta part-I*

২. ১৯১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর জনবিন্যাসের শতাংশের মানচিত্র।

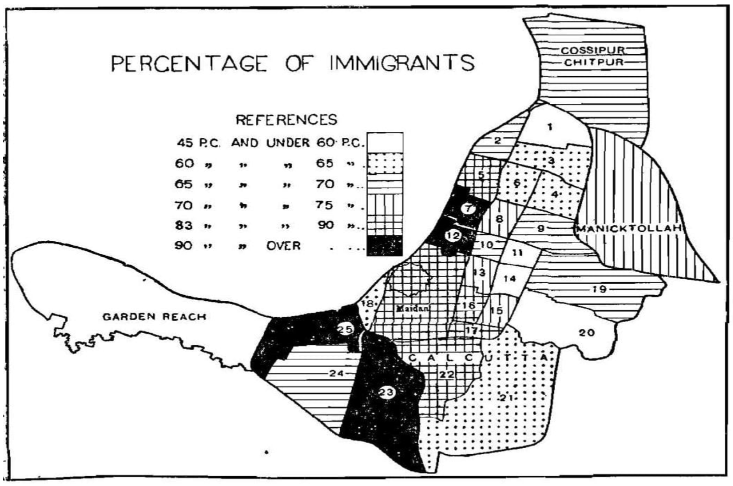

সূত্র: L.S.S O' Malley: *Census of India, 1911, vol. VI, City of Calcutta part-I*

৩. ডুরান্ড লাইনের মানচিত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: https://education.nationalgeographic.org/resource/durand-line/

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উপাদান

ইংরেজি

জাতীয় লেখ্যগার (National Archives of India)

File No- *5/1/49, Foreigners I Section,1949, Ministry of Home Affairs, Government of India, NAI.*

File No-*187-CO, 1937, Registers Branch, Political Department, NIA.*

File No- *102, April 1903, FB, FD, The kabuli Pest, The Englishman.*

File No- *31/10/49, Foreigners I Section, NAI, Transit visas En Route to East. Pakistan Granted to Indebted Kabul Afghan Moneylenders and Petty Traders.*

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যগার (West Bengal State Archives)

ক) রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের নথিপত্র (Intelligence Branch)

File No- *236/39(16c) Foreigners Afghan National in turn through India toEast Pakistan (Murshidbad).*

File No- *236/39(16) Afghan National in Murshidabad.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan Nastional in Mednipore.*

File No- *236/39(16F) Foreigners Passport Afghan National in throughout Mednipore East.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Calcutta.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in North 24 Parganas.*

File No- *236/39(16C) Foreigners Afghan National in transit through India to East Pakistan region North 23 Parganas.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in North 24 Parganas.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Malda.*

File No- *236/39(16C) Foreigners Afghan National in Malda.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Nadia.*

File No- *236/39(16C) Foreigners East Pakistan to Nadia.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Nadia.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Bankura District.*

File No- *236/39(16C) Foreigners Afghan National in transit through India – Jalpaiguri.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Jalpaiguri.*

File No- *236/39(16C) Afghan National in Dinajpur.*

File No- *236/39(16B) Foreigners Afghan National- Afghan National Entering into India via enter via Punjab.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Bhirbhum.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Darjeeling.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Hawrah.*

File No- *236/39(16) Foreigners Consulate office statical in Calcutta list.*

File No- *236/39(16 C) Foreigners Afghan National in transit thus India to East Pakistan-Report.*

File No- *236/39(16C) Afghan National in transit through India to East Pakistan Report.*

File No- *236/39(16C) Afghan National Refugee in India Quickly repair Reading.*

File No- *236/39(16E) Afghan National check or the movement of arriving in Bombay state with transit.*

File No- *236/39(16/1) Registration of foreign Act/ Registration of Foreign Rule.*

File No- *236/39(16B) Foreigners Afghan National.*

File No- *236/39(16D) Foreigners Afghan National enter into India from East Pakistan.*

File No- *236/39(16/9) foreign community Indian Consular office Appointment.*

File No- *236/39(Past-A) Registration of Foreigners- Engagement in Connection with Afghan National in Mednipore.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National Cooch Behar.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National Burdwan.*

File No- *236/39(16) Registration of the Foreigner Act/Registration of the Foreign Rule.*

File No- *266/22 List of Afghan Agent in India known or believed to being the Service of the Afghan government.*

File No- *45/23 Appointment by the general for Afghanistan in India of Certain to compile list of Afghan in India with particular regarding Business.*

File No- *1500/34 (Dup) Khan Abdul Gaffar frontier Gandhi.*

File No- *474/34 Explanation of the government of Afghanistan from payment of Fees for import licenses under the Indian explosive Rule.*

File No- *28/35 List of foreigners in India.*

খ) স্বরাষ্ট্র রাজনৈতিক দপ্তরের নথিপত্র (Home Political Confidential)

File- *12/A- 4, Progs- B 373-76 (May) Grant to hill allowance to sardar Abdul Aziz khan to proceed to the hills during -1937.*

File- *12A-1, progs 921-22 Afghan move to Sardar Abdul Aziz khan, An Refugee (1937 July-September).*

File- *12A-1, Progs B- 20-22 Annual Return of Refugee for 1937 (1938 January-March).*

File- *IC-10, progs B- 83 (January-March) Return of calls to Foreign in Calcutta.*

File- *10A-1, Progs B-462-65 (March-1954) Submission of Afghan Refugee residing in India.*

File- *10A-1, Progs 24-26(May) 1953(April-June) Submission of Annual return of Refugee residing in west Bengal for the year ending, 31st December 1952 to the Ministry of External Affairs, Govt. of India.*

File- *10A-2, Progs B- 56-57 (March), 1952(Jan-March) Annual return of refugee residing in Calcutta for the Vera ending 31st December, 1951.*

File- *7C- 22, Prog B- 52-56 (June) 1952(June April) Certificate given by the chief Secretary, Govt. of West Bengal to Janab Malik Bahlol Khan, Vakil of Afghan subject in India.*

File- *10A-3, Prog B-536-48 (3 years)1952(Oct- Dec) Restoration of Land belonging to Sardar Khan, son of Syad shah Khan, An National in West Bengal.*

File- *10A- 4, Prog B-202 (May) 1951(April-June) Allowance of Afghan Refugee in India.*

File- *10A-1, Prog-B 317-20 (May) 1951 (April-June) Annual return of refugee residing in India for the Year ending 31st December, 1950.*

File- *10A-1, Prog-B 306-308 (May), 1950 Annual return of Refugee residing in West Bengal for the Year ending the 31st December, 1919.*

File- *10A-1(Coll) of 1949, Prog 90-91(May)-1950 Return of refugee residing in Calcutta.*

সরকারী প্রকাশনা (Government and official Publication)

Beverley, H: *Report on the Census of Bengal 1872,* Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1872.

Cotton, H.E.A: *Calcutta Old and New,* Dalhousie Square, W. Newman and Company, 1907.

Elphinstone: *An Account of Kingdom of cabul and its dependence in Persia, Tartary and India,* London, Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown and J.Murray, 1815, p.359.

Father Jems Long, Reverond: *Calcutta and its Neighborhood History of People and Location from 1690 to 1857*, Calcutta, Calcutta Indian Publication, 1947.

Hunter, W.W: *The Indian Musalman,* 3rd edition, London, Trubner and Company, 1876.

Risley, H.H: *The People of India, Calcutta & Simla*, Thacker Spink Co., 1915.

Wise, James: *Notes on the Races, Caste and Traders of Eastern Bengal,* Not Published, London, Harrison and sons, 1883.

ভারতের জনগণনা (Census of India)

Census of India 1881, 1991, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011

Statistical Abstract of West Bengal

Statistical Abstract of Bengal 1947,1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1975, 1976, 1977, 1978

সরকারী রিপোর্ট (Government Report)

File No- *236/39(16 C) Foreigners Afghan National in transit thus India to East Pakistan-Report.*

File No- *236/39(16C) Afghan National in transit through India to East Pakistan Report.*

Annual Report 1885-86, India, Ministry of External Affairs.

Report 1938-39 India Trade Agent, Kabul, Department of Commercial Intelligence and Statistics. (India) Calcutta, Calcutta, Government of India Press, 1940.

Annual Report 1985-86, (India, Ministry of External Affairs) Report of Refugee Population in India, (Human Right Low Network, November 2007).

UNO: Guideline Principle on International Displacement, (New York, United Nations Publication, 2001).

আদালত সংক্রান্ত নথিপত্র (Court Case)

File No- *336/39(16) Afghan National Mednipore, Bengal Criminal Gazette, June 5, 1952.*

Instrument of Declaration by Miss Yesmin Nigar President All India Pakhtoon Jirga-e-Hind, Registrar of Assurance Calcutta U/87(8) III, Date 18th August, 1996.

অন্যান্য সরকারী দপ্তরের নথিপত্র (Other Official Source)

In Kabuliwala's land, H.Y Sharad Prasad, Ministry of External Affairs. December 20, 2002.

Speech by Prime Minister at the Parliament of Afghanistan (December 25, 2015).

External Affairs Minister's inaugural speech at the Conference organized by FICCI on 'Doing Business with Afghanistan'.

Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee's Speech at the Lunch hosted in the honour of H.E. Mr. Hamid Karzai, Chairman of the Afghan Interim Administration.

English rendering of PM's address at the convocation of Visva Bharati University at Santiniketan, west Bengal, May 25.2018 by PIB Delhi.

Kabul to Kolkata" Of Belonging Memories and Identity-Photography Exhibition Embassy of India Kabul, Afghanistan, March 14, 2015.

Certificate of Registration of the Societies 'All India- Pakthoon-Jirga-e-Hind' West Bengal Act XXVI of 1961(SL No- 77119 of 2010 -2011).

India -Afghanistan Trade Agreement Extended, Published in Asian Recorder, Vol. IV, NO.31, (July, 1956).

কলকাতার আফগানদের বিষয়ক চিঠিপত্র (The Letters about the matter of Kolkata's Afghans)

Letter of G. Sha (Royal Afghan Embassy, Delhi) to the Lala Jaan Khan, All India Pakhtoon-Jirga-E-Hind, Calcutta, Date 30th 1957.

Letter of George Fernandes (Member, Samyukta Socialist Party, Maharashtra) to the Lala Jaan Khan (General Secretary: Pakhtoon Jirgra-E-Hind), Calcutta, Date 5th August, 1965.

Letter of Prafulla Chandra Sen (Chief Ministar of West Bengal) to the Lala Jaan Khan, All India Pakhtoon-Jirga-E-Hind, Calcutta, Date 20th January, 1966.

Letter of Ajay Kumar Mukherjee (Chief Minister of West Bengal) to the Lala Jann Khan, All India Pakhtoon Jirga-E-Hind, Calcutta, Date 17th August, 1967.

Letter of shri Jyoti Basu (Deputy Chief Minister of West Bengal) to the Lala Jaan Khan, General Secretary, All India Pakhtoon Jirga-E- Hind. Date 11th August, 1969.

Letter of Mamta Banerjee (President of West Bengal Pradesh Youth Congress (I) Committee) to the Khan Jal Jaan Khan, Calcutta, Date 28th October, 1995.

Letter of Chitta Basu (Member of Parliament, Lok Sabha) to the President of All India Pakhtoon Jirga-e-Hind. Calcutta, Date 11th October, 1996.

Letter of Yesmin Nigar Khan (President of All India Pakhtoon Jirga-e-Hind) to the Indrajit Gupta, (Home Minister, India, New Delhi) Date 2nd July, 1996.

Letter of Indrajit Gupta (Home Minister, Govt of India) of the Shri Chitta Basu (MP, New Delhi) Delhi, Date 7th July, 1997.

Letter of Buddhadeb Bhattacharjee (Minister: Home (Police) Information & Cultural Affairs Department, West Bengal) of the Miss Yesmin Nigar Khan (All India pakhtoon Jirga-e-Hind President), Calcutta, Date 19th May, 1998.

Letter of Md. Salim (Minister in- Charge Minorities' Department and Welfare Department, West Bengal) of the Shri Somnath Chaterjee (MP, New Delhi), Calcutta, Date 2nd April, 2003.

Letter of Somnath Chaterjee (Leader, CPI(M), Lok Sabha) of the Shri L.K Advani (Hon'ble Deputy Prime Minister, Government of India) and

copy to Md. Salim, (Minister of Minorities Development and Welfare Department) and Ms. Yesmin Nigar Khan (President: All India Pakhtoon Jirga-e-Hind), New Delhi, Date 7th April, 2003.

Letter of Mamta Banerjee (Chief Minister, West Bengal) to the Ms. Yesmin Nigar Khan (President, All India Jirga-E-Hind), Calcutta Date 15th July, 2012.

সংসদের বক্তৃতা ও কার্যধারা (Parliament Speech Proceeding)

Speech by Prime Minister at the Parliament of Afghanistan December 25, 2015.

Selected Speech of Indira Gandhi: January 1966 Aug, (India Ministry of Information and Broadcasting, Publication Division, 1971.

ইংরেজি পত্রপত্রিকা ও সংবাদ পত্র (Periodical & Newspaper)

The Hitavadi, 18th January, 1901

The Hitavadi, 11th April, 1902

The Bangavasi, 25th February, 1905

Nayek, 22th August, 1908

Dainik Basumati, 28th October, 1919

কাবুলিওয়ালা বিষয়ক বাংলা আকরগ্রন্থ

কাবুলিওয়ালা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, সাধনা পত্রিকা, ১২৯৯।

Secondary Source (সহায়ক উপাদান)

ইংরেজি

Abraham, Isaac S: *Origin and History of the Calcutta Jews,* Calcutta, Asian Printers, 1969.

Afganistan Encyclopaedia Britanica 2006.

Ahmed, Qeyamuddin: *The Wahhabi Movement in India,* Calcutta, Farma KL, 1966.

Aitchison, C.U: *A Collection of Treaties-Engagements and Sands Relating to India and the Neighboring Countries,* Calcutta, Govt. Printing Press, Vol. VIII, 1909.

Akcapar, Sebnem Koser: *Religious conversions in forced Migration: Comparative cases of Afghans in India and Iranians in Turkey,* Journal of Eurasian Studies, Sage, 2019.

Ali, Hasan: *The Chinese in Calcutta, S. Siddique (ed.): A Study of Racial Minority in some aspect of Society and Culture in India,* Kolkata, Anthropology Survey of India, 1989, পৃ.৮৭।

Ali, Mohammad: *A New Guide to Afghanistan*, Kabul, Northern Pakistan Printing and Publishing Company, 1958.

Ali, Mohammad: *Ancient Afghanistan,* Kabul, Historical Society of Afghanistan, 1957.

Alison, Blunt*: Domicile and Diaspora Anglo-Indian women and Spatial Politics of Home,* Blackwell Publishing Ltd, 2005

Amin, Rohullah and Dwivedi, Sudhakar and Pawan Sharma, Kumar: *India and Afghanistan: An Overview of their Economic Relations, Agro Economist,* an International Journal, Renu Publishers, 2015.

Amrith S. Sunli: *Migration and Diaspora in Modern Asia,* New Delhi, Cambridge University Press, 2011.

Arnold, T.W & Guillanme, A.: *The Legacy of Islam*, Oxford University Press, 1933.

Asia's changing History: India's Relation with Afghanistan and Pakistan, Asian

Aspect of National Economy, Published in Asian Recorder, Vol-1, No-74, May, 1956.

Bagchi, P.C: *Calcutta Past and Present,* Calcutta, Calcutta University Press, 1939

Banerjee, Himadri, Gupta, Nilanjana, Mukherjee, Sipra (Ed): *Calcutta Mosaic: Essays and Interviews on the Minority Communities of Calcutta,* Delhi, Anthem press, 2012.

Banerjee, Mukulika: *The Pathan Unarmed Opposition & Memory in the North West Frontier*, United Kingdom, Oxford University Press, 2000**.**

Barman, Rup Kumar: *'Dalit Refugees or Refugee Dalits? Post-Partitioned Dalit Lives in Eastern India' in Debi Chaterjee and Biswajit Chaterjee(eds): Dalit Lives and Dalit Visions in Eastern Idia,* Kolkats, Center for Rural Resources, 2007.

……………………: *Contested Regionalism: A New Look on History, Cultural change and Regionalism of North Begal and Lower Assam,* Delhi, Abhijeet Pubication, 2007.

……………………: *Forced Migration Environment Refugees and State Politics: Indian scenario in global context, Amit Bhattacharya (ed.): Exploring the green Horizon,* Kolkata, Setu Publication, 2003, পৃ.১৭৯

......................….. *Migration, State Politics and Citizenship,* New Delhi, Aayu Publication, 2020.

Basak, Radhagabinda: *Ashokan Inscription,* Kolkata, 1925.

Basu, Basanta Kumar: *A Bygone Chinese colony in Bengal,* Calcutta, Bengal Past and Present, Vol-42, 1944, পৃ.পৃ. ১২০-১২২।

Bentz, Anne Sophie: *Afghan Refugee in Indo-Afghan Relation,* Delhi, Cambridge Review of International Affairs, Routledge, Vol.26 2013, পৃ.৩৭৯।

Beveridge, A.S*: Babur- Nama Memorise of Babar*, New Delhi Oriental Books Reprint Corporation, First Published 1922.

Biswas, Arka: *Durand line: History, legality and Future,* New Delhi, Vivekananda International Foundation, 1992.

Biswas, Debarchana: *The Chinese Community of Kolkata: A Case Study on Social Geography,* IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 8, Ver. 15, August. 2017.

Blunt, Alison and Banerjee Jayani: *Home, City and Diaspora: Anglo-Indian and Chinese attachments to Calcutta,* London, Queen Mary University, School of Geography, 2012.

Bonnerjee, Jayani Jeanne: *Neighborhood, City, Diaspora: Identity and belonging for Calcutta's Anglo-Indian and Chinese communities,* PhD in Geography at the Department of Geography, Queen Mary, University of London, 2010.

Bose, Ashish: Afghan Refugees in India, (Economic and Political Weekly, vol. 39, No. 43, October 2004, পৃ.পৃ. ৪৬৯৮-৪৭০১।

Bosin, Yury V: *Afghanistan, Resistance to 19th Century British Invasion, International Encyclopedia of Revolution and Protest,* Blackwell Publishing, 2009.

Boulgar, D.C.: *Central Asian Question*: *Essay on Afghanistan, China and Central Asia*, London, Fisher Unwin, 1885, পৃ.৬২।

Brown, Judith M: *Creating New Homes and Communities, Global South Asians: Introducing the Modern Diaspora,* New York, Cambridge University Press, 2006.

Caroe, Olaf: *The Pathans with an epilogue on Russia*, New York: St Martin's press, 1958, পৃ.২৪৯।

Central Intelligence Agency*, The World Factbook*, 2018.

Chakravarti, Ranabir: *Trade in Early India*, Oxford University Press, 2001.

Champagne, Jhon: *The Ethics of Marginility,* London, University of Minnesota Press, 1995.

Chandra, Mohit: *Trade and Trade Route in Ancient India*, Abhinav Publication, 1977.

Chandra, Satish: *History of Medieval India*, New Delhi, Orient Blackswan, 2007

Chaudhuri, Sukanta (Ed.): *Calcutta The Living City,* (Calcutta, Oxford University Press, vol. I: The Past, 1990.

Cohen, Robin: *Classical Nations of Diaspora; Global Diasporas: An Introduction,* New York, Routhledge, 2008.

Dasgupta, Keya: *Mapping the Space of Minorities in Bancrsee, Banerjee, Himadri Gupta, Nilanjana, Mukherjee, Sipra (ed.): Calcutta Mosaic Essays and Interviews on the Minority Communities of Calcutta,* New Delhi, Anthem press, 2012, পৃ.৮০।

De, Sarmistha: *Marginal Europeans in Colonial India 1860-1920,* Kolkata, Thema Publishing, 2008.

Dhavalikar, K.M: *Indian- Iran contracts in pre History,* Aligarh, The Aligarh Historian Society, Indian History Congress, 62th Conference, পৃ.পৃ. ১-১১।

Dupree, Louis: *Afganistan,* Karachi oxford, New York and Delhi, Oxford University Press, 1997

Dutt, Ramesh C.: *The Ramayana and Mahabharata,* Great Brittan, J.M Dent & Sons Ltd. First Issue, 1910.

Dutt, V.P: *India's Foreign Policy since Independence*, New Delhi, National Book Trust, 2007.

Eisenberg, Jaci: *The Boatless People, The UNHCR and Afghan Refugees, 1978-1989*, Geneva, Working Papers in International History, 2013, পৃ.পৃ. ৬৪-৬৬।

Elphinstone, M: *The History of India,* London, John Murray, vol.-I, Fifth Edition, 1866.

Elphinstone, Mountstuart: *An Account ot the kingdom of Cabul and its Dependencies in Persia, Tartary and India,* London, Longmn Hurst Rees, Orme and Brown, Vol-II, 1815.

Fazal, Abul: *Ain-i-kbari*, Blochmann [tr.]: Calcutta, The Asiatic Society of Bengal, Vol. I, 1977.

Fazl, Abu'l: *Akbar Nama,* H. Beverage [tr.]: *The Akbarnama*, (Calcutta, The Asiatic Society, Vol. III, Reprint 2000.

Ferris, F. G (ed*.): Refugees and World Politics (ed.): Refugees and World Politics,* New York, Praeger, 1985.

Foucher, A: *Notes on the Ancient Geography of Gandhara*, Calcutta Govt. Printing Press, 1909

Fry, Maxwell J: *The Afghan Economy Money, Finance and the Critical Construction to Economic Development,* Leiden, E.J Brill, 1974.

Gandhi, M. k: *Non Violence in Peace and War*, Ahmedabad, Navajivan Publishing House, Vol.1

Ganguly, Sumit: *Indian's Role in Afghanistan,* New Delhi, Published in CIDOB Policy Research Project, January, 2012.

Ghandi, M.k: *Non Violence in Peace and War*, Vol.1 Ahmedabad, Navajivan Publishing House.

Ghosh, Papiya: *Partition and the South Asian Diaspora extending the Subcontinent,* New Delhi, Routledge, 2007.

Ghosh, Partha S: *Migration Refugees and the Stateless in South Asia,* New Delhi, Sage Publication, 2016.

Ghoshal, Upendra Nath: *Ancient Indian Culture in Afghanistan,* Calcutta, Greater India Society Bulletin No-5, 1928, পৃ.পৃ.৮

Glatzer, Bernt: *The Pashtun Tribal System,* New Delhi, Concept Publishers, 2002.

Griffith, R. T. H. And. Shastri, J. L: *The Hymns of the Rig-Veda*, Hymn CXXVI

Gurung, Ghana S and Kollmair: Marginility: Concept and their Limitation, Switezerlad, NCCR North-South Dialogue, 2005.

Habib, Irfan: *An Atlas of the Mughal Emperor: Political and Economic Maps*, Delhi, Oxford University Press, 1986.

Habib, Irfan: *Evolution of Afghan Tribal System*, Proceeding of Indian History Congress, Session 62, Bhopal, 2002.

Hall, Stuart: *Culture Identity and Diaspora, Jonathan Rutherford (ed.): Identity, Community, Culture Difference,* London, Lawrence and Wishart 1990.

Hangloo, Ratan Lal: *Indian Diaspora in the Carribean History Culure and Identity,* Delhi, Primous Book, 2012.

Haroon, Sana: *Frontier of Faith Islam in Indo-Afghan Borderland*, United Kingdom, C. Hurst & co, 2007.

Herawi, Saifi: *The Irrigation of Heart*, (Theron, 1989).

Howitt, Richard (Ed): *Marginalisation In Theory and Pratice, Sydney, Economic and Regional Restructuring Research Unit Workshop,* Department of Geography, 1993.

Husain Iqbal: *Afghan Migration into India: A case study of some Afghan families, 16th- 19th Centuries,* Aligarh, Indian History Congress, 1994.

…………….: *The Sociological History of an Immigrant Community: The Afghans in Medieval India,* PIHC, 67th Session, Feroke, 2007.

Issac S. Abraham: *Origin and History of the Calcutta Jews,* Calcutta, Daw Sen and Co. Private Ltd, 1996.

James Long, Reverend Father: *Calcutta and its Neighborhood: History of the People and localities from 1690 to 1857,* Calcutta Indian Publication, Calcutta, 1974.

Jan, Ahmed [tr.]: *Tarikh-i-Afganistan*, Peshawar, Behari Lall, 1930.

Jarrett, Col. H. S. (Ed): *Ain-i-Akbari*, Calcutta, Asiatic Socity of Bengal, 1891.

Joshi, Rita: *The Afghan nobility and the Mughals: 1526- 1707,* Vikas Publishing House, New Delhi, 1985.

Joshi, S: *Let India help Afghanistan,* Guardian Newspaper, December, 2009.

Joshi, Shashank: *India's Af-Pak strategy,* Published in RUSI Journals, Feb-March, 2010.

Kakar, Mohammed: *Afghanistan: The Soviet Invasion and the Afghan Response, 1979-1982*, London, University of California Press, 1997.

Kapur, Debesh: *Diaspora, Development and Democracy,* New Delhi, Oxford University Press, 2010.

Kauder, Emil: *A History of Marginal Utility Theory,* New Jersey, Princeton University Press, 1965.

Kaye, J. W: *History of War in Afghanistan*, (London, WM.H Allen & Co. vol. II, 1874.

Kelegama, Saman: *Migration Remittance and Development in South Asia,* Delhi, Sage Publication, 2011.

Khan, Muhammad Hayat: *Afganisthan and its Inhabitants,* Lahore, H. Priestly, 1874.

Lal, Mohan: *Travel in the Punjab, Afghanistan and Turkistan to Balkh Bokhara and Herat and visit to Great Britain and Germany,* Calcutta, K.P Bagchi & Company, 1977.

Malone, David M & C. Mohan, Raja and Raghavan, Srinath: *The Oxford Hand book of Indian foreign Policy,* Oxford University Press, 2015.

Marjory, Harper & Stephen, Constantine: *Migration and Empire,* oxford University Press, New York, 2010.

Mehata, J.L: *Advanced Study in the History of Mediaeval India,Vol.1,* New Delhi, Sterling Publishers Private Limited, 1913.

Mitra, Ashok: *District Census,* Calcutta, Hand Book of Calcutta, Part III & IV, 1951

Nair, P.Thankappan: *Job Charnock the Founder of Calcutta,* Calcutta, Engineering Times Publications Private Ltd., 1977.

Nehru, Jawaharlal: *Glimpses of World History,* New York, Asia Publication Hous, 1934.

Niamatullah: Makhzan-i-Afghani (tr.) *by Bernhard Dorn as 'The History of Afghan',* London, Oriental Translation Committee, part I, 1829.

Nicholas, Robert: *A History of Pashtun Migration 1775-2006,* United Kingdom, Oxford University Press, 2008.

Nimatullah: Tarikh-i-khan Jehani Wa Makhzan-i Afghani, N.B Roy [tr.]: *History of the Afghans,* Santiniketan, Santiniketan Press, December 1958.

Nivadita, Sister: *Cabuliwallah, Ramananda Chaterjee (ed.):* Calcutta, The Modern Review: A monthly Review and Miscellany, January to June, 1911.

Omprakash, Mishra: *Forced Migration in the South Asian Region Displacement, Human Right and Conflict Resolution,* Center for Refugee studies Jadavpur University, Kolkata, 2004

Paliwal, Avinash*: My Enemy's Enemy: India in Afghanistan from the Soviet Invention to the US Withdrawal,* United Kingdom, C. Hurst & Co. Publishers Ltd., 2017.

Pelc, Stanko*: Mirginality and Marginalization,* Springer International Publishing, 2017.

Qanungo, Kalikaranjan: *Sher Shah and His Times,* Delhi, Orient Longmans Limited, 1965.

Rai, Rajesh, & Reeves, Peter: *The South Asian Diaspora Transnational Network and Changing Identityes,* Oxon, Routhledge, 2009.

Rajan, S. Lrudaya: *India Migration Report 2014 Diaspora and Development,* New Delhi, Routledge, 2014.

Rashid A: *Taliban Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*, London, Yale University Press, 2000.

Rasid, Rahaman: *Kabul-New Bugbear in Indo-Pakistan ties,* Kuala Lampur, New strait Times, 1988.

Ratanagar, Shereen: *Encounters The Westerly Trade of the Harappa Civilization,* Delhi, oxford University press, 1981.

Rath, Saroj Kumar: *Asian's Changing History: India's Relations with Afganistan and Pakistan, Asian and African Studies,* Volume 22, Number 2, 2013.

Rene, Routh (Ed): Afganistan in 2010 A Survey of Afghan People, Kabul 2010.

Roy, A.K: *Census of India,* Calcutta, Bengal Secretariat Press, Vol. VII, 1901.

Roy, Arpita Basu: *Conceqences and Challenges of the Afghan Conflict: Situation Workable,* kolkata, Jadavpur University, Doctor of Philosopy Thesis, 2014.

………………: *Media Reconstruction and the Popular "Hindi Serial 'Culture in Contemporary Afghanistan,'* Asia Annual 2008, New Delhi: Manohar, 2009.

Roy, Pijush Kanti: *New Face in Old Calcutta,* Kolkata, Sarat Book Distributors, 2008.

Rubin, Barnet R: *The Fragmentation of Afghanistan, state Formation and Collapse in the International System*, New Haven, CT, Yale University Press, 1955.

Sachan, Edward C: *Alberuni's India*, London, Kegan Paul, Trench Trubner & co.Ltd, 1910.

Safran, William & Kumar & Sahoo, Ajoya Kumar & Lal, Biraj.V: *Transnational Migrations the Indian Diaspora,* New Delhi, Routledge, 2009.

Samaddar, Ranabir: *The Marginal Nation Transborder migration from Bangladesh to West Bengal,* New Delhi, Sage Publication, 1999.

Saman, Kelengama: *Migration, Remittances and Development in South Asia, Sage Publication,* New Delhi, 2011.

Sarkar, Jwahar: *The Chinese of Calcutta, Sukanta Chowdhury (Ed.): Calcutta the Living City,* Calcutta, Oxford University Press, 1992.

Sathyanarayanan, D: *Analyzing India Afghanistan relations 1996–2014, Department of Defense and Strategic Studies,* University of Madras, Chennai October 2015.

Sen, Surendranath (ed.): *Indian Travels of Thevenot*, New Delhi, National September 1974.

Shafiq, Mohammad: *The Impact of Globalization: An insight into the Afghan Diaspora in India,* Delhi, Jawaharlal Nehru University, School of International Studies, 2020.

Sharma, M: *Refugees in India working paper, India, Centre for Civil Society,* No: 229, 2009.

Sharma, R: *India's Relations with Afghanistan Raghav Sharma in Hand Book of Indian international Relation*, U.K., Routledge, 2011.

Sharma, Raghav: *India's Relation with Afghanistan, Davied Scott (Ed.) Handbook of India's International Relation*, United Kingdom, Routledge, 2011.

Sheikh, Bilal: *Pattern of Afghan Migration to India during Medieval Period,* Kerala, Indian History Congress, 77th Session, 2016, পৃ.পৃ.১৩৭-১৪৫।

Siddique, M.K.A: *Muslims of Calcutta,* Kolkata, Anthropological Survey of India, September 1974.

Singh, Dilbagh: *On the Wings of Destiny*: An Autobiography, Knowledge World, 2010.

Singh, Indrajit: *Afghan Hindus and Sikhs,* (New Delhi, Readomania Publishing, 2019.

Siraj, Minhaj-us: Tabaqat-i-Nasari, H.G Raverty [tr.]: *A General History of the Muhammadan Dynasties Including Hindustan,* New Delhi, Orient Book Reprient Corporation, vol. II Reprient 1970.

Sircar, Dinesh Chandra: *Inscriptions of Asoka,* Delhi, 1975.

Smith, Vincent: *The Oxford History of India from the Earliest Time to the end of 1911*, London, Oxford University Press, 1919.

Sultan, Mohammad Khan: *Tarikh-i-Afganisthan,* New Delhi, Persian, 1935.

Tololyan, Kaching: *Rethinking Diaspora (S): Stateless Power in the Transnational Movement,* Toronto, University of Toronto Press, vol.5, 1996.

Tsiang, H: *Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World*, Translated by Samuel Beal, Vol. I.

Ud-Din, Hamid: *Historians of Afghan Rule in India,* USA, American Oriental Socity, 1962.

Vogelsong, Willem: *The Afghan*, United Kingdom, Blackwell Publishers, 2002.

Wahab, Md Abdul: *Representation of Afganisthan: A study of Hosseini's The Kite Runner in the light of the Tagore critique on Nationalism,* An Intrenational Journal in English vol.8, Issue-II, April 20017.

wahab, Shaista And Youngerman, Barry: *A Brief History of Afganistan: Fact on File,* New York, An imprint of Infobase Publishing, 2010.

Warner, H William: *The Kabuliwalas: Afghan moneylending and the credit cosmopolis of British India, c 1880-1947,* New Delhi, Economic and Social History Review, Sage Publication, 2020, পৃ.পৃ. ১৮৪-১৮৭।

বাংলা

আচার্য, কেশবচন্দ্র: *আফগানিস্তান বিবরণ,* কলকাতা, ভারত মিহির যন্ত্র, ১২৯৮।

আলম, এম. শামসুল: *আফগানিস্তান ও তালিবান,* ঢাকা, বাংলাবাজার প্রকাশনী, ২০১৫।

আফরিন, নাজিয়া: *কাবুলিওয়ালার খোঁজে,* বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২০১৫।

আলম, মহম্মদ শামসুল: *সমসাময়িক বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ইতিহাস,* ঢাকা, অবসর প্রকাশনী, ২০১৪।

আলী, সৈয়দ মুজতবা: *দেশে বিদেশে,* কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৬।

ইসলাম, শেখ মকবুল: *ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কলকাতার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়,* সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৩।

এমামুদ্দিন, এস.এম. (সম্পাঃ ও অনুবাদ): *তারিখ-ই-শেরশাহী,* প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৮।

করিম, আবদুল: *বাংলার ইতিহাস মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহি বিপ্লব পর্যন্ত,* ঢাকা, বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯।

ক্যাম্পোস, জোয়াকিম জোসেফ এ এবং অর্নব, শানজিদ (অনুঃ): *হিস্ট্রি অব দ্যা পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল,* ঢাকা, দিব্য প্রকাশক, ২০১৮।

খান, আব্বাস আলি: *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,* ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪।

গাইন, মনজিৎ: *তালিবানের দেশে মালালা,* কলকাতা, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, ২০১৮।

গঙ্গোপাধ্যায়, অভীক: *ডায়াস্পোরা তত্ত্বে ও অভিঘাতে,* কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১২।

গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ: *কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ,* কলকাতা, আনন্দ, ১৮৮৪।

ঘোষ, দস্তিদার: *আফগানিস্থানের কবিতা,* কলকাতা, প্রতিভাষ, ২০১৮।

ঘোষ, বিনয়: *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা, বাক্ সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৮।

চক্রবর্তী, আবিরা বসু: *ভারতবর্ষ: ঐতিহাসিক সূচনা ও আর্য ধারনা,* ইন্ডিয়া, ন্যশনাল বুক ট্রাষ্ট, ২০১১।

চক্রবর্তী, দেবশ্রী: *আফগানিস্তান,* কলকাতা, দে পাবলিকেশনস্, ২০২০।

চক্রবর্তী, দেবাশীস, ও কুমার, অধৃষ্য এবং বিশ্বাস, স্বাতী (সম্পাঃ): *আফগানিস্তান এবং সমসাময়িক বিশ্ব,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১।

চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার: *প্রান্তিক মানব পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুজীবনের কথা,* কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭।

চক্রবর্তী, রণবীর: *ভারত ইতিহাসের আদি পর্ব,* কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্লাকসোয়ান, ২০০৭।

……………………: *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪।

চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন: *কলিকট থেকে পলাশী,* ঢাকা, দিব্য প্রকাশক, ১১০০।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীল: *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৩।

চন্দ, রমেশ্চন্দ্র: *গাঁ শহর বিভুঁই দিল্লি ও কাবুল,* কলকাতা, একুশ শতক, ২০১০।

-------------: *গান্ধারীর দেশে,* কলকাতা, সেরিবান, নভেম্বর ২০২১।

চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার: *পথ চল্‌তি,* বাক সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬০।

জোয়ারদার, বিশ্বনাথ: *অন্য কলকাতা,* কলকাতা, অনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩।

জলিল, মুহম্মদ আবদুল: *বঙ্গে মগ- ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার,* ঢাকা, বাংলা আকাদেমী, ১৯৮৮।

জানা, সাহানা: *পর্তুগীজ সেটলারস ইন রুল্যার ওয়েষ্ট বেঙ্গল,* মেদিনীপুর, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, নৃতত্ত্ব বিভাগ।

ঝা, বিবেকানন্দ: *মৌর্য যুগের ভারতবর্ষ,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ২০০৯।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: *কাবুলিওয়ালা,* বিশ্বভারতী, সাধনাপত্রিকা, ১২৯৯।

.........................: *সহজ পাঠ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথামিক শিক্ষা পর্ষদ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩৩৭।

.........................: *চিঠিপত্র, নবম খন্ড,* ৪৫ নং চিঠি, শ্বভারতী, ১৯৬৪।

.........................: *জীবনস্মৃতি,* কলকাতা, বিশ্বভারতী, প্রবাসী, ভাদ্র ১৯৩১।

থাপার, রোমিলা: *ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১০০০ খ্রীঃপূঃ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ,* কলকাতা, ওরয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৬০।

দাস, ইন্দ্রজিৎ: *সেকালের কলকাতার ধর্মীয় চিত্র,* কলকাতা, ভ্রমণ আড্ডা, উনবিংশ সংকলন, ২০১৭।

দাস, ঋষি: *বাদশা খান,* কলকাতা, অশোক প্রকাশনা, ১৯৫৯।

দে, গৌরীশঙ্কর: *ভারতবর্ষের ইতিহাসে তুর্ক-আফগান যুগ ১২০০-১৫৫৬,* কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৪।

দাস, প্রশান্ত: *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রান্তিক মানুষের জীবিকা ও পেশার বিবরণ,* আসাম, করিমগঞ্জ কলেজ বাংলা বিভাগ, ১৯৯৭।

দাস, মলয় কুমার: *ভারত আফগানিস্তান সংস্কৃতির অনন্যের প্রেক্ষিতে অন্বয়ী ঐতিহ্যের পুনউত্তরাধিকার,* কলকাতা, ইতিহাস অনুসন্ধান, খন্ড-১৭.

দাশগুপ্ত, রণজিৎ (সম্পাঃ): *তিরিশ চল্লিশের বাংলা,* কলকাতা, সেরিবান, ১৯৯৯।

দেবী, শ্রী সীতা: *পুণ্যস্মৃতি,* কলকাতা, মৈত্রী পরিবেশক, ১৯৬৪।

ধর, কৃষ্ণঃ *কলকাতার তিন দশক,* কলকাতা, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, ১৯৮৯।

পান্থজন: *কাবুলের পথে পথে,* কলকাতা, আনন্দ, ২০০৯।

বাগ, খোকন কুমার (সম্পাঃ): *আত্মপরিচয়ের সংকট: সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি,* কলকাতা, আন্তর্মুখ পত্রিকা, ২০১৯।

বেভারিক (অনুদিত ও সম্পাদিত): *বাবরনামা,* দিল্লি, ১৯৭২।

বিদ্যানিধি, তারিণিকান্ত: *প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য,* কলকাতা, উইকিনোটস প্রিন্টিং ওয়ার্কাস, ১৩৩৮।

ব্যনার্জি, দিলিপ: *আফগানিস্তান একনজরে,* কলকাতা, কারিগর, ২০২০।

বিশ্বাস, রমানাথ: *আফগানিস্তান ভ্রমণ,* কলকাতা ,অশোক পুস্তকালয়, ১৩৪৯।

বর্মণ, রূপকুমার: *সংকটজনিত উদ্বাস্তু ও তিতাস একটি নদীর নামের সার্বজনীনতা,* কলকাতা, অন্তর্মুখ পত্রিকা, ২০১৪।

.........................: *পরিবর্ত অনুসন্ধান রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাস চর্চা,* কলকাতা, গাঙচিল প্রকাশনী, ২০২২।

..........................: *জাতি রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক,* কলকাতা, অ্যালফাবেট বুকস, ২০১৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী হিরণ্ময়: উদ্বাস্তু, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬০।

বন্দ্যোপাধায়, সুস্মিতা: *কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ,* কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৮।

..................................: *মোল্লা ওমর তালিবান ও আমি,* কলকাতা, ভাষ ও সাহিত্য, ২০০২।

..................................: *এক বর্ণও মিথ্যে নয়,* কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ২০০১।

ভূইয়া, গোলাম কিবরিয়া: *আফগানিস্তান অতীত ও বর্তমান,* ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১২।

ভট্টাচার্য্য, নির্মলেন্দু : *সন তারিখে কলকাতার ইতিহাস,* কলকতা, অনন্য প্রকাশন, ১৯৯১।

মিখাইল, ইলিনিস্কি: *বিপ্লবের অগ্রগতি,* কলকাতা, কন্টায় প্রেস।

মুরশিদ, গোলাম: *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,* ঢাকা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬।

মজুমদার, জহর: *নিম্নবর্গের পেশার বিবরণ,* কলকাতা, পুস্তক বিপনি, ২০০৭।

মুখোপাধ্যায়, তিয়াস: *বাংলার বুকে পর্তুগীজিদের গ্রাম,* দ্যা ওয়াল,২৯ অক্টোবর ২০১৯।
মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ: *সাহিত্য সমাজ ও ইতিহাস,* কলকাতা, চতুরঙ্গ, স্বরসতী প্রেস, ১৩৬৯।
মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.): *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও পেশার বিবরণ,* সুবর্ণ, ২০১৪।
মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র: *প্রান্তিক নিম্নবর্গ দলিত: পরিভাষার অন্দরে,* কলকাতা, অন্তর্মুখ, ডিসেম্বর ২০১৪।
মখমলবফ, মহসীন: *আফগানিস্তানের ট্রাজেডি,* কলকাতা, প্রকাশক মন্থন, ২০০২।
মিত্র, রাধারমণ: *কলকাতা বিচিত্রা,* কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯১।
রায়, অমিতাভ: *কাবুলনামা,* কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১০।
রায়, অলোক: *বিষয় কলকাতা,* কলকাতা, জাতীয় গ্রন্থগার সমিতি, ১৯৯৩।
রায়, নীহাররঞ্জন: *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০।
রায়, পীযূষ কান্তি: *কলকাতার প্রতিবেশী,* কলকাতা, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, কলকাতা পৌরসংস্থা, ২০০২।
রহমান, মুজিবর ও আলি, সাবির (সম্পাদিত): *মধ্যযুগে ভারত (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা, বুকপোস্ট
পাবলিকেশান, ২০১৩।
রায়, রাধারমণ: *কলকাতা বিচিত্রা,* কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯১।
রায়চৌধুরি, সব্যসাচী বসু: *ভারত মুখ ফেরাল,* কলকাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৭।
লাহিড়ি, সমরেন্দ্রনাথ: *সীমান্তের অন্তরালে,* কলকাতা, জয়ঢাক, ২০১৭
শর্মা, আর. এস: *ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৬২ তম অধিবেশন,* প্যানেল বক্তব্য, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস, ৬২ তম অধিবেশন, ভোপাল, ২০০১।
শেরওয়ানী, আব্বাস খান: *তারিখ-ই-শেরশাহী:* মম্মহদ আলি চৌধুরী [অনুবাদ] ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।
শাহনাওয়াজ, এ. কে. এম এবং হেরেন, ফাতেমা : *বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন,* বাংলাদেশ, অবসর, ২০১৭।
শ্রীমানী, সৌমিত্র: *সুলতানি রাজত্বকালে ভারত,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলির্শাস, ২০০৮।

সুর, অতুল: *৩০০ বছরের কলকাতা পটভূমি ও কলকাতা,* কলকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ২০১৪।

সেন, অসিত কুমার: *তুর্কী আফগান যুগে ভারত,* কলকাতা, কে পি বাগচি, ১৯৯৮।

সইদুল্লা, আবু নাসের: *আফগান আমির চরিত,* ঢাকা, ইসলামিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৩১৮।

সইদ, আব্দুল: *বাংলায় আফগান শাসন ১৫৩৮-১৫৭৬,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১৬।

সিংহ, কঙ্কর: *ইসলামের ভারত অভিযান,* কলকাতা, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশান, ২০১৩।

সেহানবীশ, চিন্মোহন: *আফগানিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম,* কলকাতা, আন্তর্জাতিক, *পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি সংসদের মুখপত্র,* ২২ শ বর্ষ, ১ম- ২য় সংখ্যা, ১৯৭১।

স্যন্যাল, তুষার কান্তি: *কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজ,* কলকাতা, কলকাতা পুরশ্রী, ষষ্ঠ বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৯৮৩।

সুর, নিখিল: *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* কলকাতা, সেতু পাবলিশার্স, ২০১৫।

সুর, সুমনা দাস: বৈশ্বিক বাঙালি এবং ডায়াস্পোরা বাঙ্গলা সাহিত্য, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০২২।

সেনগুপ্ত, পার্থ সারথী: *পর্তুগীজ সমীক্ষা,* এই সময়, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫।

সেন, মজুমদার: *নিম্নবর্ণের বিশ্বায়ন,* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৭।

সিকদার, সুকুমার: *হতভাগার কলকাতা,* কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৬।

সেনগুপ্ত, সুব্রত ও গঙ্গোপাধ্যায়, সুনিল (সম্পা.): *সুলেমানের বিচার,* কলকাতা, সাহিত্য আকাডেমি, ২০১৬।

হীরা, আশিস: *উদ্বাস্তু ইতিহাসে ও আখ্যানে,* কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৯।

হাবিব ইরফান (সম্পা): *সিন্ধু সভ্যতা,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক, ২০০৪।

হাসান, খন্দকার মাহমুদ উল, ও টুকু, সৈয়দ মমতাজ (অনু.): *আফগানিস্তানের ইতিহাস,* ঢাকা, দিব্য প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ ২০২১।

হাসান, ফজল (অনু.): *আফগানিস্তানের শ্রেষ্ঠ গল্প,* ঢাকা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৩।

হোসেন, মোজাফফার: *ভারতীয় ডায়াসপোরা সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপটে নাইপল,* ঢাকা, কালি ও কলম, ২০১৮।

হক, মোঃ ফজলুল: *আফগানিস্তানের ইতিহাস ১৭৪৭-১৯৭৮,* রাজশাহী, পাপিয়া সুলতানা, মার্চ ২০১৭।

পত্র পত্রিকা

ইংরেজি

BBC News
Economic and Political Weekly
The Calcutta Review
The Hindu
The Kabul Times
The Modern Review
The Statesman
The Times of India

বাংলা

অনীক

আনন্দবাজার পত্রিকা

অন্তর্মুখ পত্রিকা

আন্তর্জাতিক

কলকাতা পুরশ্রী

প্রথম আলো

মন্থন সময়িক

যুগান্তর

বি নিউজ ২৪

বিবিসি বাংলা

তথ্যচিত্র প্রদর্শনী

From Kabul to Kolkata Of Belonging, Memories and Identity, Nazes Afroz & Moska Najib, Kolkata, 22th March, 2015.

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

নাজেস আফরোজ: বিবিসি নিউজ, সাংবাদিক, কাবুলিওয়ালাদের তথ্যচিত্র নির্মাতা, কলকাতা (৭.১২.২০১৫)।

জান মহম্মদ খান: ৪৮, কাপড়ের ব্যবসায়ী, কলকাতা (১১.০৯.২০১৬)।

আমির খান, সংগঠক, খোদা-ই-খিদমদ্গার, আফগান, কলকাতা (১৮.০৩.২০১৬/ ১২.০২.২০২২)।

আজম খান: ৪২, আফগান কাপড়ের ব্যবসায়ী, হুসেন এন্ড গারমেন্টস দোকানের মালিক, কলকাতা, (১৭.০৮.২০১৮)।

রসিদ খান: শুকনো ফলের ব্যবসায়ী, আফগান, কলকাতা (১৯.১২.২০১৮)।

হাফিজ মহম্মদ সৈয়দ: ৬৫, কাবুলিওয়াদের একাংশের শিক্ষক, কাশিপুর (১৮.০৩.২০১৯)।

আব্দুল ওলিউর খান: ৫২, আফগান কাবুলিওয়ালা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, কাঁকিনাড়া (১৬.০৫.২০১৯)।

রহিম সিদ্দিকি: ৫২, হোটেল কর্মচারী, জাকারিয়া স্ট্রিট, কলকাতা, (১৯.১১.২০১৯)।

পির নাজের তুর্কমেন: ৩২, আফগান জুয়ালারী ব্যবসায়ী, মাজার-ই-শরিফ, (১৬.০২.২০২০)।

সমীর খান: ৩৭, আফগান কার্পেট ব্যবসায়ী, কাবুলিওয়ালি সংস্থার কর্মচারী, কাবুল, (২২.০২.২০২০)।

কাউম খান: ৫৫, সাবির হোটেলের কর্মচারী, কলকাতা, (০১.০১.২০২১)।

ওয়ালি খান: ৪৮, আফগান ব্যবসায়ী, আফগান, কলকাতা (১৫.০৩.২০২১)।

ইয়াসমিন নিগার খান: ৫১, সভানেত্রী, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ, কলকাতা (১৫.০৯.২০২১)।

শহিদুল্লাহ খান: ২৭, হুসেন এন্ড গারমেন্টসের কর্মচারী, আফগান, ময়দান লেন, কলকাতা, (১৭.০৯.২০২১)।

দিন মহম্মদ দরবেশ: ২৬, হুসেন এন্ড গারমেন্টেসের কর্মচারী, আফগান, ময়দান লেন, কলকাতা, (১৭.০৯.২০২১)।

তোরবাজ মহম্মদ খাঁ: ৪৮, আফগান ব্যবসায়ী, পূর্ব মেদিনীপুর, (১৬.০৪.২০২২)।

জাফর খান: ৫৯, আফগান কাবুলিওয়ালা, ফেয়ার্স লেন, (১২.০৯.২০২২)।

Weblography:

http://mea.gov.in/bilateral

http://www. unhcr.org/4761579f4.html.

http://www.eoi.gov.in/Kabul

http://www.eoi.gov.in/Kabul

http://www.thehindu.com/news/resources/text-of-modis-speech-to-afghan parliament/article8029269.ece

http://www.thehindu.com/news/resources/text-of-modis-speech-to-afghan.
-parliament/article8029269.ece